জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ

গবেষক

কামরুন নাহার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ

পিএইচডি গবেষক

কামরুন নাহার

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ

বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট ২০২১

Dhaka University Institutional Repository

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
(১৯১২-১৯৮২)

ঘোষণাপত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প: মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার একক গবেষণার ফল। অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে রচিত এই অভিসন্দর্ভ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি বা অন্য কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। এখানে যেসব তথ্য-উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর সূত্র যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিশ্লেষণ আমার নিজস্ব।

(কামরুন নাহার)

পিএইচডি গবেষক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নিবন্ধন নম্বর : ৬০

শিক্ষাবর্ষ : ২০১৮-২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হলো যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষক কামরুন নাহার কর্তৃক উপস্থাপিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

(ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৭

অবতরণিকা ৯

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জীবনকথা ও সাহিত্যচর্চা ৩১

তৃতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন গল্পকার ৪৯

চতুর্থ অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ ৮৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব ৮৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী মনস্তত্ত্ব ১২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নিসর্গচেতনা ১৪৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব ১৬৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কিশোর-মানস ২০১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ ২৩০

উপসংহার ২৬২

গ্রন্থপঞ্জি ২৭০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় এই অভিসন্দর্ভটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। এই গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে তাঁর সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক-নির্দেশনার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

আমার পিএইচডি সেমিনারে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়ার জন্য সবিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীকে। গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শের জন্য আমার শিক্ষক ও এমফিল-এর তত্ত্বাবধায়ক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মহীবুল আজিজের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কনিষ্ঠ পুত্র তীর্থঙ্কর নন্দী এই গবেষণা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শামীম রেজা ও ড. হামীম কামরুল হক এবং অগ্রজপ্রতিম কবি রুদ্র অনির্বাণ প্রয়োজনীয় বইপত্র সরবরাহ করে আমার গবেষণাকর্মে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধাভাজন শিল্প-গবেষক ড. রেজাউল করিম সুমন নানা সময়ে বইপত্র ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে ঋণী করেছেন। তাঁকে সবিশেষ ধন্যবাদ। কবিবন্ধু মুয়িন পারভেজের পরামর্শ ও সহায়তার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। তথ্য অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য কবি সোহেল হাসান গালিবকে বিশেষ ধন্যবাদ।

এছাড়াও যাঁদের অনুপ্রেরণা আমাকে এই গবেষণা যথাসময়ে সম্পন্ন করার জন্য প্রণোদিত করেছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ ইকবাল, আমার সহকর্মী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. তসলিমা খাতুন, ড. মোকাদ্দেস উল ইসলাম বিদ্যুৎ, কবিবন্ধু অঞ্জন সরকার জিমি, কবিবন্ধু অনুপমা অপরাজিতা, কবিবন্ধু ফারহানা রহমান এবং বন্ধু রুমি চৌধুরী। তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

দুই বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করে আমাকে সকল প্রকার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে, নিরবচ্ছিন্নভাবে গবেষণাকর্মে মনোযোগী থাকতে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত নানা বই আমার গবেষণাকর্মে সহায়ক হয়েছে। এ

সকল গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। বাতিঘর-এর কর্ণধার দীপঙ্কর দাশ দ্রুত বই সংগ্রহ করে দিয়ে এই গবেষণাকর্মকে গতিশীল করেছেন। তাঁর সহায়তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রতি, অভিসন্দর্ভটির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থানুকূল্য প্রদানের জন্য।

এই অভিসন্দর্ভের অক্ষরবিন্যাস ও মুদ্রণের ক্ষেত্রে যথাক্রমে স্নেহভাজন মাহফুজুর রহমান শাকিল এবং সুপন সূত্রধরের সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

আমার পিতা আবু আহমেদ ও মাতা ফেরদাউস আক্তার জাহানের নিরন্তর উৎসাহ এই অভিসন্দর্ভটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সবিশেষ কৃতজ্ঞতা আমার সন্তান সারাফ সামির জামান মেঘের প্রতি, গবেষণাকালীন মানসিক চাপ উপলব্ধি করে আমাকে নিমগ্নচিত্তে গবেষণার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এছাড়াও বহুবিধ সাংসারিক দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্তি দিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত থাকতে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল আমার গৃহকর্মী আয়শা বেগমের প্রতি।

অবতরণিকা

প্রস্তাবনা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর (১৯১২-১৯৮২) চব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম সাড়া-জাগানো গল্প 'নদী ও নারী' (১৯৩৬) যখন *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রবীণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) তখনও সাহিত্যচর্চায় সক্রিয়। ততদিনে রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে *কল্লোল* (১৯২৩), *কালি-কলম* (১৯২৬), *প্রগতি* (১৯২৭), *পূর্বাশা* (১৯৩২), *দেশ* (১৯৩৩), *চতুরঙ্গ* প্রভৃতি সাময়িকপত্রকে কেন্দ্র করে আবির্ভূত লেখকদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭২), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০-১৯৭৪), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৫), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫) প্রমুখ অগ্রগণ্য গল্পকার হিসেবে বাংলা গল্পের বিষয়, আঙ্গিক, কৌশল ও ভাষাশৈলী নিয়ে নানামুখী নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছেন। তাঁদের সম্মিলিত অবদানে আধুনিক বাংলা ছোটগল্প নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য সমকালীন লেখকের পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও এই যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেছেন। গল্পকার হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি মূলত অনুরাগী পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; পূর্বসূরি ও সমসাময়িক অনেক লেখকের মতো জীবদ্দশায় তিনি বিপুল খ্যাতির অধিকারী হননি। ব্যক্তিস্বভাবে অন্তর্মুখী জ্যোতিরিন্দ্র বিশেষ কোনো লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য, বিষয়ের বৈচিত্র্যে, ভাষাশৈলীর বিশেষত্বে, আঙ্গিক-নির্মাণ কৌশলে এবং বিশেষত বহুস্তরময় মনস্তাত্ত্বিক আখ্যান বুননে তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী।

সাধারণভাবে ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা না পেলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রচনা বোদ্ধামহলে বরাবরই প্রশংসিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নানা গল্প এবং *খেলনা* (গল্পগ্রন্থ, ১৯৪৬), *সূর্যমুখী* (উপন্যাস, ১৯৫২), *মীরার দুপুর* (উপন্যাস, ১৯৫৩), *শালিক কি চড়ুই* (গল্পগ্রন্থ, ১৯৫৪) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে কথাসাহিত্যিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি পরিচিতি ও স্থিতি লাভ করেন। *বারো ঘর এক উঠোন* (১৯৫৪-১৯৫৫) উপন্যাসটি *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের ক্রমিক অধঃপতনের এই আখ্যান চরিত্র-সৃষ্টি ও কাহিনি-বয়নের নিরিখে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অন্যতম স্মরণীয় রচনা। পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর *বন্ধুপত্নী* (১৯৫৫), *প্রিয় অপ্রিয়* (১৯৫৭), *মহীয়সী* (১৯৬১), *খালপোল ও টিনের ঘরের*

চিত্রকর (১৩৬৭ ব.), *শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা* (১৩৭০ ব.), *আজ কোথায় যাবেন* (১৯৮০) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে নানাভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে মধ্যবিত্তের বিভিন্ন সংকট, দাম্পত্যের টানাপড়েন, প্রেম ও যৌনতার বহুমুখিনতা, নিসর্গ-নিমগ্নতা, মৃত্যুচেতনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে মনস্তত্ত্বের বহুবিচিত্র বিলোড়ন। গল্প ও উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই জ্যোতিরিন্দ্রের সমান বিচরণ থাকলেও গল্পকার হিসেবেই তাঁর প্রসিদ্ধি ও অর্জন সমধিক।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে বাংলা কথাসাহিত্যে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ যখন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে তেমনই এক সময়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব ঘটে একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক কথাশিল্পী হিসেবে। তাঁর গল্প এক অর্থে বহির্বাস্তবের ঘটনাপ্রবাহকে ছাপিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত ব্যক্তির আখ্যান। অবচেতনের অনিয়ন্ত্রিত অপরিমেয় আকাঙ্ক্ষা বিভিন্ন চরিত্রকে কীভাবে আন্দোলিত, আক্রান্ত ও নিয়ন্ত্রণ করে, সেসব চরিত্রের মনস্তত্ত্বের বহুস্তরময় রূপায়ণের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে তা নিরন্তর প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যায় অবধি ব্যক্তির অবসাদ ও অবক্ষয়, প্রেম ও যৌন-চেতনা, লিবিডোতাড়িত মনোবিকলন, বয়ঃসন্ধিকালীন নব-মানসিকতা ও অস্থিরতা, নিসর্গ-লীন সত্তার উদ্ভাসন, নারী-পুরুষের মনোদৈহিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ চরিত্রের মানসজগৎকে উন্মোচিত করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মৃত্যুর পরে, ১৯৮০-এর দশকের শেষদিক থেকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার সূত্রপাত হয়। ১৯৯০-র দশক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে বিভিন্ন মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল মূল্যায়নে লেখকের গল্প-উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য-সহ নানা প্রসঙ্গ পর্যালোচিত হলেও তাঁর রচনার মৌল প্রবণতাগুলো যথাযথভাবে ও বিস্তৃত পরিসরে বিশ্লেষিত হয়নি। বিশেষ করে তাঁর গল্পে মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের রূপায়ণ এখনো পর্যাপ্ত আলোচনার দাবি রাখে। বিস্তৃত, অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণী আলোচনার মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের এই স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিকতার উন্মোচনই 'জোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য।

সাহিত্য সমীক্ষা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়নধর্মী রচনার মধ্যে রয়েছে তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সম্পন্ন কয়েকটি পিএইচডি অভিসন্দর্ভ এবং একক গ্রন্থ। রঞ্জনা দত্তের *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী* (২০০২) গ্রন্থটি তাঁর 'কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' (১৯৯৩) শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভের পরিমার্জিত রূপ। এ গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রকে গতানুগতিকতার বাইরে ভিন্নধারার

একজন লেখক হিসেবে শনাক্ত করে কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার আবশ্যকতা সত্ত্বেও এ বইয়ে লেখকের উপন্যাস ও গল্প নিয়ে আলোচনার পরিসরটি সংক্ষিপ্ত। এখানে তাঁর সাহিত্যের নারী চরিত্র ও যৌনতার প্রসঙ্গ সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হলেও মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ তেমনভাবে আলোচিত হয়নি।

রত্না জোয়ারদারের 'আধুনিক ছোটগল্পের তিন শিল্পী' (১৯৯৭) শীর্ষক পিএইচ অভিসন্দর্ভটিতে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও কমলকুমার মজুমদারের (১৯১৪-১৯৭৯) গল্প তিনটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলোকে কালানুক্রমিকভাবে তিনটি পর্বে বিভক্ত করে তাঁর গল্পের বিষয়ভাবনা ও শৈলীগত বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে একই অভিসন্দর্ভে তিনজন গল্পকারের গল্প আলোচিত হওয়ায় এখানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ ছিল না, কেবল তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল গল্পগুলোকেই পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অজন্তা সাহার *কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী* (২০১০) গ্রন্থটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও কথাসাহিত্য নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা। এই বইটিতে তাঁর গল্প ও উপন্যাসকে কালানুক্রমিকভাবে দুটি পর্বে বিভক্ত করে তাঁর কথাসাহিত্যে সমকালীন জনজীবনের বাস্তবতা ও অন্তর্জীবনের অভিঘাত নির্ণয়ের পাশাপাশি রচনার মূল বৈশিষ্ট্য, অভিমুখ, বিবর্তন ও সর্বোপরি লেখকের শিল্পচেতনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উপন্যাসের মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি সীমিত পরিসরে লেখকের গল্পের মনস্তত্ত্ব বিষয়েও আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কালানুক্রমিকভাবে বিশ্লেষণের কথা বলা হলেও এখানে বিভিন্ন পর্বকে সুনির্দিষ্ট কালরেখায় চিহ্নিত করা হয়নি।

অসীম সামন্তের *প্রসঙ্গ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী* (২০১৭) শীর্ষক গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্য নিয়ে একটি ব্যতিক্রমী আলোচনা। এ বইয়ে সীমিত পরিসরে লেখকের বিষয়গত স্বাতন্ত্র্যের নানা দিক অনুপুঙ্খ-সহ পর্যালোচনা করা হয়েছে; নির্ণয় করা হয়েছে তাঁর রচনায় গন্ধ ও হাসির ব্যবহারের বৈচিত্র্য। উত্তরসূরি কথাসাহিত্যিক সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গদ্যশৈলীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্যশৈলীর বিশেষত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনায় জ্যোতিরিন্দ্রের গদ্যশৈলীর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা হয়েছে। সীমিত আয়তনে হলেও যথোপযুক্ত তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এ অন্বেষণ করা হয়েছে। এছাড়া স্বল্প পরিসরে দৃকপাত করা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যের নারী প্রসঙ্গেও। তবে জ্যোতিরিন্দ্র ও সন্দীপনের কথাসাহিত্যে যৌনতার তুলনামূলক আলোচনা করা হলেও জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ এই গ্রন্থে উপেক্ষিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অসীম সামন্তের *হ্যাঁ, না, এবং জ্যোতিরিন্দ্র ও সন্দীপন* (২০০৭)

গ্রন্থেরই পরিবর্ধিত রূপ তাঁর আলোচ্য গ্রন্থ *প্রসঙ্গ: জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*। গ্রন্থকারের আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যের রচনাকৌশল বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে।

দেবশ্রী মণ্ডলের 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বহুমুখ ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প' (২০১৭) শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নানা দিক অন্বেষণের কথা বলা হয়েছে। এর একটি অধ্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে সময়ের অভিঘাতে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও যৌনতা প্রসঙ্গে সীমিত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। এ সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ থাকলেও তিনি সেই সুযোগ গ্রহণ করেননি।

অন্তরা ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : ছোটগল্পের স্বতন্ত্র শিল্পী' (২০১৮) শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সমাজবাস্তবতার চিত্র, প্রকৃতিচেতনা, মনস্তত্ত্ব, যৌনচেতনা, ব্যতিক্রমী মানসিকতা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত হলেও কার্যত যৌনচেতনা ব্যতিরেকে অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচিত হয়নি। 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ' শীর্ষক অধ্যায়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গল্পগুলো নিয়ে একে একে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে সামগ্রিকভাবে ছোটগল্পের স্বতন্ত্র শিল্পী হিসেবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ অভিসন্দর্ভটিতে স্থান পায়নি।

মধুমিতা সাহার 'মধ্যবিত্তের সত্তাসংকট : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্য' (২০১৫) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকটের নানা দিক নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনার প্রয়াস। দুটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আলাদাভাবে লেখকের গল্প ও উপন্যাসে বিধৃত মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকটকে নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে। মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে গবেষকের এই পর্যালোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।

জানামতে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গের চারটি সাহিত্য পত্রিকা – *অনুষ্টুপ* (১৪১৬ ব.), *গল্পমেলা* (২০১৭), *উজাগর* (১৪১৭ ব.) ও *জনপদ প্রয়াস* (২০০৪)। পত্রিকাগুলোর বিশেষ সংখ্যায় লেখকের জীবন ও কথাসাহিত্য নিয়ে অনেকের মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ সংকলিত হয়েছে। তাঁর গল্প-উপন্যাসকে নানাদিক থেকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে এসব আলোচনায়। এ সকল মূল্যায়নে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যে মধ্যবিত্ত, নারী-পুরুষের অবস্থান, সমকালের অভিঘাত, যৌনতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা স্থান পেলেও তাঁর গল্পের মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়নি।

উপরিউক্ত গ্রন্থ, অভিসন্দর্ভ ও পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার বাইরেও বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যকর্মের পর্যালোচনা স্থান পেলেও তাঁর গল্পের মনস্তত্ত্বের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়নি।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য-উৎস

বর্তমান অভিসন্দর্ভে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে মূলত পাঠবিশ্লেষণ পদ্ধতি (Text Analysis Criticism) ব্যবহৃত হয়েছে। সমকালীন কথাসাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ ও বিষয় এবং সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের প্রবণতা ও উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহও যেহেতু এই আলোচনার আওতাভুক্ত, সেহেতু এখানে তুলনামূলক পদ্ধতিও (Comparative Analysis Criticism) অনুসৃত হয়েছে। প্রয়োজনসাপেক্ষে কোনো কোনো অংশে মনঃসমীক্ষণমূলক সমালোচনার (Psychoanalytic Criticism) ধারাকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একক গল্পগ্রন্থ, গল্প সংকলন ও অগ্রন্থিত গল্প। সম্প্রতি তাঁর *গল্পসমগ্র*-র ১ম খণ্ড এবং *উপন্যাস সমগ্র*-র ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হলেও তাঁর অনেক গল্পগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত গল্প বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাই প্রাথমিক উৎস হিসেবে লেখকের প্রাপ্ত গ্রন্থ ও গল্পগুলোকেই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে রচিত নানা গ্রন্থ ও অভিসন্দর্ভ, তাঁর উদ্দেশে নিবেদিত বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন ওয়েব পোর্টাল ও গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশিত মূল্যায়ন, লেখকের নিজের ও তাঁর নিকটজনদের মুদ্রিত সাক্ষাৎকার, তাঁর পুত্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন সাহিত্যিকের গল্প ও তাঁদের নিয়ে সমালোচক-গবেষকদের মূল্যায়ন এবং কথাসাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব প্রসঙ্গে নানা লেখক, গবেষক ও মনঃসমীক্ষকদের পর্যালোচনা, গবেষণা ও বিভিন্ন বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ।

অধ্যায় বিন্যাস

অবতরণিকা ও উপসংহার ব্যতীত এই অভিসন্দর্ভ চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায় 'সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব'। যেহেতু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিকতার পর্যালোচনাই অভিসন্দর্ভটির প্রধান উদ্দেশ্য, সেহেতু মূল প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে সাহিত্য ও মনস্তত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রতিফলনের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা জরুরি। সেই লক্ষ্যে এই অধ্যায়ে সাহিত্য ও মনস্তত্ত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসাপেক্ষে সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের প্রতিফলন ও আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্বের চর্চা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জীবনকথা ও সাহিত্যচর্চা' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবন ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ও ক্রমপরিণতির দিকেও দৃকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন গল্পকার'-এ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যজীবনের সৃষ্টিশীল পর্বকে চিহ্নিত করে, সেই প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় রেখে, তাঁর সমসাময়িক গল্পকারদের সাহিত্যিক প্রবণতা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁদের ও জ্যোতিরিন্দ্রের ভাবনা ও প্রবণতার তুলনামূলক পর্যালোচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়টি এই অভিসন্দর্ভের কেন্দ্রীয় অধ্যায়। পরিসরের দিক থেকে বিস্তৃত হওয়ায় আলোচনার সুবিধার্থে এ অধ্যায়কে ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভাজিত করে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মনস্তত্ত্বের পৃথক প্রবণতাসমূহকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এর প্রথম পরিচ্ছেদ 'মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব'। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অধিকাংশ গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব নানা মাত্রায় রূপায়িত হয়েছে। তাই এই পরিচ্ছেদটি দিয়েই মূল অধ্যায়ের বিশ্লেষণ প্রয়াসের সূত্রপাত করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে লেখকের গল্পে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের বহুবিধ সংকটকে শনাক্ত করে সেগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদ 'নারী মনস্তত্ত্ব'। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে নারীদের একটি বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে তাঁর গল্পের বহির্বাস্তবের অন্তরালে নারীর মনস্তত্ত্বের বহুবিচিত্র রূপের অনুসন্ধান এবং তার বিকাশ ও পরিণতি বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা রয়েছে। 'নিসর্গচেতনা' এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে চরিত্রের মনস্তত্ত্বে নিসর্গ সুচারুরূপে প্রোথিত। তাঁর কিছু গল্পে ব্যক্তিমানসে নিসর্গের প্রভাবের শিল্পিত উপস্থাপন রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে সেসব গল্পকে চিহ্নিত করে মানব-মনে নিসর্গের প্রভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। 'প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব' এই অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদ। প্রেম ও যৌনতাকে ঘিরে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে বিচিত্র চেতনার অনুরণন লক্ষণীয়। এগুলোকে কেন্দ্র করে তাঁর চরিত্রদের মনোজগতে কখনো কখনো আপাত-অরাজকতা বা সামঞ্জস্যহীনতা সৃষ্টি হয়েছে, এবং এর ফলে চরিত্রগুলো ভিন্নভাবে বিকশিত হয়ে গল্পকে ব্যতিক্রমী ও বিশেষায়িত করে তুলেছে। এই পরিচ্ছেদে প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দিকগুলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করে, জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে এর প্রকাশের বিচিত্রতার সূত্র সন্ধান করা হয়েছে। 'কিশোর-মানস' এই অধ্যায়ের পঞ্চম পরিচ্ছেদ। কিশোর-মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কয়েকটি গল্প লিখেছেন। এই পরিচ্ছেদে বয়ঃসন্ধির ব্যাপ্তিকাল চিহ্নিত করে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রবণতাগুলোর উল্লেখপূর্বক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে উপস্থাপিত কিশোর-মানসের বিশ্লেষণ করে তাদের আচরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে এবং লেখকের গল্পে তাদের মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব নিরূপণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মৃত্যুচেতনা, নিয়তি, নানা মাত্রায় অবদমন প্রশমন, বার্ধ্যক্যজনিত কারণে মনস্তত্ত্বের নানা পরিবর্তন ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনার পরিসর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সেগুলো নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদ গঠনের অবকাশ

নেই। কিন্তু এই প্রবণতাগুলোর বিশ্লেষণ তাঁর গল্পের নানা চরিত্রকে অনুধাবনের পক্ষে জরুরি – এই বিবেচনা থেকে 'মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ' শীর্ষক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটিতে এ সকল প্রবণতার স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে।

অন্যান্য সীমানা

বর্তমান অভিসন্দর্ভে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্যশৈলী ও নির্মিতির বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক নয় বলে এ দিকটিকে বিস্তৃত আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। কিন্তু চরিত্রের মানস নির্মাণে তাঁর গদ্যভঙ্গির ভূমিকা এবং সেইসঙ্গে তাঁর গল্পের আঙ্গিকগত নিরীক্ষা ও তার ফলাফল অভিসন্দর্ভের অন্বিষ্ট হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অধ্যায়সমূহে প্রসঙ্গক্রমে সেগুলোর প্রতি দৃকপাত করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গদ্যশৈলী ও আঙ্গিকবীক্ষা নিয়ে পরবর্তীকালে বিস্তৃত পরিসরে পৃথক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। লেখকের অনেক গল্পগ্রন্থ ও অগ্রন্থিত গল্প বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য বিধায় এই অভিসন্দর্ভটি তাঁর প্রাপ্ত ও উদ্ধারকৃত গল্পগুলোর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভের উপজীব্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প, তাঁর উপন্যাস নিয়ে পর্যালোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে গল্পের পর্যালোচনায় প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসের কথাও উত্থাপিত হতে পারত, যা এখানে সচেতনভাবেই পরিহার করা হয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য, পরিসর ও পূর্বনির্দিষ্ট সময়সীমা এবং প্রাথমিক উৎসের সীমাবদ্ধতা দ্বারা বর্তমান অভিসন্দর্ভের এই সীমানাগুলো নির্ধারিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব

মানুষ যখন থেকে ভাবতে শুরু করেছে তখন থেকেই সে কোনো-না-কোনো শিল্প সৃষ্টি করতে শিখেছে। চিত্রকলা, সঙ্গীত কিংবা নৃত্যকলা – সমস্ত কিছুই মানুষের ভাবনা থেকেই উদ্ভূত। মানুষের সৃজন-ভাবনার অন্যতম প্রকাশ সাহিত্য। জাগতিক চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও সৌন্দর্য-ভাবনার লিখিত রূপ কিংবা লেখকের বাস্তব জীবনের অনুভূতির প্রকাশ সাহিত্য। সাহিত্যে মানবজীবনের শাশ্বত ও সমকালীন চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। সাহিত্য বিশেষ কোনো বিষয় বা পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সময়ের সঙ্গে সময়ের কিংবা এক প্রজন্মের সঙ্গে আরেক প্রজন্মের সংযোগ তৈরি করে। মানবজীবনের নানা দিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। জীবন-প্রবাহের বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাসমূহকে মন্থন করে আবেগের ক্রিয়াশীলতা ভাষার সৌন্দর্যে আশ্রয় লাভ করে সাহিত্যে। সাহিত্য ভাষার নান্দনিক বিস্তারের মাধ্যমে দেশ-কাল ও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে পাঠকের সংযোগ ঘটায়।

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

> প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্তমান কাল নহে, চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। . . .
>
> অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের ও ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলাই সাহিত্যের কাজ।
> (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সাহিত্যের বিচারক', ১৯৫৮ : ২৬)

সময়কে প্রতিবিম্বিত করার উল্লেখযোগ্য মাধ্যম সাহিত্য। সেই মাধ্যমে মানুষের যাপিত জীবন বিম্বিত হয়। সেখানে মানুষ নিজের এবং তার চারপাশের সকল চলমান অবয়বের প্রতিমুহূর্তের বিচরণশীলতা দেখে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে যে আপাত-নাটকীয়তা নির্মিত হয় তা দেখে, তার ধাবমানতা দেখে। একটি ঘটনার গায়ে আরেকটি ঘটনার ছন্দময় বিচরণ দেখে; উত্থান-পতন-বিকৃতি দেখে, তাদের চলমানতার পরিপ্রেক্ষিতে চলৎশক্তিরহিত সকল বস্তুর পরিবর্তন ও বিবর্তন দেখে। এমনকি আর যা যা দেখা সম্ভব বলে মানুষ কল্পনা করে তা এবং তারও অধিক অন্যান্য চিত্রকল্প দেখে। সেখানে রং-রেখার সূক্ষ্ম ও বর্ণিল বিস্তার পাঠকের কল্পনাকে আলোড়িত করে দিয়ে ভিন্ন সত্যে আবির্ভূত হয়, পাঠকের নিজস্ব

জগতের সমান্তরালে অপ্রাকৃত-অতিপ্রাকৃত জগতের উন্মোচন ঘটায়। মোট কথা, আমাদের যাবতীয় ভাবনা তার সকল সম্ভাবনা নিয়ে অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার জগৎকে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে চতুর্মুখে ছড়িয়ে দেয়।

সাহিত্যের যে বিস্তৃত ও সংজ্ঞাতীত জগৎ তার বিস্তারকে এভাবেও হয়তো সংজ্ঞায়িত করা যায়, তবে তা থেকে তার ব্যাপকতার অনুধাবনযোগ্য সামান্য অংশই উন্মোচিত হয়। সাহিত্যের বহুধাবিস্তৃতিকে তার একটিমাত্র প্রশাখা দিয়ে শনাক্ত করা দুরূহ। সাহিত্যের রূপরেখার বিচার করতে গেলে মানব-মনে তার প্রতিক্রিয়ার চালচিত্রটি চিহ্নিত করা জরুরি। নিচের বিশ্লেষণ তারই একটি ক্ষুদ্র ও খণ্ডিত প্রয়াস।

আমরা প্রতিনিয়ত যে জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াই তা আমাদের বাহ্য জীবন। এর বাইরে মানুষের আরেকটি ব্যক্তিজীবন রয়েছে যেখানে সে তার সকল সীমাবদ্ধতা ও অপরাগতাকে অতিক্রম করে। যা সে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি তার অজানা অবয়ব উন্মোচিত হয় সে জীবনে। এই দুই জীবনের মধ্যে সাহিত্য সেতুবন্ধন রচনা করে। শুধুমাত্র বাস্তবজীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে সময়ের অনুলিপি লিখনেই সাহিত্য সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং কল্পনা ও কল্পনাতীত যে অতীন্দ্রিয় জগৎ তাকে মন্থন করে অমৃত ও গরল উদ্ধার করে আনে। এই উদ্ধারাভিযান লেখকের তীব্র অনুসন্ধিৎসার ফল হলেও রসগ্রাহী পাঠকও তার সুফল ভোগ করে। জীবন ও মননের যে সামগ্রিকতা পাঠকের চেতনার বাইরে অবস্থান করে, তার সঙ্গে পাঠকের সংযোগ ঘটিয়ে সাহিত্য তাকে বিস্ময়ের মুখোমুখি করে দেয়।

সাহিত্য সমসাময়িক ও পরবর্তী পাঠকের জন্য প্রবহমান সময়ের অবয়ব তৈরি করে। আবার একইসঙ্গে সময়াতীত জগৎ পরিভ্রমণেও পাঠককে সাহায্য করে। অন্যদিকে পাঠকের অবচেতনে সাহিত্য আলোকবর্তিকা হিসেবেও কাজ করে। সর্বোপরি সাহিত্য সূক্ষ্ম জীবনবোধ নির্মাণ করে পাঠকের মানসজগতে।

মানব-মনের সংজ্ঞা নিয়ে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দীর্ঘদিনের। মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (১৮৮২-১৯১০) তাঁর *The Principles of Psychology* (১৮৯০) গ্রন্থে মানব-মনের অস্তিত্ব সম্পর্কে যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আমাদের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। এবং উদ্দেশ্য সফল করার জন্য অনেকগুলো উপায় থেকে একটি উপায় বেছে নেওয়া হলো মানসিক ক্রিয়ার লক্ষণ। মনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি হিসেবে চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতি, আবেগ-অনুভূতি প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়। তবে এই বৃত্তিগুলো স্বতন্ত্র হলেও তারা একইসূত্রে গাঁথা। এই সূত্র ভিন্ন একটি মানসিক বৃত্তি অন্য একটি বৃত্তিকে প্রভাবিত করতে পারে না। দেখা যায় মানুষের বিশেষ কোনো স্মৃতি তার চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারছে কিংবা তার বিশেষ কোনো অনুভূতি তার ইচ্ছাকে প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করছে। অর্থাৎ প্রতিটি মানসিক বৃত্তি অপরাপর মানসিক বৃত্তিকে কোনো-না-কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে। তার মানে এটি স্পষ্ট যে, পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র না থাকলে এই বৃত্তিগুলো একে অন্যকে প্রভাবিত করতে পারত না। এই

মানসিক বৃত্তিগুলোকে একই মনের বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, স্মৃতি ইত্যাদি বৃত্তির সমন্বয়কে মন বলে আখ্যায়িত করা যায়।

মানুষের মনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টা আধুনিক সময়ের কীর্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাফ ফকনার (১৮০৩-১৮৮৭) মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সেই শতকে মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা মানুষকে ততটা আলোড়িত করতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে সিগমুন্ড ফ্রয়েডের (১৮৫৬-১৯৩৯) *The Interpretation of Dreams* (১৮৯৯) ও *The Psychopathology of Everyday Life* (১৯০১) প্রকাশিত হলে মনস্তত্ত্বের স্বরূপ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচনা হয়।

মানব-মনের জটিল অন্ধিসন্ধি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রবণতাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থদ্বয়ে জানান, মানুষ তার নিজের মনের অধিকর্তা নয়; সে কেবল তার সচেতন অংশকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখে, যা তার সমগ্র মনের ক্ষুদ্র একটি অংশ। শুধুমাত্র চেতন স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিমনের সমগ্র রূপের পরিচয় নির্ণয় করা যায় না। তিনি জানান, শৈশব ও কৈশোরের যেসব কামনা মানুষ চরিতার্থ করতে পারে না, সেগুলো তাদের মনের অবচেতনে আশ্রয় নেয়, তাদের বিলোপ ঘটে না। মানব-মনের এইসব অবরুদ্ধ ও অসামাজিক কামনা উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বিভিন্ন ছদ্মবেশে বা বিকৃত রূপে চেতন স্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভুলভ্রান্তি, অগোচর আবেগ, স্বপ্ন, মুদ্রাদোষ, মনোরোগ ও মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি অবচেতন মনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন।

মনের উদ্দেশ্যগুলোর নানা উৎসকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন ফ্রয়েড। এগুলো হলো – অদস (id), অহম (ego) ও অধিশাস্তা (super-ego)। অদস মানব-মনের নিগূঢ়তম স্তর। একে অবচেতন মন কিংবা নির্জ্ঞান স্তরও বলা হয়। দেহ তা-ই করে যা অদস চায়। দেহের ইচ্ছা, ক্ষুধা, কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা সবই নিয়ন্ত্রণ করে এই অদস। আমরা যেগুলোকে সহজাত প্রবৃত্তি বলি সেগুলো অদসেরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষের ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয় তার মনের অবচেতনের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তির দ্বারা। অদসের নৈতিকতা বোধ নেই। সুখভোগই অদসের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সুখ-নীতি (pleasure principle) দ্বারা অদসের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বপ্নেও অদস কাল্পনিকভাবে সুখ অনুভব করে। অপরদিকে অহম বাস্তবতা মেনে চলে। তার কাজ হলো মানুষকে রক্ষা করা। সব দিক ভেবেচিন্তে, বাস্তব পরিস্থিতি যথাযথভাবে বিবেচনা করে কাজ করতে অহম অদসকে নির্দেশ দেয়। আর এদের সবার উপরে আছে অধিশাস্তা। বাস্তব পরিস্থিতিকে কোনোরকমে নিয়ন্ত্রণে রেখে অহম ইচ্ছাপূরণের উপায় বের করলে

অধিশাস্তা তাকে বাস্তবতা ও নৈতিকতা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। অধিশাস্তার কারণেই মানব-মনে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়, যা কখনো কখনো তার অজান্তেই তাকে বিদ্ধ করে।

জন্মগত গুণাবলি এবং পরিবেশ – এ দুটির সংঘাত ও সমন্বয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পর্কে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭), জর্জ মিলার (১৮৭৫-১৯৬১) প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকের একই মত – ব্যক্তিত্ব খুব অল্প বয়সেই পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েডের মতে পাঁচ বছর বয়স থেকে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটে; পরবর্তীকালে ব্যক্তিত্বের যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা মৌল কোনো পরিবর্তন নয়। পাঁচ বছরের শিশুটি যখন ষাট বছরের প্রৌঢ়ে রূপান্তরিত হয় তখনও তার ব্যক্তিত্বে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্ব স্থবির। বংশগত যে ব্যাপারটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটায় ফ্রয়েড তাকে লিবিডো (libido) বা কামপ্রবৃত্তি বলেছেন। মানব-মনে প্রগতিপন্থী (eros) ও প্রগতিবিরোধী (thanatos) নামক দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তি নিরন্তর ক্রিয়াশীল। ইরস জীবনমুখী শক্তি আর থ্যানাটস মৃত্যুমুখী। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধির প্রবৃত্তির মাধ্যমে জীবনমুখী শক্তির বিকাশ হয়। এই ইরসকেই ফ্রয়েড লিবিডো বা কামশক্তি বলেছেন। কামকে তিনি ভালোবাসা আখ্যা দিয়ে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ভালোবাসা-সহ নানা প্রবৃত্তির একত্রিত রূপই কাম। ফ্রয়েডের ভাষায় তাই কাম বলতে কেবল যৌনাকাঙ্ক্ষা বোঝায় না, যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি ভালোবাসা, এমনকি জড়পদার্থ এবং কাল্পনিক ধারণার অন্তরালেও কাম নিহিত থাকে। পরিবেশ দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে এগুলো এমন অবস্থানে পৌঁছেছে যে, এগুলোর মধ্যে সাধারণভাবে কামের অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু ফয়েডীয় তত্ত্ব অনুসারে, যে-কোনো ধরনের আকর্ষণই লিবিডো। তিনি দেখিয়েছেন যে, যৌন আকর্ষণ থেকেই মানুষের সকল আকর্ষণের উৎপত্তি (সুনীলকুমার সরকার ১৯৯৯)।

পরবর্তীকালে ফ্রয়েডের শিষ্য, প্রখ্যাত মনঃসমীক্ষক কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং (১৮৭৫-১৯৬১) জানান, লিবিডো শুধু যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, বরং তা ব্যক্তির সকল প্রকার প্রচেষ্টার মূল চালিকাশক্তি। ইয়ুঙের মতবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে দার্শনিক অঁরি বের্গসন-এর (১৮৫৯-১৯৪১) প্রাণশক্তিবাদ এবং উইলিয়াম ম্যাকডুগাল-এর (১৮৭১-১৯৩৮) সজীবতাবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আলফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৮), কারেন হোরনে (১৮৮৫-১৯৫২), এরিক ফ্রম (১৯০০-১৯৮০), হ্যারি স্টাক সুলিভান (১৮৯২-১৯৪৯), ওটো র‍্যাংক (১৮৮৪-১৯৩৯), লুডভিগ বিন্সওয়াঙ্গার-এর (১৮৮১-১৯৬৬) মতো অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষকগণ ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্বের বিরূপ সমালোচনা করেন। এই তত্ত্বের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে এঁরা

কেউ পুরোপুরি স্বীকার করেননি। অপরদিকে অনেক মনোবিজ্ঞানী লিবিডো-তত্ত্বকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যের জগতেও এই তত্ত্ব বিপুল অভিঘাত সৃষ্টি করেছে। যাঁরা লিবিডো-তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী।

প্রথমদিকে ফ্রয়েড ভেবেছিলেন, অবচেতন মনের বিষয়াবলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এর মধ্যে আমাদের বংশগত উপাদানও থাকতে পারে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা ও জিঘাংসাও কারো অবচেতনে সুপ্ত থাকতে পারে। বংশগত সূত্রে পাওয়া এই অবদমিত ইচ্ছেগুলো ব্যক্তির অবদমিত অভিজ্ঞতার চেয়েও অনেক শক্তিশালী হতে পারে (পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র ২০০১)।

দীর্ঘকাল মানব-মন সম্পর্কে গবেষণা করে ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষ তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা-বাসনা ও জিঘাংসার অবদমন আর উত্তরোত্তর উদ্বর্তন ঘটিয়ে মানব সভ্যতার প্রগতির রথকে সম্মুখে ঠেলে নিয়ে গেছে এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা জীবনমানের বিকাশ ঘটিয়েছে সত্যি, কিন্তু এই অবদমনের মূল্যও তাকে কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়েছে। এসব অবদমিত কামনা-বাসনা বিকৃত রূপে মানুষের জীবনে বারবার ফিরে এসেছে। মানবজীবনের এমন অবদমিত কামনা-বাসনার বিকার প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেন :

> রোগলক্ষণ, স্বপ্ন, ঠাট্টা-তামাশা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি কোনো মানসিক ঘটনাই আকস্মিক নয়। প্রত্যেকটি ঘটনার পেছনে মানসিক কারণ বিদ্যমান রয়েছে যা সেইসব ঘটনার জন্ম দেয়। অর্থাৎ আপাতভাবে কোনো মানসিক ঘটনার মানসিক কারণ সজ্ঞানে খুঁজে পাওয়া না গেলে তাকে আকস্মিক বা দৈব বলে ধরা ঠিক নয়। কারণ ঘটনাটির কার্যকারণ সজ্ঞান মনে না থাকলেও নির্জ্ঞান মনে আছে, বর্তমানের ঘটনার মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া না গেলে শৈশবের ঘটনার মধ্যে তার উৎস প্রোথিত আছে। মনঃসমীক্ষণের সাহায্যে শৈশবের অবদমিত ইচ্ছা, কামনা-বাসনা খুঁজে বের করে আনতে পারলে তবেই ঐ কারণের সন্ধান পাওয়া যায়। (সিগমুন্ড ফ্রয়েড ২০০১ : ৩৪-৩৫)

পরবর্তী পর্যায়ে মনোবিজ্ঞানী এইচ. সি. মিলার (১৮৭৭-১৯৫৯) তাঁর *Psychoanalysis and Its Derivatives* (১৯৪৫) গ্রন্থে মানব-মনের আদিম প্রবৃত্তি অদসের বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করে সেগুলো সম্পর্কে আরো পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হন। তাঁর মতে, অবদমিত বাসনা অবচেতনে

সুপ্ত থাকে, এবং এটি অনৈতিক – যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়, এবং জীবনমুখী ও মৃত্যুমুখী সমস্ত প্রবৃত্তিগুলোই এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

তবে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জার্মান মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কারেন হোরনের স্নায়বিক চাহিদা তত্ত্ব (Neurotic needs theory) ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। হোরনে দীর্ঘকাল মানব-মনের উপর গবেষণা করে তাঁর *Self-analysis* (১৯৪২) গ্রন্থে মানুষের স্নায়বিক চাহিদার ক্ষেত্রে দশটি মৌল প্রবণতার কথা জানান। তাঁর মতে, মানুষ নির্ভরযোগ্য সঙ্গী চায়। সে ভালোবাসার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং তার সেই সঙ্গী তার সকল সমস্যা সমাধান করে দেবে এমন প্রত্যাশা করে। কেউ কেউ নিজের চাহিদাকে গৌণ মনে করে, ফলে স্বীয় প্রতিভাকে অবমূল্যায়িত করে নিজের ব্যক্তিত্বের সঠিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। মানুষ ক্ষমতা চায় এবং বিশ্বাস করে যে, ক্ষমতার মাধ্যমে সব জয় করা যাবে। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও অসহায়তাকে সে ভয় পায়। মানুষ নিজেকে সর্বোৎকৃষ্ট মনে করে এবং অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান দিয়ে নিজেকে মূল্যায়িত করে। বিব্রতকর পরিস্থিতিকে তারা ভয় পায়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। আত্মপ্রেমে মগ্ন থেকে মানুষ নিজেকে যথাসম্ভব উন্নত ভাবতে পছন্দ করে। নার্সিসিজম বা আত্মপ্রেম তাকে মুগ্ধ করে রাখে এবং এ কারণে তার প্রত্যাশাও বহুগুণে বেড়ে যায়। অন্যদের চেয়ে উন্নততর অবস্থানে সে যেতে চায়। যে-কোনো ধরনের ব্যর্থতাকে সে ভয় পায়। মানুষ স্বনির্ভর ও নিখুঁত হতে চায়। নিজেকে সে সবসময় সাফল্যের শীর্ষ অবস্থানে দেখতে চায় (Horney 1994)।

উত্তরকালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী এরিক ফ্রম একজন মানুষের সফল ও সম্পূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠা এবং বিভিন্ন ধরনের সংকট সমাধান ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে তার আটটি সংঘাতময় স্তরের কথা উল্লেখ করেন। এক বছরের শিশু থেকে ষাট বছরের প্রৌঢ়ের উপর গবেষণা চালিয়ে তিনি মানব-ব্যক্তিত্বের বিকাশক্ষেত্রকে এই আটটি স্তরে বিভাজন করেন। বিশ্বাসের বিপরীতে অবিশ্বাস, স্বায়ত্তশাসনের বিপরীতে লজ্জা কিংবা দ্বিধা, উদ্যোগের বিপরীতে অপরাধবোধ, শিল্পের বিপরীতে হীনম্মন্যতা, পরিচয়ের বিপরীতে পরিচয়-বিভ্রান্তি, ঘনিষ্ঠতার বিপরীতে পারস্পরিক দূরত্ব, উৎপাদনশীলতার বিপরীতে স্থবিরতা এবং অখণ্ডতার বিপরীতে হতাশা কীভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে মানুষকে তার এক বছর বয়স থেকে ষাট বছর বয়স পর্যন্ত বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত করে, তা এরিক ফ্রম গবেষণার মাধ্যমে উন্মোচন করেন (Cherry 2020)।

পরবর্তী পর্যায়ে ভারতবর্ষেও মনঃসমীক্ষণ চর্চার সূচনা হয়। এই উপমহাদেশে মনঃসমীক্ষণ অনুশীলনের সূত্রপাতকে কয়েকটি কালানুক্রমিক ঘটনার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এতদঞ্চলে মনঃসমীক্ষণ চর্চার পথিকৃৎ গিরীন্দ্রশেখর বসু (১৮৮৬-১৯৫৩)। জার্মান ভাষা শেখার পূর্বেই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ফ্রয়েডের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রচনার ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ও নিজস্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতে

মনঃসমীক্ষণ চর্চার সূচনা করেন তিনি। ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগের কার্যক্রম শুরু হলে ১৯১৭ সালে তিনি এই বিভাগ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। গিরীন্দ্রশেখর ১৯২১ সালে *The Concept of Repression* শীর্ষক গবেষণা-অভিসন্দর্ভ রচনা করে মনোবিদ্যা বিষয়ে কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডিএসসি (পিএইচডি) ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। পরবর্তীকালে একই বিভাগে অধ্যাপনাকালে তিনি মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে পাঠদান করেন। তাঁর আগ্রহে মনোবিজ্ঞান বিভাগে মনঃসমীক্ষণের আলোকে অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ১৯২০-এর দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মাত্র দুটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯২১) ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৪) – মনোবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩০-এর দশকে ফ্রয়েডের সঙ্গে গিরীন্দ্রশেখর বসুর পত্র মারফত যোগাযোগ হয়; এসব চিঠি থেকে নানা বিষয়ে তাঁদের মতবিনিময় ও মতভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে গিরীন্দ্রশেখরের প্রথম গ্রন্থ *The Concept of Repression* (১৯২১)। তাঁর রচিত *স্বপ্ন* (১৯২৮) মনঃসমীক্ষণ তথা স্বপ্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বই। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য *Glossary for the Use of Translators of Psycho-Analytic Works* (আর্নেস্ট জোন্সের সঙ্গে যৌথভাবে রচিত, ১৯২৬), *Everyday Psychoanalysis* (১৯৪৫), *The Beginnings of Psychoanalysis in India: Bose-Freud Correspondes* (১৯৯৯) ইত্যাদি।

গিরীন্দ্রশেখর বসুর উদ্যোগে ১৯২২ সালে Indian Psychoanalytic Society প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি গবেষণা পত্রিকা *Samiksha* আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালে সোসাইটির উদ্যোগে লুম্বিনি পার্ক মেন্টাল হসপিটাল প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরীন্দ্রশেখর এখানে Proto-psychiatry চর্চা করেন। ১৯৫৯ সালে সোসাইটির বাংলা গবেষণা পত্রিকা *চিত্ত* প্রকাশিত হয় (Anup Dhar 2018)।

প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী মহলানবীশ ১৯২৬ সালে ভিয়েনায় ফ্রয়েডের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় গিরীন্দ্রশেখর বসুর দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। এর পর-পরই মহলানবীশ দম্পতির আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রয়েডের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের রচনা সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না। মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে নানা উপলক্ষ্যে বিচ্ছিন্নভাবে কবির বিরূপ প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকালে – ১৯৩৮-১৯৩৯ সালে – তাঁর একদা-সেক্রেটারি কবি অমিয় চক্রবর্তীর উৎসাহে তিনি ফ্রয়েড, ইয়ুং ও অ্যাডলারের কয়েকটি রচনার সঙ্গে

পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের সাহিত্য ও চিত্রকলা-চর্চায় মনের অবচেতন স্তর সংক্রান্ত আগ্রহের নেপথ্যে এই পাঠ বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকতে পারে (Santanu Biswas 2003)।

গুস্তাফ ফকনার থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মানব-মন নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে; তবে বিশ শতকের চিন্তাজগতে মূলত ফ্রয়েডের তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফ্রয়েডের প্রভাবে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা মানব-মনের দুর্জ্ঞেয় দিক সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মনস্তাত্ত্বিক পর্যালোচনার অনুপ্রেরণায় অনেক লেখক চরিত্রের আচরণ আর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ও বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। 'ফ্রয়েডের সংকেত অনুসরণে মানসিক সর্পিলতার পথে জীবন-রহস্যের মূল কেন্দ্র অনুসন্ধান করা প্রথম যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় কথাসাহিত্যের অন্যতম প্রধান ধারায় পরিণত হয়েছিল' (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৬৪ ব. : ১৫৫-১৫৬)।

এ পর্যায়ে কথাসাহিত্যে ঘটনাপ্রবাহের সংকোচন ঘটে, চরিত্রায়ণ প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ইতঃপূর্বে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের যাপিত জীবনের বাস্তবতাকে নানারকম পরিস্থিতির মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়ে তার বা তাদের সমূহ সম্ভাবনার বিবরণ সাহিত্যের উপজীব্য হলেও বিশ শতকে মানুষের মানসজগৎ সম্পর্কিত সকল ধারণা পাল্টে যাওয়ায় সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের অন্তর্জগতে প্রবেশের সিংহদ্বারটি আবিষ্কার করে। সাহিত্যিকেরা চেতন মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় মানসজগতের অনালোকিত অংশে আলো ফেলেন। তাঁরা চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তার অবচেতন মনের গভীরতম প্রদেশের নিগূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় উপস্থাপনকে মুখ্য করে তোলেন নিজেদের রচনায়। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, পাত্রপাত্রীর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপে তাদের সমগ্র পরিচয় উন্মোচিত হয় না। চরিত্রকে পূর্ণতা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি সক্রিয় ভূমিকা রাখে, তাদের পরিচয়ও প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। তাই সাহিত্যিকেরা অবচেতন মনের অবদমিত আবেগ-অনুভূতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে মনোযোগী হন। চরিত্রকে শিল্পসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তাঁরা 'সাহিত্যিক-চরিত্র' সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন। সাহিত্যিক-চরিত্র বাস্তব চরিত্র থেকে কিছুটা পৃথক। এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য :

> . . . একদিকে সে বাইরের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে সে অন্তর্জীবনের আলোড়নে আলোড়িত। এই দ্বিমাত্রিক গতিবিধি নিয়েই তার তথাকথিত 'চরিত্র' নামটি সার্থক। এই সূত্রেই সাহিত্যিক চরিত্র বাস্তব চরিত্র থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জীবন যাপন বা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তব মানুষের গতিবিধিকে আমরা বাইরে থেকে দেখি। আর সাহিত্যিক চরিত্রকে একই সঙ্গে আমরা ভিতরে বাইরে দেখি। (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ২০০৮ : ৪৯)

ছোটগল্পের আয়তন সীমিত হওয়ায় ঘটনাপ্রবাহের চাইতে চরিত্রের গতিবিধি সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। চরিত্রের মনের অতলে প্রোথিত পুঞ্জীভূত ভাবনা ও ভাষার সঙ্গে পরিপার্শ্বের বিক্রিয়া ঘটিয়ে লেখক চরিত্রের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া তুলে ধরেন। চরিত্রটি তখন বাস্তব হওয়া সত্ত্বেও তার সতত চিন্তাশীল মানসজগৎ নিয়ে সাহিত্যিক-চরিত্র হিসেবে হাজির হয় পাঠকের সামনে। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার কেবল দুটি মাত্রার কথা উল্লেখ করলেও রচনাশৈলীর গুণে তা দুইয়ের অধিকও হয়ে উঠতে পারে। কারণ চরিত্রের মনোজগতের বিস্তৃতি আরো ব্যাপক। এটি ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির মিথস্ক্রিয়ায় অসংখ্য নতুন ঘটনা বা ভাবনার উদ্রেক ঘটাতে পারে। চরিত্রের মনোজগতের উপর লেখকের নিয়ন্ত্রণ-দক্ষতার পরিপ্রেক্ষিতে নিত্যনতুন আবিষ্কারের সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়। সাহিত্যিকের রচনাকুশলতার গুণে সাহিত্যিক-চরিত্রটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে, চরিত্র হিসেবে অক্ষয় মর্যাদা পায়।

গল্প-উপন্যাসে চরিত্র তার সচেতন, অচেতন ও অবচেতন মন নিয়ে প্রকাশিত না হলে তাতে পূর্ণাঙ্গতা আসে না। ফ্রয়েড-পূর্ব সময়ে সাহিত্যে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব গুরুত্ব পেলেও তার মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে সাহিত্যিকদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অন্যদিকে এ কথাও অনস্বীকার্য যে, মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ফ্রয়েডের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আবিষ্কার তাঁর পূর্ববর্তী মহৎ সাহিত্যিকদের রচনার কাছেও নানাভাবে ঋণী :

> Freud says that much of what he has discovered was already known to us in the works of Goethe and the great German writers, because the artist has privileged access to otherwise unknown realms. (Palmer 2006 : 191)

ফ্রয়েড কর্তৃক প্রবর্তিত 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' তত্ত্বের নামকরণে প্রাচীন ধ্রুপদী যুগের গ্রিক নাট্যকার সফোক্লেস (৪৯৭/৪৯৬ খ্রি.পূ.-৪০৬/৪০৫ খ্রি.পূ.)-এর নাটক *Oedipus Rex*-এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সুস্পষ্ট। অন্যদিকে, সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে ইংরেজ কবি-নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬) প্রণীত নাটক *Hamlet* (১৫৯৯-১৬০১)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হ্যামলেট সাহিত্যে দ্বিধাদীর্ণ মানব-সত্তার মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণের এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে তুলনামূলকভাবে নতুন প্রকরণ উপন্যাসের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক তীব্রতার একটি নতুন মাত্রা সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়। পাশ্চাত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে, সমাজ ও প্রকৃতির সঙ্গে মনের সম্পর্কের সামগ্রিক কাঠামোটি সাহিত্যের কেন্দ্রীয় উপজীব্য হিসেবে বিবেচিত হতে শুরু করে (Palmer 2006 : 190-191)।

সাহিত্য ও মনস্তত্ত্বের প্রাচীন যোগাযোগের উদাহরণ হিসেবে প্রসঙ্গত আনুমানিক ৫ম শতকে সক্রিয় ভারতীয় মহাকবি কালিদাসের *শকুন্তলা* নাটকটির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মানব-মন নিয়ে ব্যাপক গবেষণার বহু পূর্বেই এই সংস্কৃত নাটকে মন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। নাটকটির

চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায় – অতিথি দুর্বাসা শকুন্তলার কুটিরে উপস্থিত হলে সে তাঁকে উপযুক্ত সংবর্ধনা জানায়নি। এ প্রসঙ্গে শকুন্তলার সখী প্রিয়ংবদা অনসূয়াকে বলে – ‘দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া রহিয়াছে; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্ত্বাবধান করিতে পারে’ (কালিদাস ২০০৯ : ২৬)। প্রিয়ংবদার এই উক্তিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে শকুন্তলার অবচেতন মনের দিকে, যেখানে সদ্য-বিগত চিন্তাভাবনা, স্মৃতি ও অবরুদ্ধ আবেগ সঞ্চিত থাকে। শুধু তা-ই নয়, রাজা দুষ্মন্তকে কেন্দ্র করে শকুন্তলা দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকার কারণেই সে দুর্বাসা মুনির আগমন টের পায়নি।

আবার নাটকের পঞ্চম অঙ্কে দেখা যায়, দাসী হংসপদিকার গান শুনে রাজা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন এবং তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন – ‘কেন এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত এমন ব্যাকুল হইতেছে? প্রিয়জন ব্যতিরেকে মনের এরূপ আকুলতা হয় না; কিন্তু প্রিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না’ (কালিদাস ২০০৯ : ২০)। নিজের ভাবাবেগের এই আকস্মিক পরিবর্তন রাজা ব্যাখ্যা করতে পারছেন না, কিন্তু এটুকু অনুধাবন করতে পারছেন যে, গানের কথা ও সুরের সমন্বয়ে সৃষ্ট আবেগের আলোড়ন তাঁর চিত্তকে চঞ্চল করে তুলেছে। আবার :

> মনুষ্য, সর্বপ্রকারে সুখী হইয়াও, রমণীয় বস্তু দর্শন কিংবা মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, যে অকস্মাৎ আকুলহৃদয় হয়, বোধ করি, অনতিপরিস্ফুটরূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য তাহার স্মৃতিপথ আরূঢ় হয়। (কালিদাস ২০০৯ : ২৯)

এখানে জন্মগত কোনো স্মৃতি মানুষের চেতনা বা চেতন মনের উপরিতলের কোনো জাগ্রত স্মৃতির প্রতি ইঙ্গিত করছে না, অবচেতন মনের গুপ্ত স্মৃতির প্রতি ইশারা করছে। কেবল কালিদাসের সাহিত্যেই নয়, ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণ-পূর্ববর্তী যুগের সকল দেশের সাহিত্য, ধর্ম ও লোকশাস্ত্রে অবচেতন মন সম্পর্কে মানুষের অস্পষ্ট ধারণার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। মনের এই স্তরটি সম্পর্কে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষের কোনো স্পষ্ট ও তাত্ত্বিক ধারণা না থাকলেও তারা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আকারে-ইঙ্গিতে এই অবচেতন মনের আভাস দিয়েছে, কিন্তু যথার্থ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সাহায্যে তাকে চিহ্নিত করতে পারেনি।

সাহিত্যের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মনের বিচরণশীলতার কথা জানা গেলেও তার পরিধি ও গভীরতা নির্ণয় করা যায়নি, ফলে সেই সময় তাকে ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। তবে এটুকু জানা ও জানানো গেছে যে, মনের বিচরণভূমি বহুবিস্তৃত, দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যজটিল। সেই সময়ে এই বিস্তৃতির রহস্যময়তা সম্পর্কে কোনো তাত্ত্বিক ধারণা না থাকায় এই দুর্জ্ঞেয় অংশটির অনুধাবনযোগ্য কোনো স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে তখন চরিত্রের মন প্রসঙ্গে সচেতন অভিনিবেশের সুযোগ তৈরি হয়নি। ফ্রয়েড-পরবর্তী লেখকেরা মনঃসমীক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণার কল্যাণে এই সুবিধা পেয়েছেন

এবং এর পর্যাপ্ত সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কেবল সৃজনশীল সাহিত্যেই নয়, সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রেও মনঃসমীক্ষণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে : 'Since the 1920s, a widespread type of psychological literary criticism has come to be psychoanalytic criticism' (Abrams and Harpham 2012: 321). এই পর্যায়ে ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণকে সময় ও সমাজব্যবস্থার জারকে জারিত করে বাংলা সাহিত্যেও সামাজিক মানুষের ব্যক্তিমনের অতলান্তকে অবমুক্ত করার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই চরিত্রের মনোজগৎকে সবিশেষ গুরুত্ব দানের মাধ্যমে এক 'নবপর্যায়'-এর সূচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেন – 'সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৮ ব. : ২১২)। এই উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ পাত্রপাত্রীর অন্তর্জগতের দ্বন্দ্বসংঘাতের চিত্র রূপায়িত করেছেন। ফ্রয়েডীয় চিন্তার ক্রমপ্রসারমান প্রভাবের প্রায় সমসাময়িক কালে রচিত হলেও এ কথা বলা যাবে না যে, ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ *চোখের বালি* উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর 'আঁতের কথা'কে সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। কেননা ফ্রয়েডের *The Interpretention of Dreams* (১৮৯৯) ও *Psychopathology of Everyday Life* (১৯০১)-এর জার্মান সংস্করণ *চোখের বালি* উপন্যাসের প্রায় সমসময়ে রচিত হলেও, জার্মান ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ব্যুৎপত্তি ছিল না; এই দুটি গ্রন্থ মূল ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হয় যথাক্রমে ১৯১৩ ও ১৯১৪ সালে। সুতরাং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-প্রধান কথাসাহিত্য রচনার সূচনা ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে এবং সেটি কোনো অবস্থাতেই ফ্রয়েড দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়।

তবে ফ্রয়েডের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে কল্লোল গোষ্ঠী ও তৎকালীন লেখকদের মধ্যে সাহিত্যে চরিত্রায়ণের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ সংক্রান্ত আলোচনায় কালচিহ্নিত 'কল্লোল যুগ'-এর উদাহরণ আলাদাভাবে টানা হলেও সমকালের অন্য লেখকেরা বরং এক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রবর্তী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লেখকদের এই প্রবণতা আরো শানিত হয়েছে।

কথাসাহিত্যে চরিত্র ও চরিত্রায়ণ শব্দ দুটি সমার্থক নয়। ব্রিটিশ সমালোচক রিচার্ড গেইল-এর ভাষায় :

> A character is a person in a literary work. Characterization is the way in which a character is created. . . . characterization is a method and character the product. (Gail 1995 : 35)

অন্যদিকে ই. এম. ফরস্টার তাঁর *Aspects of the Novel* (১৯২৭) গ্রন্থে দুই ধরনের চরিত্রের কথা বলেন। এর মধ্যে প্রথমটি একক ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী চরিত্র এবং দ্বিতীয়টি একাধিক ধারণা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী চরিত্র, যে দুটিকে যথাক্রমে নির্মাত্রিক ও পূর্ণমাত্রিক চরিত্র হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। পূর্ণমাত্রিক চরিত্রের প্রধান মানদণ্ড হচ্ছে উপস্থাপনের বিস্ময়কর বিশ্বাসযোগ্যতা। এই বিশ্বাসযোগ্যতা কেবল তখনই নিশ্চিত হয় যখন চরিত্রের নির্জ্ঞান ও সজ্ঞান উভয় মনের প্রতিফলন প্রকাশিত হয় সাহিত্যে (Forster 1927)।

মানব-মনের নিগূঢ়তম রহস্যের প্রতি অভিনিবেশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর জগদীশ গুপ্তের (১৮৮৬-১৯৫৭) নাম উল্লেখযোগ্য। কল্লোল ও কল্লোল-উত্তর যুগে কথাসাহিত্যে চরিত্র তার পূর্ণমাত্রিক রূপে প্রতিভাত হয়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে, যা সমগ্রতা লাভ করে প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮২), কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) প্রমুখের উন্মীলিত অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী লেখনীর শক্তিতে। বলা বাহুল্য, তাঁরা সকলেই একই প্রবাহের অনুসারী নন, বরং চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে এঁদের প্রত্যেকেরই ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। জগদীশ গুপ্তের নিয়তি-লাঞ্ছিত যৌনপ্রবৃত্তি-কাতর চরিত্রসমূহের নৈরাশ্যবাদী অবস্থানের বিপরীতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক ক্ষেত্রে আশাবাদে আস্থা রেখেছেন। তাঁর চরিত্ররা চেতন-অবচেতনের দোলাচলে নিষ্পেষিত হলেও পরাস্ত হতে অস্বীকার করেছে। মননের প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে তাঁর চরিত্রের উত্থান ও বিলয় সত্ত্বেও বেঁচে থাকার তীব্র প্রাণশক্তিকে লেখক অভিনন্দিত করতে চেয়েছেন নিজের রচনায়। অন্যদিক সুবোধ ঘোষ তাঁর নিজের সৃষ্ট আত্মপ্রতারক মধ্যবিত্ত চরিত্রসমূহের দ্বিধাদীর্ণ মানসিকতার তীব্র সমালোচক রূপে আবির্ভূত হন। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিজের চরিত্রদের কুটিল মনস্তত্ত্বের ঘূর্ণিচক্র থেকে উত্তীর্ণ করতে চাওয়া সত্ত্বেও তাদের ধিক্কার জানাতে ভোলেননি। এদিক থেকে তাঁরা দুজন যোগ্য সহযাত্রী। মধ্যবিত্ত-মানস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উভয়ের কৃতিত্ব তুলনীয়।

নির্মম জীবন-বাস্তবতা ও মানবতার অবক্ষয় কল্লোল ও তার সমকালের লেখকদের লেখার উপজীব্য বিষয় ছিল। সেই বাস্তবতাকে উপস্থাপন করতে গিয়ে কেউ বিস্তৃত পটভূমি বেছে নিয়েছেন, আবার কেউ ব্যক্তিমানসের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দিয়ে সমগ্রের ক্ষয়িষ্ণুতাকে ধরার চেষ্টা করেছেন। মনস্তত্ত্বকে অবলম্বন করে নিদারুণ সমাজ-চিত্রণের ক্ষেত্রে সেই সময়ের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র। তবে তাঁর সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নিরাবেগ নিষ্ঠুরতার প্রকাশ নেই, তিনি বরং মমত্ববোধের শুভবিশ্বাসে আস্থাশীল। মনোলোকের জটিলতা বিশ্লেষণে দুজনেই ছিলেন সমান আগ্রহী।

বিশ্বযুদ্ধোত্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের পটভূমিতে মানিক মানুষের মনকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন; নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেদিকে না গিয়ে মানব-মনের বিভিন্ন পর্যায়কে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন।

সুতীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরাধিকারী সন্তোষকুমার ঘোষ। ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ও হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতি প্রকাশে সংশয়াতীত নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এ সময়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক। মনস্তত্ত্বের সানুপুঙ্খ ব্যবচ্ছেদ তাঁর গল্পে হয়তো নেই, তবে সেসব গল্পের কাহিনির ব্যাপ্তিতে চরিত্রের অন্তর্গত ক্ষরণের চোরা স্রোত প্রায়শ ধরা পড়ে। সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যবচ্ছেদের আরেকজন নিপুণ শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর অসংখ্য গল্পের ঘটনাপরম্পরায় চরিত্রের মানসজগতের গলিঘুপচি আলোকিত হয়ে উঠেছে। মননশীল অন্তর্ভেদী দৃষ্টির আলো জ্বেলে তিনি মানব-মনের সর্পিল ও অন্ধকার পথকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন; সাংকেতিক ব্যঞ্জনাগর্ভ মন্তব্যে শিল্প-সম্ভাবনাকে বিস্তৃত করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রকৃত মিত্র এক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তবে বিস্তার নয়, গভীরতাই শেষোক্ত জনের সম্পদ। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পূর্ণ প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। তাতে তিনি নিজের সমকালীন বাস্তবতার পরিচয় মুদ্রিত করে দিয়েছেন। এছাড়াও কাছাকাছি সময়ে কমলকুমার মজুমদার-সহ আরো অনেক কথাসাহিত্যিক ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের সাহিত্যিক বিবরণ প্রকাশ করেছেন, যা মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বস্তুত এই সাহিত্যিকদের কেউই চরিত্রের মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিকতাকে অস্বীকার করেননি।

লেখকের কল্পনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রমুখী সত্তার মিথস্ক্রিয়ায় কথাসাহিত্যের চরিত্র নির্মিত হয়। গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের অস্তিত্বের অনুধ্যান মূলত লেখকের স্বনির্মিত কাল্পনিক জগৎ। লেখকের স্বনির্মিত এই কল্পনারাজ্যের চরিত্রগুলো সবসময় বাস্তবের মানুষজনের হুবহু প্রতিরূপ নয়। প্রত্যেক মানুষ চেতন বা অবচেতন মনে অনেকগুলো সত্তাকে লালন করে থাকে। একটি মহৎ চরিত্র যেমন লেখকের একটি বিশেষ সত্তা, তেমনি একটি বর্বর নৃশংস চরিত্রও তাঁর আরেকটি সত্তা। প্রত্যেক লেখক তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্মে যতগুলো চরিত্র সৃষ্টি করেন প্রত্যেকটি চরিত্রই লেখকের শিল্পীসত্তার এক-একটি স্বতন্ত্র অংশ।

একজন সৃষ্টিসফল সাহিত্যিক তাঁর সামগ্রিক রচনায় নিজের মনোজগতের ভাবনাকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে মূর্ত করে তোলেন; নিজেকেই বারবার ভেঙে প্রতিবার নতুন করে নির্মাণ করেন। তাঁর চেতন-অচেতনের সকল অভিজ্ঞতা আর সঞ্চিত স্মৃতির ক্রিয়া-বিক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রের অবয়ব নির্মিত হয়। রচনাশৈলীর গুণে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র বাস্তবতার সীমানা ডিঙিয়ে পরাবাস্তব অধিবাস্তব জগতে অবতীর্ণ হতে পারে, কোনো অবস্থাতেই অবাস্তবতায় পর্যবসিত হয় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ফ্রানৎস কাফকার (১৮৮৩-১৯২৪) *The Metamorphosis* (১৯১৫) উপন্যাসে যে বাস্তব-উত্তর পরিস্থিতির চিত্রায়ণ ঘটেছে

তা বাস্তবতারই একটি সমান্তরাল রূপ। এ কারণেই তিনি সফল আধুনিক ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা শিল্পী হিসেবে স্বীকৃত।

বর্তমান সময়ে শিল্প-সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের রূপায়ণ অপরিহার্য। বাংলা সাহিত্যে এখন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। সাম্প্রতিক কালের সাহিত্যিকেরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে আধুনিক মনস্তত্ত্বের ধারাবাহিক পট-পরিবর্তনকে কেন্দ্রীয় গুরুত্বের আসনে রেখেছেন। এসব রচনার সবই যে কালোত্তীর্ণ হয়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে এমন নয়; তবে সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের গুরুত্ব সফল লেখকদের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় লেখকদের মর্মমূলেও প্রোথিত হয়ে গেছে।

সহায়কপঞ্জি

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (২০০৮), 'চৈতন্যের গভীরে', *উপন্যাসে জীবন ও শিল্প*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

কালিদাস (২০০৯), *কালিদাসের শকুন্তলা*, অনুবাদ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা : রহমান হাবিব, বুকস ফেয়ার, ঢাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৬৪ ব.), 'ষষ্ঠ প্রসঙ্গ [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়]', *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র (২০০১), *সিগমুন্ড ফ্রয়েড : মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, ভাবানুবাদ : পুষ্পা মিশ্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজেস, কলকাতা

ফ্রানৎস কাফকা (২০১১), 'রূপান্তর', *কাফকার নির্বাচিত গল্প*, অনুবাদ : কবীর চৌধুরী, সময় প্রকাশন, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৬১), 'ভূমিকা, চোখের বালি', *রবীন্দ্র রচনাবলি ৮ম খণ্ড*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

– (১৯৫৮), *সাহিত্য*, ৩য় সংস্করণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

সুনীলকুমার সরকার (১৯৯৯), *ফ্রয়েড*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

Abrams, M. H. and Harpham, Geoffrey Galt (2012), *A Glossary of Literary Terms*, 10th edition, Wadsworth, Boston

Anup Dhar (2018), 'Girindrasekhar and the History of Psychoanalysis in India', *Indian Journal of History of Science*, vol. 53, no. 4

Cherry, Kendra (2020), 'Fromm's Character Orientations', *https://www.verywellmind.com/fromms-five-character-orientations-2795956#:~:text=Erich%20Fromm%20was%20a%20neo,created%20by%20feelings%20of%20isolation. (Accessed : 02-02-2021)*

Forster, E. M. (1927), *Aspects of the Novel*, Edward Arnold, London

Gail, Richard (1995), *Mastering English Literature*, Macmillan Press Ltd, London

Horney, Karen (1994), *Self-analysis*, W.W. Norton and Company, New York

Palmer, D. J. (2006), 'Psychology and Psychoanalysis', *The Routledge Dictionary of Literary Terms*, Eds. Peter Childs and Roger Fowler, Routledge, New York

Santanu Biswas (2003), 'Rabindranath Tagore and Freudian Thought', *The International Journal of Psychoanalysis*, vol. 84

দ্বিতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জীবনকথা ও সাহিত্যচর্চা

> আজ আমি বুঝি তখনও আমার ভাললাগার বোধ জন্মায়নি। ভাসানের দিনে তিতাসের বুকে কত ঠাকুর। শহরে আর কটা পুজো। দূর-দূরান্তের সব গ্রাম থেকে নৌকায় করে বড় বড় দুর্গাপ্রতিমা এসে ভিড়েছে শহরের বাজারের ঘাটে। যেন বিসর্জনের আগে শহরের মানুষকে ঠাকুর না দেখালে গাঁয়ের লোকের মন উঠত না। তেমনি পয়লা ভাদ্রের নৌকা-দৌড়! শতশত নৌকা সেদিন তিতাসের জলে ছুটোছুটি করছে, বিচিত্র দৃশ্য! আর পাঁচটি শিশুর মতন ভাল জামা-কাপড় পরে নৌকা-দৌড় দেখতে গেছি। এই পর্যন্তই। খুব একটা উৎসুক দিশেহারা হতে পারিনি যেন। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২১৮)

সেই সুদূর শৈশবে ভালো লাগা মন্দ লাগার বোধ রোদের আঁচে পাতা মেলে না দিলেও নির্জনতার প্রতি পক্ষপাতটুকু ধনুর শিশু মনে ঠিকই অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল তখন। ধনু মানে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। এই নামেই শৈশবে তাঁকে ডাকত আত্মীয়-পরিজন ও বন্ধুবান্ধবেরা।

শব্দ, চিৎকার, উল্লাসের উত্তেজনা তাঁকে ক্লান্ত, বিভ্রান্ত, হতচকিত করে তুলত শৈশবে। কোলাহল থেকে সরে গিয়ে তিনি সবুজের ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য আশপাশের নিসর্গের কাছে পৌঁছে যেতেন গুটি গুটি পায়ে। সবুজ, সুন্দর, শুদ্ধ প্রকৃতি কদর্য কোলাহল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে সজীব, প্রাণবন্ত করে তুলত যেন। পরবর্তী জীবনেও এই নিসর্গপ্রীতি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, শুশ্রূষা দিয়েছে। প্রকৃতির নির্মলতা শরীর-মনে শুষে নিতে প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগেই ঠাকুরদার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। তাঁর ঠাকুরদা নিজের প্রাতঃভ্রমণের নেশা সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন উত্তরপুরুষের রক্তে। শৈশবে পিতামহের সঙ্গে তাঁর এই অন্তরঙ্গতার স্মৃতি পরবর্তীকালে অমরতা পেয়েছে তাঁর লেখা 'বনের রাজা' (১৩৬৬ ব.) গল্পে।

২০ আগস্ট ১৯১২, ৪ ভাদ্র ১৩১৯, অবিভক্ত বাংলার কুমিল্লা জেলায় (১৯৬০ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরা জেলা নামে পরিচিত) মাতামহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের অনন্য গল্পকার ও ঔপন্যাসিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তখনকার সময়ে হিন্দু পরিবারগুলোতে পুত্রবধূ সন্তানসম্ভবা হলে তাকে পিতৃগৃহে প্রেরণ করা হতো। জন্মের পর প্রায় বছরখানেক পোস্টমাস্টার মাতামহের বাড়িতে কাটিয়ে মা চারুবালা নন্দীর সঙ্গে শিশু জ্যোতিরিন্দ্র তিতাসের তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমা শহরে পৈতৃক নিবাসে আসেন। এখানেই তাঁর শৈশবের বড় অংশ অতিবাহিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিতাস পাড়ে জন্ম নেওয়া প্রায়-সমবয়সী

অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪-১৯৫১) ও পরবর্তী প্রজন্মের আল মাহমুদের (১৯৩৫-২০১৯) মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের উপন্যাসে বা কবিতায় তিতাস গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্যে এই নদীটির প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। শৈশবের প্রকৃতির নানা স্মরণীয় বর্ণনা পরবর্তী সময়ে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে দেখা গেলেও পাড়ভাঙা খরস্রোতা তিতাস সেখানে অনুপস্থিত। এমন নয় যে, তিতাসের ঘটনাবহুল উল্লেখ না থাকাতে তাঁর সাহিত্যকর্ম অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বা বাংলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি হয়েছে; তবে নিসর্গপ্রেমী এই কথাশিল্পীর রচনায় তিতাসের অনুপস্থিতি উৎসুক পাঠকের মনে কৌতূহল তৈরি করে বইকি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীরা ছিলেন চার ভাই। জ্যোতিরিন্দ্রের তিন অনুজ যথাক্রমে সমরেন্দ্র, শঙ্কর ও তাপস নন্দী। তাঁর পিতা অপূর্বচন্দ্র নন্দী স্নেহ-মমতা-শাসন ও শিক্ষকের ঔদার্য দিয়ে সন্তানদের মানস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে সবসময় নিজে থেকেই উৎসাহ ও প্রণোদনা দিয়ে গেছেন তিনি। অপূর্বচন্দ্র প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরবর্তীকালে আইন ব্যাবসাকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরে উকিলের পোশাক ছেড়ে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রকে কাছে ডেকে নিতেন। তারপর ছেলের হাত ধরে চলে যেতেন রাস্তার ওপারে সোজা কবিরাজ মশাইয়ের বৈঠকখানায়। সেখানে শিশু পুত্রের পিতৃস্থানীয় সবাই হৈ-হুল্লোড় করে দাবা খেলত। তাদের ঘোড়ার চালে কিস্তিমাতের উল্লাস শিশু ধনুকে বিন্দুমাত্র আপ্লুত করতে পারত না। ধনু ততক্ষণে কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে বনে-বাদাড়ে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরটাকে কেন যেন আপন করে নিতে পারেননি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। হাসপাতাল, ট্রেজারি, স্কুল, এবড়োখেবড়ো রাস্তা, পান-সিগারেটের দোকান, কবিরাজের কারখানা ইত্যাদি অগোছালো করে রেখেছিল শহরটাকে। অথচ একরত্তি ওই শহর থেকে দু-পা বাড়ালেই আদিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, নদী, খাল-বিল আর ধু ধু গ্রাম। গ্রাম-শহরের এই বিপুল বৈপরীত্য তাঁকে বিস্মিত করত। দাদুর আঙুল ধরে শহরের শেষ সীমায় রেললাইন পার হয়ে ধানক্ষেত পাটক্ষেত দেখতে দেখতে খালের ধারে চলে যেতেন তিনি। নানা রকম মাছের ভুরভুর আঁশটে গন্ধ নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিতেন বুকে। প্রকৃতির এই বহুবিচিত্র গন্ধ পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে।

বয়স যখন তাঁর মাত্র সাড়ে চার বছর তখন তিনি মাতুলালয়ে বেড়াতে যান। সে-বারের যাওয়া অন্যান্য বারের মতো সাধারণ যাওয়া নয়। এই প্রথম মাকে ছাড়া মামার বাড়িতে যাচ্ছে ধনু। তাই তাকে চমকে দিতে মামারা বিভিন্ন আয়োজন করেন। বড় মামার পরামর্শে সমবয়সী দুই মামা পাখির পালক, বেলেপাথর আর সকালে কুড়ানো একরাশ শুকনো বকুল ফুল দিয়ে তাকে বরণ করে নেন। বকুল ফুলের

তীব্র গন্ধ তাকেও যেন সুরভিত করে তোলে। বড় হয়ে লেখক স্মরণ করেছেন, 'যেন ফুলটা বাসি হয়ে উঠেছিল বলে গন্ধটা এত বেশি ভালো লাগছিল' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২২০)।

ছোট্ট ধনু জ্যোতিরিন্দ্র নাম নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাইনর স্কুলে ভর্তি হলেন। সাত আট বছর বয়স তখন তাঁর। দেখতে এমন কিছু আহামরি নয় তাঁর স্কুল। মাটির ভিটে, বাঁশের বেড়া, টিনের চাল ঘেরা ছোট্ট শান্ত স্কুল। স্কুলটা দেখতে সাধারণ হলেও প্রতিবছর সেখানে নিয়ম করে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হতো। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে মফস্বল শহরের পক্ষে যথাসম্ভব জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠত স্কুলপ্রাঙ্গণ। এমন একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছোট্ট ধনু 'যাও পাখি যাও উড়ে' কবিতাটি আবৃত্তি করে সবার প্রশংসা অর্জন করে। চতুর্দিক থেকে উচ্ছ্বসিত করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানায় সবাই। এমনকি মাস্টার মশাইয়েরাও পিঠ চাপড়ে বাহবা দিয়েছিলেন তাকে। তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ধনু বাবার শিখিয়ে দেওয়া সেই কবিতা আবৃত্তি করে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া বড় ক্লাসের ছেলেদেরও পিছনে ফেলে পুরস্কার জিতে নিয়েছিল। এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় স্কুলজীবনে নিজের বালক-মননে কবিতা পাঠ ও শ্রবণের দূরপ্রসারী অভিঘাতের কথা জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন :

> কিন্তু জিনিসটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল কি। কল্পনার পাখি দেখতে শিখলাম। মনের মধ্যে অন্তহীন নীলিমা ধরা দিতে লাগল। তারপর থেকেই ক্লাসে মাস্টারমশাই বই খুলে যখনই কবিতা পড়ে শোনাতেন, তখন আর শুধু কবিতা শুনতাম না। চোখের সামনে ছবি দেখতাম। 'নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে' অথবা 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ' – বুকের ভিতর শিরশির করে উঠত। অর্থাৎ সাহিত্যের রস, কবিতার রস কেমন একটু একটু করে তার স্বাদ বুঝতে পারছি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২২১)

'যাও পাখি যাও উড়ে' আবৃত্তি শেখাবার মধ্য দিয়ে শব্দকে চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করার যে জাদু ছোট্ট ধনুর মনের গভীরে তাঁর বাবা অপূর্বচন্দ্র রোপণ করে দিয়েছেন, আমৃত্যু তার চর্চার মাধ্যমে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী শব্দ আর চিত্রকল্পের বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠেছিলেন।

শুরু হলো ধনুর কবিতা পাঠের চর্চা। কবিতা পাঠের ভেতর যখন সে মশগুল এমনই একদিন ক্লাসের মাস্টারমশাই তার সামনে আরেকটি জাদুর বাক্স খুলে দিলেন। বললেন, তারাও চেষ্টা করলে কবিতা লিখতে পারে! বাজনা বেজে উঠল যেন বুকের ভেতর। ধনুর বয়স তখন মাত্র এগারো। অবারিত প্রকৃতির অনুরণন এবং এর রূপ-রং-ঘ্রাণ তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিতে লাগল একের পর এক কবিতা। পুরো গ্রীষ্মের ছুটিটা কবিতা লিখে কাটিয়ে দিল সে। একটা নামও দিল তার কবিতার খাতার – 'ঝরনা'। কবিতা

তো লিখল, কিন্তু তখনও সে কবিতার মান সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে পারেনি। যাচাই করার জন্য দুরু দুরু বক্ষে সেজো মামার কাছে নিয়ে গেল খাতাটা। মামা উল্টেপাল্টে দেখলেন, মিটিমিটি হাসলেন, কিন্তু মন্তব্য করলেন না। তাঁর না-প্রশংসা না-নিন্দাতে ভালোমন্দ কিছুই আঁচ করা গেল না। উৎসাহটা দমে গেল যেন অনেকখানি। কিন্তু সেই দমে যাওয়া বেশি দিনের জন্য নয়।

সাতদিন পর স্কুল খুললে ধনু মাস্টারমশাইকে দেখাল খাতাটা। পাতা উল্টে উল্টে পড়ার সময় মাস্টার মশাইয়ের চোখেমুখে খুশির ঝলক দেখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রশংসা-প্রত্যাশী বালকের চেহারা। 'লিখে যা, তুই পারবি' – শিক্ষকের এইটুকু প্রশংসায় ছোট্ট ধনুর সাহিত্যজগতে প্রবেশের বিশাল দরজা এক ঝটকায় উন্মুক্ত হয়ে গেল যেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কিশোর চরিত্রদের জীবনেও এগারো-বারো বছর বয়সের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাঁর প্রায় সব কিশোর চরিত্র এই বয়সের মধ্যেই সম্ভাবনার দিকে কুঁড়ি মেলতে শুরু করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ঘ্রাণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়, এমন তীব্র ঘ্রাণশক্তি হয়তো অনেকেরই থাকে, কিন্তু তিনি প্রকৃতির মন-উচাটন-করা গন্ধকে অনন্য চিত্রকল্পে রূপান্তরিত করে নিতে জানতেন। এক্ষেত্রে তাঁর আদি অনুপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ছোট্ট বয়সেই রবীন্দ্রনাথের প্রতি পরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠদের সমীহ দেখে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, রবি ঠাকুর একজন কবি মাত্র নন, তিনি অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। 'রবীন্দ্রনাথও গন্ধে উতলা হতেন' – বড়মামা যখন বড় কবি রবীন্দ্রনাথের এই অজানা তথ্যটি ছোট্ট ধনুকে জানালেন তখন তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে জানত তারও তীক্ষ্ণ ঘ্রাণের প্রখর অনুভূতি আছে; বাতাস থেকে প্রকৃতির ঘ্রাণ টেনে নিয়ে সেও মনশ্চক্ষে দেখতে পায় অদেখা নিসর্গ ও জীবনের ছবি। সেদিন সে আক্ষেপ করেছিল কেন রবীন্দ্রনাথের মতো ঘ্রাণের চিত্রকল্প দিয়ে কবিতা বুনে যায়নি এতদিন! পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গন্ধের আমেজ দিয়ে অনবদ্য সব চরিত্র উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যকে। শৈশবের গন্ধের স্মৃতি পরিণত বয়সে তাঁকে দিয়ে 'বুটকি ছুটকি' (১৯৫৫), 'গোপন গন্ধ' (১৯৮০), 'গন্ধ' (১৯৮২), 'গন্ধমূষিক', 'নিয়মের বাইরে', 'অন্য গন্ধ', 'বয়ফ্রেন্ড'-এর মতো অসাধারণ সব গল্প লিখিয়ে নিয়েছিল। এছাড়া ছোটবেলায় পিসির সঙ্গে হালুইকরের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে পিসির বন্ধু হালুইকরের অপরূপ সুন্দরী বউটিকে দেখার স্মৃতি পরবর্তীকালে তাঁকে 'গিরগিটি' (১৯৫৬) গল্পটি লেখার পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়ে থাকতে পারে – এমনই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন তাঁর স্মৃতিকথায়। এছাড়াও আরো অনেকগুলো গল্পের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার ঘ্রাণের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন অন্নদা হাই স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র তখন ছবি আঁকার পাশাপাশি বইপড়ার প্রতি আকৃষ্ট হন। ছোট মামার সাহচর্যে তাঁর ছবি আঁকার নেশা আরেকটু আগে থেকেই শুরু

হয়েছিল। শৈশবের *চারু-হারু*, *ঠাকুরমার ঝুলি* ও *ঠাকুরদার ঝুলি*তে তাঁর সাহিত্যপাঠের তৃষ্ণা তৃপ্ত হয়নি তেমন। বাবার আইনশাস্ত্রের বইয়ের সঙ্গে তিনি ঘটনাচক্রে পেয়ে যান তিনটি মলাট-ছেঁড়া উপন্যাস – রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) *মাধবীকঙ্কণ* (১৮৭৭), *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* (১৮৭৮) ও *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (১৮৭৯)। তাঁর বয়স মাত্র এগারো কি বারো হবে তখন। এর পর একে একে জলধর সেনের (১৮৬০-১৯৩৯) 'বিশুদাদা', 'পাগল' আর 'অভয়া' ও যতীন্দ্রমোহন সিংহের (? - ১৯৩৭) *ধ্রুবতারা* পড়ে শেষ করেন তিনি। সেসব বই পড়ে নিজেকে বইয়ের চরিত্র ভাবতে ভালবাসতেন অল্পবয়সী জ্যোতিরিন্দ্র। কখনো কল্পনায় বালিকার হাতে মাধবীকঙ্কন পরিয়ে দিতেন, কখনো মারাঠা বীরের সাজে কেল্লার দখল নিতেন। *ধ্রুবতারা* পড়ে তিনি রীতিমতো চমকে ওঠেন। নায়ক উপীন যেন তাঁরই বড় মামা। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে প্রাণ ছটফট করত তাঁর। লেখকের অল্প বয়সের কল্পনায় এই চরিত্রগুলো যেন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠত। প্রেম ও প্রেমে ব্যর্থতার চিত্র তখন থেকেই তাঁর মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল।

বাবার বন্ধুস্থানীয় এক আইনজীবী বালক জ্যোতিরিন্দ্রকে এইসব উপন্যাস পড়তে দেখে তাঁর বাবাকে সাবধান করে দিয়ে যান যেন এই বয়সে ছেলেকে এই ধরনের উপন্যাস পড়তে দেওয়া না হয়। তাঁর বাবা অবশ্য বন্ধুর এই অযাচিত উপদেশ আমলে নেননি। ছোট জ্যোতিরিন্দ্র কখনো কখনো নিজেকে উপন্যাসের নায়ক ভেবেও আপ্লুত হতেন। এরপর বহু মিলনাত্মক ও বিয়োগান্ত নাটকে অভিনয় করেও তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে অভিনয় করা তো দূরের কথা, তিনি নাটক দেখাও বন্ধ করে দেন। সিনেমাকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পমাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করলেও জীবনে দশ-বারোটির বেশি সিনেমা তিনি দেখেননি। তবে থিয়েটার সম্পর্কে ভালো ধারণা ছিল বলেই তিনি 'একটি এক অঙ্কের নাটক'-এর মতো গল্প এবং *ঝড়* (১৩৭৬ ব.)-এর মতো উপন্যাস লিখতে পেরেছিলেন। শৈশবে রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস পড়ার সময়ে তিনি ঝরনা, পাহাড়, গুহা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অনুষঙ্গ নিয়ে রোম্যান্টিসিজমে ভুগতেন। এই পরিবেশের প্রভাব আর কল্পনার কারণেই তিনি রংতুলি হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁর ছোটমামার কাছ থেকে, যিনি নিজেও ছিলেন চিত্রকর।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অন্নদা হাই স্কুলে পড়ার সময় স্কুলের বাংলার শিক্ষক সাহিত্যরসিক হরেন্দ্র ভট্টাচার্য ধনুকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বাংলা পরীক্ষায় মেহারকালীবাড়ির মেলা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ধনুর লেখা রচনাটি তাঁকে মুগ্ধ করে, তিনি সেটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে শিক্ষকের প্রশ্রয় ও প্রণোদনায় স্কুলের এক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করে পুরস্কৃত হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। প্রথম পুরস্কার হিসেবে রবীন্দ্রনাথের *গল্পগুচ্ছ*-এর ১ম খণ্ড পুরস্কার পান। বাড়ি ফিরেই বুভুক্ষুর মতো পড়তে শুরু করেন গল্পগুলো। তাঁর সাহিত্য পাঠের আগ্রহ আরো বেড়ে গেল। তিনি হন্যে হয়ে পরবর্তী

খণ্ডগুলো খুঁজতে শুরু করলেন। মফস্বল শহরে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় 'বাকি খণ্ডগুলো যোগাড় করে পড়ে শেষ করতে প্রায় বছর দু-তিন' তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২২৫)। এ পর্যায়ে পাঠতৃষ্ণার পাশাপাশি তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছে লেখার আগ্রহ। তিনি তখন অষ্টম শ্রেণির ছাত্র, ক'দিন পরেই চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোয় পা রাখবেন। ছবি আঁকা বাদ দিয়ে তিনি গল্প লিখতে বসে গেলেন, কবিতার কল্পলোক ছেড়ে পা রাখলেন গদ্যের কঠিন মাটিতে।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়াও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৩-১৯৩২) লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁদের লেখা পড়ে তিনি মোহিত হয়েছেন, সাহিত্য রচনায়ও আগ্রহী হয়ে উঠেছেন; কিন্তু তাঁর শিল্পভাবনা ও আঙ্গিক নির্মাণে তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। রবীন্দ্রনাথের বিষাদ-ব্যাকুল বৈরাগ্য, প্রভাতকুমারের তরল মধুর হাস্যরস এবং শরৎচন্দ্রের বাঙালিসুলভ ভাবপ্রবণতা থেকে তাঁর কথাসাহিত্য সম্পূর্ণ আলাদা, স্বতন্ত্র। তাঁর গল্পে বিষাদ থাকলেও বৈরাগ্য নেই, হাস্যরসের প্রতি কখনোই তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না, ভাবাবেগের আতিশয্য থেকে তিনি নিজের লেখাকে শত মাইল দূরে রেখেছেন। সত্যি বলতে কি, তাঁর সমসাময়িক কিংবা পূর্বসূরি লেখকদের গল্প-উপন্যাস পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কারো কাছ থেকে তেমন কিছু নেননি। তাঁকে গল্প লেখার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে জীবনানন্দ দাশের কাব্যভাষা :

> তাঁর প্রতিটি কবিতা, বিশেষ করে তাঁর শব্দচয়ন আমাকে এমন নাড়া দিত যে এক-একটি কবিতা পড়ে এক-একটা গল্প লেখার প্রেরণা পেতাম। কোন কবিতা পড়ে কোন গল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলাম তা এখন হারিয়ে ফেলেছি, আপনাদের বলতে পারব না, কিন্তু এই যে শিল্পসম্মত, বুদ্ধিগ্রাহ্য শব্দ চয়ন করে জীবনানন্দ কবিতা রচনা করতেন, আমারও ইচ্ছা হতো ঠিক ঐরকম শব্দ সাজিয়ে একটি করে গল্প লিখি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০০৪ : ৩২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সৌন্দর্যদর্শন, রহস্যময়তা ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ ছাড়াও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জগদীশ গুপ্তের প্রভাবের কথাও কেউ কেউ বলেছেন (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৩৭৪; আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১৬ : ১৭); তবে লেখক নিজে জীবনানন্দ ছাড়া অন্য কারো ঋণ স্বীকার করেননি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তিনি আবদুল মান্নান সৈয়দকে (১৯৪৩-২০১০) জানিয়েছিলেন, তিনি মানিকের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) ও *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) ছাড়া অন্য কোনো উপন্যাস পড়েননি (আবদুল মান্নান সৈয়দ ২০১৬ : ১৭)। অন্যত্র এক স্মৃতিচারণায় তিনি জানিয়েছেন – 'মানিকবাবুর বেশিরভাগ লেখাই আমার ভালো লাগে না' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০০৪ : ৮)। তবে জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যে একটি সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। মনস্তত্ত্ব ও যৌনতা

বিষয়ে তাঁদের ভাবনার ছক একই সূত্রে গ্রথিত হলেও এসব অনুষঙ্গ রূপায়ণের ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক বিচারেও তাঁরা একে অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। তাই চিন্তার এই ঐক্যসূত্রকে প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত না করে একে তাঁদের মনোজগতের সাযুজ্য হিসেবে বিবেচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

নবম-দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে একনাগাড়ে গল্প লিখতে শুরু করলেন জ্যোতিরিন্দ্র। শুধু লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে গল্প পাঠাতে শুরু করলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। নিজেকে যাচাই করার বাসনা তখন প্রবল। নানা সঙ্ঘ ও পাড়ার হাতে-লেখা কাগজগুলোতে তাঁর গল্প প্রকাশিত হতে শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই লেখক হিসেবে মোটামুটি একটা পরিচিতিও পেয়ে গেলেন তিনি। বিভিন্ন হাতে-লেখা কাগজ তাঁর গল্প চেয়ে নিয়ে প্রকাশ করতে লাগল। আত্মপ্রকাশের তাড়নায় তিনি নিজেও বের করেছিলেন একটা হাতে-লেখা কাগজ, যেটির একটিমাত্র সংখ্যাই প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তাঁর নিজের কবিতা, নিজের গল্প ও নিজের আঁকা ছবিই স্থান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে নিজের এহেন ছেলেমানুষী কাণ্ডের কথা মনে করে তিনি লজ্জিত হয়েছেন।

ধীরে ধীরে গল্পকার হিসেবে তাঁর সুনাম নিজের শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও মামাবাড়ি কুমিল্লা শহরে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ততদিনে সবাই তাঁকে গল্পলেখক হিসেবে চিনতে শুরু করেছে। কিন্তু ছাপার অক্ষরে নিজের নাম না দেখে তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। কলেজে উঠেই ঢাকার *বাংলার বাণী* পত্রিকায় মোপাসাঁর একটা গল্প অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন। নিজের লেখা গল্প পাঠাতে দ্বিধা হওয়ায় প্রথমে অনুবাদ বেছে নেন। ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশের এই স্বপ্ন সফল হয়। *বাংলার বাণী* তাঁর অনুবাদকর্মটি বেশ যত্ন সহকারেই প্রকাশ করে। পরের মাসেই একই পত্রিকায় মৌলিক গল্প পাঠিয়ে দেন তিনি। এবারেও লক্ষ্যভেদ – তাঁর স্বরচিত গল্পটিও ছাপা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। এ গল্পের নাম তিনি স্মরণ করতে পারেননি পরবর্তীকালে। তবে তাঁর বেশ মনে ছিল কলেজের ম্যাগাজিনে মুদ্রিত 'অন্তরালে' নামের গল্পটির কথা। কলেজের বাংলার অধ্যাপক সুধীর সেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন গল্পটির। তিনিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গল্পটি নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত *কলেজ ক্রনিকল*-এ ছাপতে পাঠান। এভাবেই শুরু হয় জ্যোতিরিন্দ্রের গল্প লেখা ও ছাপার জন্য নিয়মিত পত্রিকায় পাঠানো। সেসব গল্পের অধিকাংশই পত্রিকায় প্রকাশিত হতে লাগল। তখন এক দুপুরেই একটানে একটা গল্প শেষ করতে ফেলতে পারতেন তিনি। স্মৃতিকথায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন, পরে আর সেই একাগ্র ধৈর্য ছিল না তাঁর। লেখার ভাবনা, আঙ্গিক ও শৈলীতে পরিণতি আসার কারণে গল্প লিখতে বসে অনেক বাছ-বিচার, কাটাছেঁড়া করতে শুরু করেন পরে। তাঁর প্রথমদিকের গল্পের সঙ্গে পরবর্তী পর্যায়ের গল্পের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর তুলনা করলেও এ বিষয়টি ধরা পড়ে। তাই বলে প্রথমদিকের গল্পগুলো ফেলনা ছিল, এমন নয়। বরং সেগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে তারুণ্যের দীপ্তি, দৃষ্টিভঙ্গির একাগ্রতা, নিসর্গনিবিষ্টতা ও বিষয়বৈচিত্র্য। তারই সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর

সাহিত্যজীবনের সূচনাপর্বে লেখা 'নদী ও নারী' (১৯৩৬), 'রাইচরণের বাবরি' (১৯৩৬), 'সিংহরাশি' (১৯৪৬), 'খেলনা' (১৯৪৬), 'শালিক কি চড়ুই' (১৯৪৮) সহ আরো বেশ কয়েকটি গল্প।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আঠারো বছর বয়সে স্বনামধন্য রাজনীতিক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কুমিল্লায় যুব সম্মিলনে অতিথি হয়ে এসেছিলেন। ওই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯) হাতে-লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেন। সে কাগজে জ্যোতিরিন্দ্রের একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। গল্পটি শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তিনি গল্পের পাশে নিজের হাতে প্রেরণাদায়ক স্তুতি লিখে দেন তরুণ গল্পকারের উদ্দেশে। সাহিত্যজীবনের সূচনালগ্নে নন্দিত কথাসাহিত্যিকের এই প্রশংসা নবীন জ্যোতিরিন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছে।

সেই সময় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তিনি তৎকালীন কুমিল্লার বিখ্যাত নেতা ললিত বর্মণের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ সংঘের হাতে-লেখা মুখপত্র পরিচালনা করতেন, প্রচুর বই পড়তেন; তাঁর মঞ্চে অভিনয়ও সেই সময়ের ঘটনা। একজন সচেতন প্রতিবাদী তরুণ হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতির সঙ্গেও তখন নিজেকে যুক্ত করে নেন তিনি; যার ফলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শরিক হওয়ার অভিযোগে ১৯৩১ সালে তাঁকে পুলিশি নির্যাতন সহ্য করে চার মাস (মতান্তরে ছয় মাস) কারাগারে কাটাতে হয় এবং পরবর্তীকালে নিজের ঘরে অন্তরিন থাকতে হয় গোটা এক বছর। এ সময় তাঁর উপর পত্রপত্রিকায় লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কিন্তু গল্প লেখার প্রবল ইচ্ছা আর একের পর এক গল্পের প্লট তাঁকে তাড়িত করছিল। তাই সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে জ্যোৎস্না রায় ছদ্মনামে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় গল্প প্রকাশ করতে শুরু করেন তিনি। এই ছদ্মনামেই *বাংলার বাণী* ও *সোনার বাংলা* পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি গল্প প্রকাশ পায়। এ সময় তিনি কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা *সংবাদ* ও *আত্মশক্তি*তেও গল্প পাঠাতে থাকেন। গল্পগুলো যথাসময়ে সেইসব পত্রিকায় ছাপাও হয়। *সংবাদ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর সম্পাদিত আরেকটি পত্রিকা *নবশক্তি*তেও গল্প লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র। ১৯৩৯ সালে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে কাজ করার সময়ে প্রচার সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। এর মধ্যে *বাংলার বাণী*তে প্রকাশিত তাঁর 'জার্নালিস্ট' গল্পটি বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর গুণে পাঠকের প্রশংসা অর্জন করে।

লেখকজীবনের সূচনাপর্বে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলোর কপি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংরক্ষণ করেননি। নিজের আলমারিতে সযত্নে তুলে রাখা খসড়াগুলোর উপরই তাঁর ভরসা ছিল। তরুণ লেখক তখনও জানতেন না যে, তাঁর প্রিয় মাতৃভুমি দু'ভাগ হয়ে দুটি আলাদা দেশের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র ও সাবেক ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতায় গিয়ে তিনি আর পূর্ববঙ্গের মহকুমা

শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নিজের পৈতৃক নিবাসে ফিরতে পারবেন না। দেশভাগের ফলে তার অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রথম জীবনে লেখা অধিকাংশ গল্পও হারিয়ে গেছে।

নিজের জেলবন্দি জীবন নিয়ে পরবর্তী সময়ে কখনোই তেমন একটা উচ্চবাচ্য করেননি জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর কোনো গল্পেই কারাগারে আটক থাকাকালীন অভিজ্ঞতার নির্যাস স্থান পায়নি। এমনকি কোনো সাক্ষাৎকারেও বিশদ আলাপ করেননি এই পর্বটি নিয়ে। কেউ এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে তিনি স্মিত হেসে এড়িয়ে গেছেন। যেন নিজের জীবন থেকে সেই কয়েকটি মাস তিনি চিরতরে মুছে দিতে চেয়েছেন। তাঁর গল্পে বিদ্রোহ-বিপ্লব, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উঁচু নিনাদের চিৎকার নেই, এমনকি তাঁর সমকালের রাজনৈতিক বাস্তবতার দগদগে চিহ্নটুকুও নেই। তাঁর 'কমরেড' (১৯৫৭), 'পার্বতীপুরের বিকেল' (১৯৫৯), 'বিকেলের খেলা' (১৯৭১), 'নীল ফুল', 'নতুন জ্যোৎস্না' প্রভৃতি গল্পে সামান্য ইঙ্গিত থাকলেও গল্পের বাঁক রাজনীতি নয়, মানবিকতাকেই আশ্রয় করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপর থেকে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ওঠার প্রায় সমসময়ে (১৯৩৩) আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকা। ১৯৩৬ সালে এই পত্রিকার তৃতীয় বর্ষে জ্যোতিরিন্দ্রের 'রাইচরণের বাবরি' গল্পটি সেখানে প্রকাশিত হয়ে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সে বছরই, এই গল্প প্রকাশের অনতিকাল পূর্বে খ্যাতনামা সাময়িকপত্র *পরিচয়*-এ তাঁর প্রথম সাড়া-জাগানো গল্প 'নদী ও নারী' প্রকাশিত হয়। 'রাইচরণের বাবরি' প্রকাশের পর *দেশ* পত্রিকার সহ-সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তরুণ জ্যোতিরিন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। তখনও লেখক কলকাতার বাসিন্দা হননি, পূর্ববঙ্গের মফস্বলের নিজস্ব নিসর্গে নিমগ্ন হয়ে আছেন। লোকনাথ দিঘির টলটলে জলে বিকালের সূর্যাস্তের রঙে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৩২ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএসসি পাশ করে একই কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র। কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতির কারণে স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি তিনি। ১৯৩৫ সালে প্রাইভেটে বিএ পাশ করেন।

মফস্বল শহরের ছোট পরিসরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যচর্চা ব্যাহত না হলেও চাকরির সন্ধানে তাঁকে কলকাতায় যেতে হয়। তিনি জানতেন তাঁর মতো সাধারণ গ্র্যাজুয়েটের পক্ষে কলকাতায় চাকরি বাগানো বেশ কঠিন। প্রথমে ওঠেন কলকাতার এক অপরিসর মেসবাড়িতে। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কোনোমতে দুটো টিউশনি খুঁজে নেন। মাসে বিশ-বাইশ টাকা রোজগার – তা দিয়েই থাকা-খাওয়া ও আনুষঙ্গিক খরচ একরকম মিটে যায়। টিউশনি বাদে বাকিটা সময় মেসের ছোট কামরায় আত্মমগ্ন হয়ে তিনি লিখে যেতে লাগলেন একের পর এক গল্প। এ সময়ে তিনি চাকরির সন্ধানও করে গেছেন, কিন্তু ততটা মরিয়াভাবে নয়। ১৯৩৮ সালে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে চাকরি পান, কিন্তু মাত্র নয় মাস সেই চাকরি করেন। একই বছরে সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন *যুগান্তর* পত্রিকায়। এক বর্ষণমুখর দুপুরে অফিসের জানালা দিয়ে বাইরে

তাকিয়ে থাকতে থাকতে জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে তাঁর শিল্পীসত্তা আলোড়িত হয়ে উঠলে তিনি কাউকে কিছু না জানিয়ে অফিস থেকে বের হয়ে আসেন। আর সেখানে ফিরে যাননি। ১৯৩৯ সালে যোগ দেন টাটা এয়ারক্রাফটে, কিন্তু সেখানেও বেশিদিন স্থায়ী হননি। ১৯৪০ সালে অল্পদিনের জন্য জে ওয়াল্টার অ্যান্ড টমসন কোম্পানির বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ – এই তিন বছর তিনি টানা কাজ করেন মওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায়। এর পর কিছুদিন ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশনের ইংরেজি ও বাংলা মুখপত্র *মজদুর* সম্পাদনা করেন। ১৯৪৬ সাল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জন্য একটি বিশেষ বছর। এই বছরেই তিনি পারুল দেবীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উদ্যোগে পূর্বাশা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *খেলনা* (১৯৪৬)। অনতিকাল পরেই *পূর্বাশা* সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত গল্প 'মঙ্গলগ্রহ' (১৯৪৬)। সাগরময় ঘোষের উৎসাহে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর *সূর্যমুখী* উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৯ সালের দিকে তিনি অতুল্য ঘোষের সাপ্তাহিক *জনসেবক* পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫১ সালে এটি দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। *জনসেবক*-এ তিনি তেরো বছর কর্মরত ছিলেন। সেখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন তরুণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মাধ্যমেই জ্যোতিরিন্দ্র কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে পরিচিত হন। *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাসটি দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪-৫৫ সালে।

জীবনে বেশ কয়েকবার চাকরি বদল করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। কিন্তু কর্মজীবনের কোনো পর্যায়েই তিনি সচ্ছলতার মুখ দেখেননি। কারণ বাড়তি রোজগারের চেষ্টা তিনি করেননি কখনো, এমনকি যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু উপার্জনে ক্ষেত্রেও যথেষ্ট তৎপর ছিলেন না। সেই সময়টুকু বরং আরেকটা গল্প কি উপন্যাস লেখার কাজে ব্যয় করতে চেয়েছেন। এতেই তিনি আনন্দ পেতেন। নিজের আর্থিক সচ্ছলতার অভাব নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপও ছিল না। তাঁর স্ত্রী পারুল নন্দীও (মৃত্যু ২০০৮) এসব নিয়ে কোনো অনুযোগ করেননি। এদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে জীবনানন্দ দাশের তুলনায় ভাগ্যবান বলা যায়। পারুল নন্দীর স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয় – শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, সংসারজীবনেও জ্যোতিরিন্দ্র ছিলেন স্রোতের বিপরীতে চলা একজন মানুষ :

> মানুষটা চিরদিনই ছিলেন নিঃসঙ্গ।. . . ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা দিতে কখনও ওঁকে দেখি নি। একসঙ্গে বসে গল্প হচ্ছে, মাঝখানে ঘরে এসে একটা মন্তব্য কি একটুকরো মস্করা করে গেলেন। এইরকম। (পারুল নন্দী ১৪১৬ ব. : ৩৭১)

কিংবা –

> এরপর গোটা বিবাহিত জীবনে আমি ওঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি, কলকাতায়, মাত্র একদিন। গিয়েছিলাম ওঁর বাল্যবন্ধু নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি। ঠিক বেড়ানো বলতে যা বোঝায়, স্বামীর সাথে সেজেগুজে ঘুরতে যাওয়া, আমোদ ফূর্তি করা – আমার সেটা কোনদিনই ঘটেনি। সেজন্য কিন্তু দুঃখ নেই। শিমুলতলা বা কাছাকাছি দু-একটা জায়গায় গেছি অবশ্য মাঝে মধ্যে। কিন্তু সে তো আর বেড়ানো নয়, চেঞ্জে যাওয়া। যেখানে যা যাওয়ার দরকার আমি একাই গেছি। যা করণীয় নিজে নিজে করেছি। উনি মনে করতেন হয়তো, আমি নিয়ে যেতে পারি না, তার উপর বাধা দেব কেন। কোনদিন আমার কোন কাজে বাধা দেননি। কিন্তু একসাথে কোনদিন আমরা একটা সিনেমাও দেখিনি। (পারুল নন্দী ১৪১৬ ব. : ৩৬৯)

পারুল নন্দীর এ বক্তব্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্তর্মুখিনতার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়, সেইসঙ্গে সংসারের কর্ত্রী হিসেবে তাঁর নিজের স্বাধীনতাকেও প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এহেন ভাগ্যমন্ত সহধর্মিণীর স্বামীর সান্নিধ্য যথাযথভাবে উপভোগ করতে না পারার অভিমানটুকুও যেন হালকা ছাপ রেখে যায় তাঁর স্মৃতিকথায়।

'নদী ও নারী' আর 'রাইচরণের বাবরি' প্রকাশের পর পত্রিকাগুলোতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আলাদা গুরুত্ব তৈরি হয়। *চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, দেশ, ভারতবর্ষ, পরিচয়, মাতৃভূমি*-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় একের পর এক তাঁর গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র *নবশক্তি* পূজা সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রের একটি গল্প প্রকাশ করেন। পূজা সংখ্যায় গল্প প্রকাশ পাওয়ায় জ্যোতিরিন্দ্রের আত্মবিশ্বাস অনেকটা বেড়ে যায়। *পূর্বাশা* আর *দেশ*-এ নিয়মিত গল্প লিখতে থাকেন তিনি। এই সময় সাগরময় ঘোষ *দেশ* পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। কাছাকাছি সময়ে হুমায়ুন কবির সম্পাদিত *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় 'শালিক কি চড়ু ই' গল্পটি প্রকাশ পায়। এ গল্প প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে সাগরময় ঘোষ *দেশ* পত্রিকার জন্য একটি গল্প চেয়ে পাঠান এবং সেইসঙ্গে বলেন তিনি যেন এবার উপন্যাস রচনায় হাত দেন। সাগরময় ঘোষের পরামর্শে একটানা কয়েক মাসের পরিশ্রমে *সূর্যমুখী* নামে একটি উপন্যাস লিখে ফেলেন জ্যোতিরিন্দ্র। ১৯৪৮ সালে উপন্যাসটি *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। ১৯৫২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত *সূর্যমুখীই* জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। এর পর ১৯৫৩ সালে তিনি *মীরার দুপুর* আর ১৯৫৪-৫৫ সালে *বারো ঘর এক উঠোন* রচনা করেন। শেষোক্ত বইটিই হয়ে ওঠে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলপঠিত উপন্যাস। এখনো *বারো ঘর এক উঠোন* (১৯৫৫) আর *এই তার পুরস্কার* (১৯৭২) – এই দুটি উপন্যাস পুস্তকবিপণিতে শোভা পায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর জীবদ্দশায় ষাটটির মতো উপন্যাস এবং তিন শতাধিক গল্প লিখেছেন। তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষদিকে লেখা কয়েকটি উপন্যাস এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

উপন্যাস লেখার কাজে হাত দেওয়ার আগে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বন্ধুরা প্রায়ই তাঁর কাছে অভিযোগ জানাতেন যে, অনেকেই উপন্যাস লিখছে, তিনি কেন উপন্যাসে হাত দিতে দেরি করছেন। এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছে থাকলেও বন্ধুদের তা জানাবার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। কারণ তিনি তখন একটু একটু করে নিজেকে প্রস্তুত করছেন উপন্যাস লেখার জন্য। তিনি মনে করতেন, গল্পগুলো হলো এক এক খণ্ড ইট আর উপন্যাস হলো একটা প্রকাণ্ড ইমারত। ইটের উপর যেভাবে ইট গাঁথা হয় সেভাবে তিনি গল্পের চরিত্রগুলোকে সাজিয়ে তুলবেন উপন্যাসে। সঙ্গে জুড়ে দেবেন পরিস্থিতি, ঘটনার সিঁড়ি। সবার শেষে ভাষার রং। এভাবে তাঁর উপন্যাসের সুরম্য অট্টালিকা গড়ে উঠবে। পরবর্তী জীবনে তিনি স্বীকার করেন, তাঁর এ ভাবনা ভুল ছিল। ছোটগল্প আর উপন্যাসের গড়ন আলাদা। উপন্যাস লিখতে গেলে আগে গল্প লিখে হাত পাকানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। বরং ছোটগল্প লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উপন্যাসে ছোটগল্পের মেজাজ ভর করার ঝুঁকি থাকে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কলকাতানিবাসী কামিনীকুমার ধর চৌধুরী ও ক্ষীরোদা দেবীর মেজো মেয়ে পারুলের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে – জে ওয়াল্টার অ্যান্ড টমসন-এ কর্মরত অবস্থায়। পারুল ইংরেজ আমলের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছিলেন; দক্ষতার সঙ্গে আড়বাঁশি, সেতার ও বেহালা বাজাতে পারতেন। লক্ষণীয়, লেখকের একাধিক নারী চরিত্রও বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিতার অধিকারিণী। বিয়ের আগে পারুল দেবীকে দেখতে যাওয়ার সময় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বন্ধু গণেশ দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুটির গায়ের রং ছিল মিশমিশে কালো। বিয়ের পর লেখক তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন – 'ও পাশে থাকলে আমায় দেখতে একটু ভাল লাগবে, তাই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম গণেশকে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২২০)।

জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় হাস্যরসের তেমন একটা স্থান নেই; তাঁর সাক্ষাৎকার বা আত্মকথায় কৌতুককর এই ঘটনাটি ছাড়া অন্য কোনো সরস ঘটনার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর জীবনপঞ্জি ঘেঁটে পাওয়া এটুকু বাস্তব রসিকতা তাঁর স্বভাবের অপ্রকাশিত কৌতুকপ্রিয় দিকটির প্রতি ইঙ্গিত দেয়। জ্যোতিরিন্দ্রের জীবনে কৌতুককর ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থাকুক বা না-ই থাকুক, তাঁর চরিত্রদের মধ্যে তিনি যত ধরনের হাসির ভঙ্গিমার বর্ণনা দিয়েছেন তার জুড়ি বাংলা সাহিত্যে বিরল।

লেখার পাশাপাশি পড়াশোনাতেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। নিজে কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও কল্লোল গোষ্ঠীর লেখার আগ্রহী পাঠক ছিলেন তিনি। জীবনানন্দের কাব্যভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক ও অনুজ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা তাঁর ভালো লাগত।

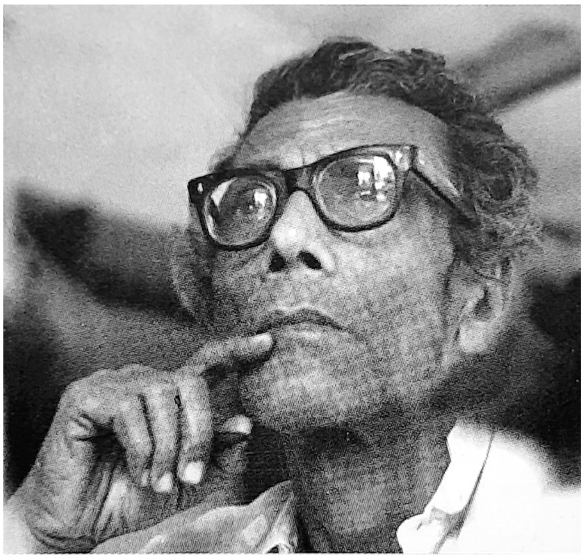

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

তিলজলার সি. এন. রায় রোডের গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেটের বাড়িতে দুই পুত্র তীর্থঙ্কর নন্দী (বামে) ও দীপঙ্কর নন্দী, স্ত্রী পারুল নন্দী এবং মাতা চারুবালা নন্দীর সঙ্গে লেখক। (কন্যা স্মিতা নন্দী এ ছবিতে অনুপস্থিত।)
আলোকচিত্র : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিয়ের পরে কলেজ স্ট্রিটের একটি বাড়িতে সস্ত্রীক বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে রূপবাণী সিনেমার কাছে রামচাঁদ লেনের বাড়ি, তারপর বেলেঘাটার বারোয়ারিতলা লেনের বাড়িতে বসবাস করেন তাঁরা – যে অভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে লেখকের *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাসে। তাঁদের এক কন্যা ও দুই পুত্র – স্মিতা নন্দী (১৯৪৭-২০১২), দীপঙ্কর নন্দী (জ. ১৯৫৪) ও তীর্থঙ্কর নন্দী (জ. ১৯৫৫)। কনিষ্ঠ পুত্র তীর্থঙ্কর পিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন, 'লেখার পেছনে বাবাকে প্রচুর সময় দিতে হয়েছিল। তাই বাবার সঙ্গে সময় কাটানোর খুব একটা স্মৃতি সম্ভবত আমাদের কোনো ভাইবোনেরই নেই' (তীর্থঙ্কর নন্দী ২০২১)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও পারুল নন্দী তাঁদের সীমিত সামর্থ্য সত্ত্বেও কন্যাকে হোলি চাইল্ড স্কুলে এবং দুই পুত্রকে টাকি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড মাল্টিপারপাস স্কুলে পড়িয়েছেন। বেলেঘাটার বস্তি, বাগমারি রোডের ভাড়াবাড়ি এবং সবশেষে তিলজলার সরকারি ফ্ল্যাট – সব মিলিয়ে সাত বার বাড়ি বদল করেন জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর শেষ জীবন অতিবাহিত হয়েছে তিলজলার সি. এন. রায় রোডের গভর্নমেন্ট হাউজিং এস্টেটে, এল/এ ব্লকের চার নম্বর ফ্ল্যাটে, দুই কামরার বাড়িতে।

এ পর্যায়ে সরকারি ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকলেও একেবারে আড়ম্বরহীনভাবে কাটিয়েছেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তাঁর কামরায় একটা বইয়ের তাক, একটা টেবিল আর একটা চেয়ার এবং ইতস্তত ছড়ানো কিছু কাগজপত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর শেষ জীবন নিতান্ত নিরাভরণভাবে কাটিয়েছিলেন। এই দুই লেখকেরই জীবনযাপন ছিল অনাড়ম্বর। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের তুলনায় মানিকের শেষ জীবনে আর্থিক সচ্ছলতার অভাব প্রকট ছিল।

সচ্ছলতার অভাব সত্ত্বেও ব্যক্তিজীবনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রখর আত্মসম্মানবোধের অধিকারী ছিলেন। একবার *দক্ষিণাবার্তা পত্রিকা*র পক্ষ থেকে দশ হাজার টাকা অর্থ-সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া হলে তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বলেছিলেন, এ টাকা তাঁর চাইতেও দুস্থ কাউকে খুঁজে দিয়ে দেওয়া হোক।

জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে জ্যোতিরিন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন, এটা প্রচারসর্বস্বতার যুগ। এ সময়ে নিজের প্রচারহীনতা নিয়ে তাঁর মনে কিছুটা খেদও জন্মেছিল। লেখায় মনোনিবেশ করে তা এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি। দু-একজন নিবিড় পাঠকও যদি নিবিষ্টতা নিয়ে তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে, বোঝে, তা নিয়ে মগ্ন হয়ে ওঠে, তাতেই তাঁর লেখা সার্থক হবে – এই সন্তুষ্টি দিয়ে তিনি পাঠকপ্রিয় হতে না পারার চাপা দুঃখ ভুলতে চেয়েছেন।

জনপ্রিয় ধারার লেখক ছিলেন না জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। দীর্ঘ অর্ধশতক জুড়ে একটানা সাহিত্যচর্চা করলেও কোনো গোষ্ঠীতে কখনো যোগ দেননি তিনি; ফলত রয়ে গেছেন গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক আলোচনার বাইরে। গল্পকার তীর্থঙ্কর নন্দী তাঁর লেখক পিতার মূল্যায়ন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে স্টাইলে গল্প লিখেছিলেন, এবং যে ধরনের গল্প লিখেছিলেন, তা সমকাল থেকে এগিয়ে ছিল। তাই তাঁর সমকালের পাঠক সেটা মূল্যায়ন করতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে পাঠকের মাঝে তাঁর সম্পর্কে রিয়েলাইজেশন এসেছে, তাঁর পাঠক বেড়েছে। (তীর্থঙ্কর নন্দী ২০২১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজের লেখালেখি প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণায় আক্ষেপের সুরে একবার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কেন তিনি জনপ্রিয় হতে পারেননি :

> কতটা সফল হয়েছি জানি না, তবে একথা নিশ্চয় বলতে পারি এবং কিছুটা দুঃখেরও বটেই – আমি জনপ্রিয় লেখক হতে পারিনি। হয়তো এর পেছনে রয়েছে আমার লেখা জুড়ে ক্রমাগত এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাওয়ার ঝোঁক। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০০৪ : ৮)

কলকাতার প্রায় সবকটি প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী; তাঁর গদ্যশৈলী ও ভাষার কাব্যময়তা সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে। জীবদ্দশায় মাত্র একবারই পুরস্কৃত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁকে 'সুরেশচন্দ্র স্মৃতি আনন্দ পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত করেছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার আলোকচিত্রী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রের কয়েকটি ছবি তুলেছিলেন; লেখক নিজে উদ্যোগী হয়ে কখনো ছবি তোলেননি (তীর্থঙ্কর নন্দী ২০২১)। বিভিন্ন ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাতটি গল্প অনূদিত হয়েছে – 'নীল পেয়ালা' (জার্মান), 'সিঁধেল' (ফরাসি), 'ভাত' (ইংরেজি), 'গাছ' (ইংরেজি), 'এক ঝাঁক দেবশিশু' (হিন্দি), 'গানের ফুল' (হিন্দি) এবং 'বলদ' (মারাঠি)। তাঁর *তিন পরী ছয় প্রেমিক* (১৩৭৯ ব.) উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে চলচ্চিত্র। *মীরার দুপুর* (১৯৫৩) উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হতে গিয়ে মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন তাঁর কোনো রচনাই কোনো বিদ্যায়তনিক পাঠ্যক্রমে স্থান পায়নি। বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর 'গিরগিটি' গল্পটি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তীকালে তা বাদ পড়েছে। ভারতের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের স্নাতক স্তরের পাঠ্যতালিকায় তাঁর 'চোর' গল্পটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সম্প্রতি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *গল্পসমগ্র*-র ১ম খণ্ড এবং *উপন্যাস সমগ্র-র* ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁর অনেক গ্রন্থই এখন দুষ্প্রাপ্য। লেখকের সম্মানে তাঁর সর্বশেষ আবাসস্থলের নিকটবর্তী মুকুন্দপুর এলাকায় নির্মাণাধীন মেট্রো স্টেশনটির নামকরণ করা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মেট্রো স্টেশন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের কয়েক বছর চোখের অসুখে ভুগছিলেন। এর আগে প্রায় সারাদিন বসে বসে তিনি বই পড়তেন। তাঁর পাঠতালিকায় বিদেশি লেখকের মধ্যে ছিলেন সমারসেট

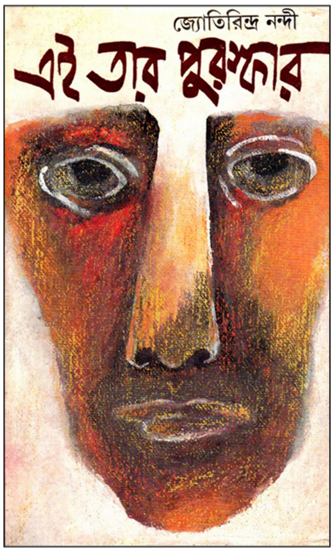

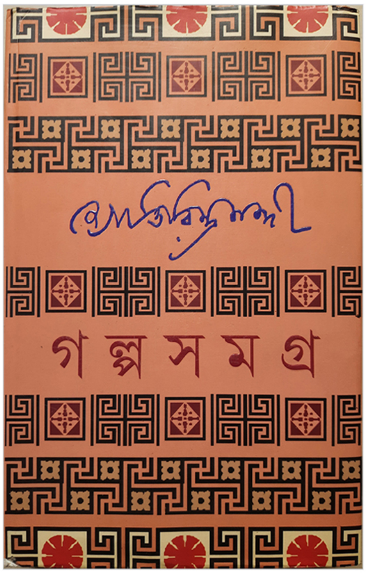

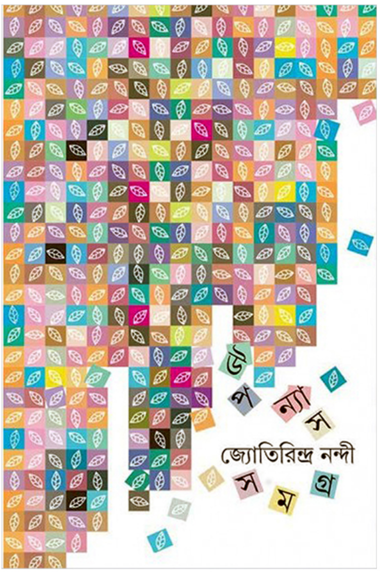

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি বইয়ের প্রচ্ছদ :
বারো ঘর এক উঠোন, এই তার পুরস্কার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প,
আজ কোথায় যাবেন, গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড এবং উপন্যাস সমগ্র ১ম খণ্ড

মম (১৮৭৪-১৯৬৫), ফ্রানৎস কাফকা (১৮৮৩-১৯২৪), আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯-১৯৬১), জন স্টেইনবেক (১৯০২-১৯৬৮), এইচ. ই. বেটস (১৯০৫-১৯৭৪), জঁ-পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০) প্রমুখ। 'চামচ' (১৯৫৪), 'রূপকথার রাজা' (১৯৬১), 'ম্যাজিক' (১৯৬১), 'আরসোলা' (১৯৮০), 'রূপালী মাছ' (১৯৮২) প্রভৃতি গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিস্তৃত পঠনপাঠনের আভাস পাওয়া যায়। ফ্যান্টাসি, যৌন মনস্তত্ত্ব, পাশ্চাত্য শিল্পভাবনা ইত্যাদি অনুষঙ্গের জন্য এই গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য।

এইচ. ই. বেটস-এর গল্প জ্যোতিরিন্দ্রের প্রিয় ছিল। সমারসেট মমের গল্প 'Rain' (১৯২১) ও 'Red' (১৯২১) এবং হেমিংওয়ের *Men without Women* (১৯২৭), স্টেইনবেকের *The Pastures of Heaven* (১৯৩২) প্রভৃতি উপন্যাস তাঁকে আলোড়িত করেছে। বিশেষত স্টেইনবেকের সঙ্গে তাঁর মানস-প্রবণতার মিল ছিল। তাঁদের দু'জনের লেখাতেই কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা আর যৌনতার সহাবস্থান লক্ষণীয়। উভয়ের চরিত্ররাই যেন যে-কোনোভাবে বেঁচে থাকার আনন্দে উদ্ভাসিত থাকত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী জীবনের শেষদিকে বেশ কয়েক বছর ফ্রানৎস কাফকার রচনা পড়েছিলেন। কাফকার ভাবনা, দর্শন, বিমূর্ততা তাঁকে ব্যাপকভাবে আন্দোলিত করে। কাফকার অনুপ্রেরণায় তিনি নিজেও কয়েকটি বিমূর্ত গল্প লিখেছিলেন, যার মধ্যে 'আরসোলা' ও 'রূপালী মাছ' উল্লেখযোগ্য। অস্তিত্ববাদী দর্শনের জটিলতাটুকু বাদ দিলে সার্ত্রের রচনায় মনস্তত্ত্বের উপস্থাপনাও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

শেষ জীবনে দীর্ঘদিন অন্ত্রের কর্কট রোগে ভুগে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শারীরিক অবস্থার ক্রমাবনতি হয়। ১৯৮২ সালের ১ আগস্ট অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি হ্যারিংটন নার্সিং হোমে ভর্তি হন। ৩ আগস্ট বাংলা সাহিত্যের নিভৃতচারী ও ব্যতিক্রমী এই লেখক প্রয়াত হন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী লেখেন :

> বাংলা সাহিত্যের যুক্তফ্রন্টের নির্দলীয় প্রতিনিধি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যখন বিদায় নিলেন, তখনও তিনি অসম্ভব সক্রিয় এবং সম্ভবত কলম নামিয়ে চশমা একবার মুছে, আবার চোখে পরে, কাউকে বিরক্ত না করে দরজাটি খুলে শিশুর মতো হেসে তিনি দুহাত বাড়িয়ে আগন্তককে ছুঁলেন যে তাঁকে নিতে এসেছিল। সত্তরেও সক্রিয় সব লেখক আমাদের সময়ে থাকেন না। (মহাশ্বেতা দেবী ১৪১৬ ব. : ৩৩৯)

সহায়কপঞ্জি

অভিজিৎ দাশগুপ্ত (১৪১৬ ব.), 'শ্রীমতী পারুল নন্দীর স্মৃতিতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬), 'সমরকালীন লেখকদের ছোটগল্প', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

আবদুল মান্নান সৈয়দ (২০১৬), 'ভূমিকা', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, জগদীশ গুপ্ত, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, ৩য় মুদ্রণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৪১৬ ব.), 'আমার সাহিত্যজীবন আমার উপন্যাস', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (২০০৪), 'আমার সময় এবং আমার লেখালেখি', *জনপদ প্রয়াস*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, সম্পাদনা : বিকাশ শীল, কলকাতা

– (২০০৪), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র সঙ্গে লোথার লুৎসের সাক্ষাৎকার', সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী : লোথার লুৎসে, *জনপদ প্রয়াস*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, সম্পাদনা : বিকাশ শীল, কলকাতা

তীর্থঙ্কর নন্দী (২০২১, ২২ জুন), ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মহাশ্বেতা দেবী (১৪১৬ ব.), 'পত্র-পত্রিকায় আলাপ আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

তৃতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন গল্পকার

সাহিত্যে সময় ও সমকালের দূরপ্রসারী প্রভাব অনস্বীকার্য। লেখকেরা যে সময়কে চেতনে-অবচেতনে অভিজ্ঞতায় ধারণ করেন, লালন ও যাপন করেন, সেই কাল-পরিসরের বহুবর্ণিল রূপ, বৈচিত্র্য ও বিরূপতা তাঁদের তাড়িত করে, সৃষ্টিকর্মে উদ্বুদ্ধ করে। যাপিত সময়ের আধারে মানুষ ও তার মনস্তত্ত্ব সাহিত্যিকের ভাবনা ও সৃষ্টির বিষয় হয়ে ওঠে। প্রকৃত স্রষ্টা সময়ের প্রবলতাকে অনুভব করেন এবং এর তাড়নায় সাহিত্যসৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন।

সময়ের অনিবার্য ধর্ম পরিবর্তনশীলতা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যেমন ক্রমাগত পাল্টে যেতে থাকে, তেমনি জীবনযাত্রার ধরন, মানসিকতা, মূল্যবোধ তথা নৈতিকতার মানদণ্ডও পরিবর্তিত হয়। জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য সংরূপও এক জায়গায় স্থির থাকে না। সাহিত্যের সবকটি ধারার মধ্যে সবচেয়ে পরিবর্তনশীল ধারা সম্ভবত ছোটগল্প। সাহিত্য-সংসারের এই নবীন সদস্যটি নিজেকে ক্রমাগত পাল্টে চলেছে। ঘটনা থেকে চরিত্র, চরিত্র থেকে বিশেষ কোনো ভাব বা অনুভূতি, আবার সেখান থেকে নিছক আবহ – অন্তহীনভাবে ভরকেন্দ্র বদলে ক্রমশ সমর্থ হয়ে উঠেছে কথাসাহিত্যের এই কনিষ্ঠ সংরূপটি। জন্মসূত্রে ছোটগল্প উনিশ শতকীয় জীবনযন্ত্রণার ফসল। গোড়ার দিকে ছোটগল্পে কাহিনি বা আখ্যান বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। ক্রমে কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে বিষয়-ভাবনা, আঙ্গিক ও রচনাকৌশলে ছোটগল্প পরিপূর্ণতা লাভ করে। সময়ের দাবি মেটাতে ক্রমশ নৈরাশ্যচেতনা, ছিন্নমূল অনিকেত মনোভাব ইত্যাদি ছোটগল্পের বিষয়-ভাবনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য ছোটগল্পের পরিবর্তনের এই ঢেউ অনতিকাল পরে বাংলা ছোটগল্পকেও আন্দোলিত করেছে। কিন্তু বাংলা ছোটগল্পের নৈরাশ্যবোধ নিছক বিদেশি গল্পের অনুকরণ নয়, বরং তা আমাদের জীবনচর্যা থেকেই উদ্ভূত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয় বাংলার তৎকালীন চাকরি-নির্ভর যুব-মানসে তীব্র অনিশ্চয়তা তৈরি করেছিল। অনিশ্চয়তার দোলাচল থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দর্শন, জীবনাচরণ, বিপ্লব ও বিদ্রোহের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ তৈরি হতে শুরু করে। এর পেছনে মূলত রুশ বিপ্লবের সাফল্যের জোরালো ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমাগত আন্দোলন-সমঝোতা-আন্দোলনের চক্রব্যূহের প্রভাবে আকাঙ্ক্ষার এই ফানুস ফুৎকারে উবে

যেতে বেশি সময় নেয়নি। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তৈরি হয়েছে আশা-নিরাশার অন্তহীন দোলাচল।

যুদ্ধ-পরবর্তী অনিশ্চিত আর্থ-সামজিক পরিস্থিতি সচেতন সাহিত্যিকদের মধ্যেও বিপর্যয়ের বোধ ও ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছে, যা তাঁদের অনেককেই মার্কসীয় সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। অন্যদিকে বিশ্বজুড়ে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, কার্ল গুস্তাফ ইয়ুং, হ্যাভলক এলিসের যৌনচেতনা-নির্ভর মনোবিজ্ঞানের মতবাদে পুষ্ট হয়ে মানুষ চেনার গভীর দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের বাস্তববাদ। বস্তুত গুস্তাভ ফ্লবেয়র, এমিল জোলা, মাক্সিম গোর্কি, ন্যুট হামসুন প্রমুখ বিদেশি লেখকের রচনার রূঢ় বাস্তবতা, যৌনচেতনা ও রোম্যান্টিকতা বাঙালি লেখক-পাঠককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

বাংলা ছোটগল্পের উন্মেষপর্বে সার্থকতম ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সামান্য থেকে অসামান্যকে উদ্ধার করে, কথাসাহিত্যের আখ্যানপ্রবণতাকে লিরিকের বিশুদ্ধ বৈশিষ্ট্যে সুস্নিগ্ধ করে, শিল্পকৌশলে আশ্চর্য পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়ে, বাংলা ছোটগল্পকে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন উপকথা, উপাখ্যান ও নকশার ছক থেকে উত্তীর্ণ করেছেন, তেমনি পরবর্তী সব গল্পকারের সামনে উপস্থিত করেছেন নিরীক্ষার এক জোরালো চ্যালেঞ্জ। তাঁর এই চ্যালেঞ্জকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বাগত জানিয়েছেন তরুণ প্রজন্মের গল্পকারেরা। কিন্তু স্বাগত জানালেও এই সুচারু শিল্পগণ্ডিতে বাঁধা পড়ে রবীন্দ্রনাথের দুর্বল অনুসারী হয়ে উঠতে চাননি ভাবী প্রজন্মের লেখকদের অনেকেই। এরই ফলস্বরূপ ১৯২৩ সালে *কল্লোল* পত্রিকার মাধ্যমে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র জন্ম।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রবিরোধিতার এক মূর্তপ্রতীক *কল্লোল* পত্রিকা। দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য কল্লোল যুগের লেখকদের রবীন্দ্রবিরোধিতার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু একইসঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে প্রতিপক্ষ স্থির করে এই সাহিত্যিক বিদ্রোহ গড়ে উঠলেও সমসাময়িক কাল নতুনের আবাহনে তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বাংলা ছোটগল্প একটি নতুন অভিমুখ অর্জন করে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যে বহু প্রতিভাবান কথাশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁদের সচেতন প্রয়াসে বিষয়বৈচিত্র্যে ও নির্মাণসৌকর্যে বাংলা গল্প নতুন এক উচ্চতাকে স্পর্শ করেছে।

ভিক্টোরীয় মূল্যবোধ ও ধ্রুপদি সাহিত্যরুচির প্রতীক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যেমন কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের চোখে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন, একইভাবে সময়ের আবর্তনে কল্লোল গোষ্ঠীও ক্রমশ নতুন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ গোষ্ঠীর লেখকেরা বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁদের কেউই এই বিশেষ ধারায় আবদ্ধ থাকেননি; বরং অনেকেই নিজস্ব পথ খুঁজে

নিতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে নিজেদের স্ব স্ব রচনাশৈলীর জন্য স্বীকৃতিও পেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আবির্ভাব চল্লিশের দশকে হলেও তিনিও আদতে এই লেখকদেরই গোত্রভুক্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সামগ্রিক সাহিত্যচর্চায় তাঁর যাপিত জীবন ও সমকালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যদিও তা একান্তই প্রচ্ছন্ন। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ-সহ সংক্ষুব্ধ সমকালের তাড়না তাঁর সাহিত্যকে ব্যাপকতা দান করেছে। তিনি তাঁর সময়কে চরিত্রের মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছেন; চরিত্রের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাত্রাকে উন্মোচন করেছেন। যা লেখক হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য নির্মাণে সহায়ক হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বাতন্ত্র্য নিরূপণের জন্য তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন প্রতিনিধিত্বশীল গল্পকারের গল্পের প্রবণতা ও আঙ্গিকের পর্যালোচনা করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্রের সমসাময়িক ও কল্লোল যুগের গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৩-১৯৮৮) প্রধানত নাগরিক কথাকার। বিশ শতকে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক টানাপড়েনে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও দাম্পত্য জটিলতা এবং চরিত্রের অন্তঃস্খলন তাঁর গল্পের উপজীব্য। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় নিজভূমে পরবাসী জীবন যাপনে বাধ্য হওয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির নানাবিধ বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে। তাঁর অল্প দু-একটি গল্পে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনীতির স্বরূপ উঠে এলেও রাজনীতি-সচেতন গল্প রচনায় তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। বরং রাজনীতি ও বিপর্যস্ত অর্থনীতির শিকার মধ্যবিত্ত মানুষের অন্তর্জগতের উপস্থাপনের দিকেই তাঁর অধিক ঝোঁক। এই ধারার গল্পগুলোতেই তাঁর সমধিক সাফল্য।

কল্লোলীয় কোলাহল থেকে ক্রম-মুক্তির মাধ্যমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প নিজস্ব চারিত্র্য অর্জন করেছে। জটিল মনস্তত্ত্ব, নাগরিক জীবনের অর্থনীতি, নর-নারীর বহুরৈখিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে উপজীব্য করে তিনি একের পর এক গল্প রচনা করেছেন। মহানগরের রাজপথের আড়ালে মানব জীবনের বিচিত্র অন্ধিসন্ধিও তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। তাঁর 'শুধু কেরানী' (১৯২৪) গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত কেরানি জীবনের সুখ-দুঃখ, রোম্যান্টিকতা, ব্যর্থতা আর পরাজয়ের শমিত প্রকাশ লক্ষণীয়। ক্ষয়ে যাওয়া পরাজিত সময়ের সঙ্গে সর্বগ্রাসী অশুভ সময়ের দ্বন্দ্বের গল্প 'পুন্নাম' (১৯৩০)। কলকাতা নামক মহানগরের বিপদসংকুল গর্ভে এক নারীর বিলীন হয়ে যাওয়ার মর্মভেদী আখ্যান তাঁর 'মহানগর' (১৯৩৭) গল্পটি। মধ্যবিত্তের স্বপ্ন দেখার বিলাসিতা এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তব রূপদানে উদ্যমের অভাবের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার' (১৯৪৬) গল্পে। প্রেম ও ঘৃণার দ্বন্দ্বে দাম্পত্য জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'হয়তো' (১৯২০) গল্পে। এ গল্পে মানব-মনের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি নিরূপণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের

মুনশিয়ানা প্রশংসার দাবিদার। পতিতার জীবন-সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপনের সূত্রে মানব-মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে তাঁর 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' (১৯৩২) শীর্ষক গল্পে।

সমাজবদ্ধ মানুষ যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে সে কথাটি পুনরুচ্চারিত হয়েছে। তাঁর গল্পে আদর্শ আর বাস্তবতা নিরন্তর দ্বন্দ্বে লিপ্ত। তাঁর সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণী গদ্যে দক্ষতার সঙ্গে মিশে থাকে সহজাত কবি-স্বভাব। এই দুইয়ের যুগলবন্দির পাশাপাশি তাঁর গল্প আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অজস্র চিত্রকল্প আর অভাবনীয় কিছু সূচনাবাক্যের ব্যবহারে, যা এক লহমায় গল্পের মেজাজ ধরিয়ে দেয় পাঠককে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'তখন পাখিদের নীড় বাঁধার সময়। চঞ্চল পাখিগুলো খড়ের কুটি, ছেঁড়া পালক, শুকনো ডাল মুখে করে উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিরছে' (প্রেমেন্দ্র মিত্র ২০০১ : ১৪) – 'শুধু কেরানী' গল্পের এই সূচনাবাক্য প্রকৃতপক্ষে গল্পশেষে নীড়ভাঙার ঘটনার পূর্বাভাস।

'সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মঙ্গলগ্রহ', ২০১৫ক : ২৪০)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পের এই সূচনাবাক্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো কবিত্বকে গদ্যভাষায় মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস হয়তো নেই, কিন্তু ভাষার কৌশলে পুরো 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পটি এক বিষণ্ন আবহ নির্মাণ করে, যা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের কুললক্ষণ। বিষয়বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও মূলত নাগরিক মধ্যবিত্তের আখ্যানকার। কিন্তু দুজনের গদ্যশৈলীতে ভিন্নতা রয়েছে; পার্থক্য আছে জীবনদর্শনে ও আঙ্গিক নির্মাণেও। চরিত্রের সূক্ষ্ম ও অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে জ্যোতিরিন্দ্র চরিত্রকে পরিণতি দেন; তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সীমিত কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়। কারণ সীমার ভেতর অসীমের আবহ নির্মাণেই তিনি অধিক মনোযোগী। তাঁর গল্পের চরিত্রেরা হাহাকার করে না, বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয় না। জান্তব পৃথিবীতে ঠিক জন্তুর মতোই বসবাস করে তারা; মানিয়ে নেয়, নুয়ে পড়ে, তবু টিকে থাকতে চায়।

কল্লোল যুগের অন্যতম প্রধান লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁর ছোটগল্পে বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কেবল বিষয়বস্তু নয়, ভাষাভঙ্গির কারণেও তাঁর ছোটগল্প পাঠকহৃদয়কে আন্দোলিত করে। বিচিত্র বিষয়কে উপজীব্য করে রচিত হলেও তাঁর গল্পের অন্যতম প্রধান বিষয় প্রেম – জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি, এমনকি স্মৃতির প্রতিও অপরিসীম মমত্ব তাঁর গল্পের জগৎকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। হৃদয়াবেগ ও ভালোবাসার নানামুখী প্রকাশ রয়েছে তাঁর গল্পে – যেখানে স্বীকৃতি, অপমান, অভিমান, প্রত্যাখ্যান, ঈর্ষা, কামনা, ঘৃণা ইত্যাদি অভিব্যক্ত হয়েছে।

বুদ্ধদেব বসু সমাজ-জীবনের চিত্রকর নন; এ সংক্রান্ত রূপায়ণ তাঁর ছোটগল্পে বিরল। ব্যক্তিগত জীবনে ও নিজের সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি রাজনীতিমনস্ক নন। মূলত তরুণ-তরুণীর মনোজগতে গল্পের সূত্র

অনুসন্ধান করেছেন তিনি। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে আত্মজৈবনিক নানা উপাদান। অধিকাংশ গল্পে তিনি নিজেই নায়ক, আর পার্শ্বনায়ক দুটি নগরী :

> ঢাকা এবং কলকাতা . . . বুদ্ধদেব সর্বার্থে ও সদর্থে নাগরিক। এই নাগরিক লেখার যোগ্য ধাত্রী হয়েছে এই দুটি নগরী। নাগরিকতা – আরব্যানিটি – বললে আমরা যেসব সদ্গুণ চিৎপ্রকর্ষকে বুঝি – বুদ্ধদেব তা আয়ত্ত করেছেন এ দুটি নগরী থেকেই। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ১৯৯)

আদ্যন্ত নাগরিক গল্পকার বুদ্ধদেব এই দুটি নগরীর কাছ থেকে আহরণ করেছেন তাঁর শিল্পলোকে বিচরণের জাদুমন্ত্র। তবে নাগরিক জীবনের শিল্পী হলেও বুদ্ধদেব বসু নাগরিকতার সর্বাঙ্গীণ জীবন-জিজ্ঞাসার দিকে দৃষ্টি দেননি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তীকালের অস্থির সময়ে গল্প লিখলেও সমকালের নানা অভিঘাত, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সমস্যাসংকুল নগর-জীবনকে এড়িয়ে তিনি অবগাহন করেছেন ব্যক্তির মানসলোকে। নর-নারীর মন দেওয়া-নেওয়ার রহস্য তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁর পাত্র-পাত্রীদের প্রত্যেকেরই বিশেষ স্থানিক ও কালিক পরিসর রয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু মানুষের বহির্জীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তিনি তার মনোলোকের রহস্য উন্মোচনেই অধিক মনোযোগী। তাঁর গল্প একান্তভাবে অন্তঃসমাহিত, পারিপার্শ্বিক জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেকটাই অন্তর্বদ্ধ। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর গল্পের ঝোঁক ‘স্বগতোক্তির দিকে’, ‘মনস্তত্ত্বের দিকে’ (বুদ্ধদেব বসু ২০০০ : ৭৭)। গল্পকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর আবির্ভাব মূলত তাঁর প্রেমের গল্পগুলোর মাধ্যমে। প্রেমের সূত্র ধরেই তাঁর গল্পে প্রবেশ ঘটেছে যৌনতার। যৌনতৃষ্ণার দুঃসাহসী অভিজ্ঞান ‘রজনী হ’ল উতলা’ (১৯২৩), ‘এমিলিয়ার প্রেম’ (১৯৫৬), ‘সবিতা দেবী’, ‘বোন’ প্রভৃতি গল্প। ‘রজনী হ’ল উতলা’র তীব্র সমালোচনা তাঁকে ছোটগল্প রচনায় উৎসাহিত করেছিল (বুদ্ধদেব বসু ২০১৬ : ১৮৮)।

সহজ যৌনবাসনার সঙ্গে কবিসত্তার একীভবনে সুসন্নিবিষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর গল্প। তিন তরুণের প্রেম ও ভাবোচ্ছ্বাসের কাব্যময় রূপায়ণ ‘আমরা তিনজন’ (১৯৫৬)। নিজের অন্তর্গত পশু-সত্তার সঙ্গে লড়াইয়ে পর্যুদস্ত, অবলুপ্তপ্রায় মানুষের আকস্মিক আত্ম-আবিষ্কারের বিষণ্ন আখ্যান ‘চোর! চোর!’ (২০১৭)। যদিও এই পটভূমিতে সংলাপের বাহুল্যের কারণে গল্পটি বাস্তবানুগ হয়ে ওঠেনি। আবার একনিষ্ঠ প্রেমের গহনে সুপ্ত যৌনতা এবং তারই ফলস্বরূপ ঈর্ষাপরায়ণতার চরম অভিজ্ঞান ‘এমিলিয়ার প্রেম’। কাব্যময় গদ্য গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে, সেখানে নগ্নতার উগ্র রূপ ও বিভীষিকার প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঘটেনি। তবে পরিণত বয়সে মাত্রাতিরিক্ত আবেগময়তার কারণে গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা ও শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয়। বুদ্ধদেবের গদ্যের এই কাব্যময়তা কেবল ভাষা ও বাচনভঙ্গির নয়, বরং সমগ্র

শৈলীর; যার পেছনে তিনি তাঁর রোম্যান্টিক কবিমনকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। সমালোচক বিশ্বজিৎ ঘোষের মতে :

> তাঁর প্রথম দিকের প্রেমের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে প্রসন্নতা আর সার্থকতা, দ্বিতীয় পর্বে এসেছে বিচ্ছেদ আর ব্যর্থতা। অবদমিত যৌন-আকাঙ্ক্ষার মর্মভেদী যন্ত্রণা থেকেই তাঁর নায়ক-নায়িকারা নিপতিত হয়েছে বিচ্ছিন্নতার তমসগুহায়। বুদ্ধদেবের গল্পে প্রেমের আধারে মূলত শিল্পিত হয়েছে অ-প্রেমের যন্ত্রণা। তাঁর প্রথম দিককার প্রেমের গল্পে (পঞ্চাশ-পূর্ববর্তী গল্পসমূহ) রোমান্টিক আবেগ, বর্ণনা ও উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য দেখা যায়, যা উত্তরপর্বে রূপান্তরিত হয়েছে ক্লাসিক সংহতিতে। পঞ্চাশ-পরবর্তী বুদ্ধদেবের ছোটগল্পে প্রেম এসেছে স্মৃতি-অনুষঙ্গে – স্মৃতিই হয়ে ওঠে এ পর্বে বুদ্ধদেবের প্রেম-অনুধ্যানের মৌল আধার। (বিশ্বজিৎ ঘোষ ২০১৭ : পৃষ্ঠাঙ্কবিহীন)

প্রেম ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে রচিত গল্পে বুদ্ধদেব বসুর সৃজনকুশলতার অন্যতম দৃষ্টান্ত *ভাসো আমার ভেলা* সংকলনের বেশ কিছু গল্প। এই সংকলনের 'রোদ' নামক গল্পে পরিণত জীবনে বাল্য-কৈশোরে ফিরে যাওয়া, শাসন না মানা, নিয়ম ভাঙার উদ্দামতাকে আস্বাদন করে হঠাৎ ফিরে পাওয়া আবেগ এবং তার প্রতিক্রিয়ার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ভাষা পেয়েছে। এতে ঘটনাপ্রবাহ বিশেষ নেই, কেবল অনুভূতির অনুপুঙ্খের কাব্যময় বর্ণনা। এসব গল্পে স্বার্থকেন্দ্রিক সাংসারিক সম্পর্ক, সংকীর্ণ পারিবারিক বন্ধন, নারীপুরুষের ইতরতা যেমন প্রদর্শিত হয়েছে, তেমনি কৌতুক ও বাৎসল্য রসেরও প্রকাশ ঘটেছে। খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত একটি বিপুলায়তন অভিধান রচনা করতে গিয়ে একটি জীবন নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কাহিনি 'একটি জীবন'। যদিও জীবনের কাছ থেকে বেশি কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা অভিধান-রচয়িতা হরপ্রসাদ পণ্ডিতের ছিল না, তবুও জীবনসায়াহ্নে মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে প্রাপ্ত স্বীকৃতি থেকে তাঁর মুখ ফিরিয়ে নেওয়া গূঢ় ইঙ্গিত বহন করে। এটি লেখকের একটি ব্যতিক্রমী ও শক্তিশালী গল্প।

বুদ্ধদেব বসুর অধিকাংশ গল্পে আত্মকথনের ভঙ্গিতে কাহিনি বিবৃত হয়েছে, এর মধ্য দিয়েই চরিত্রের ভাবনাজগৎও ক্রম-উন্মোচিত হয়েছে। তাঁর গল্পগুলো সংলাপ-প্রধান এবং অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের মাধ্যমেই বিবৃত হয়েছে ঘটনাপ্রবাহ। এক্ষেত্রে লেখকের গল্পকার-সত্তার তুলনায় নাট্যকার-সত্তাকে অধিক সক্রিয় বলে মনে হয়। কখনো কখনো সংলাপের বাহুল্য গল্পের দুর্বলতা বলেও বিবেচিত হতে পারে।

বুদ্ধদেবের গদ্য কাব্যধর্মী, কিন্তু তাতে কাব্যের আড়ম্বর নেই। তাঁর অনেক গল্পই কবিতার আবহে গড়া; গল্পের কাহিনি থেকে সুপ্রযুক্ত স্পন্দমান গদ্যশৈলীকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে গল্পের কঙ্কাল মাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাঁর সাহিত্যে জীবনশিল্পের চেয়ে বাণীশিল্পের চমৎকারিত্বই অধিক চিত্তাকর্ষক। রবীন্দ্রনাথ-

বীরবলের পরবর্তী যুগে বাংলা গদ্যকে যাঁরা শিল্পসুষমা দান করেছেন বুদ্ধদেব তাঁদের অন্যতম। 'তাঁর পরিচ্ছন্ন গদ্যে শিল্পের সৌন্দর্য ঝলমল ক'রে ওঠে' (জগদীশ ভট্টাচার্য ১৯৫৩ : ৬)।

বুদ্ধদেব বসু ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনায় বলা যায়, উভয় লেখকই চরিত্রের মনস্তত্ত্বের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী। দুজনের গল্পেই প্রেম ও যৌনতা বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের প্রেম ও যৌনতা-কেন্দ্রিক গল্পগুলো তাঁর চরিত্রগুলোর মনোজাগতিক বিকার কিংবা হীন স্বার্থসিদ্ধির সূক্ষ্ম আখ্যান। সেই প্রেমে প্রাচুর্য নেই, মহত্ত্ব নেই, রয়েছে বিড়ম্বনা ও প্রতারণার কদর্য চিত্র। অন্যদিকে বুদ্ধদেবের গল্প রোমান্সধর্মী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গদ্যশৈলীর ক্ষেত্রে কেবল প্রেম, ভালোবাসা, যৌনতা এবং নিসর্গকে উপজীব্য করে লেখা গল্পগুলোতে কাব্যময়তাকে আশ্রয় করেছেন। অন্যদিকে কাব্যময়তা বুদ্ধদেব বসুর গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) আবির্ভাব ঘটে কল্লোল যুগের অবসানের পর। তা সত্ত্বেও তাঁকে কল্লোল যুগের বিলম্বিত প্রতিনিধি ('Belated Kallolian' বা 'পরাগত কল্লোলীয়') হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে (বুদ্ধদেব বসু ২০১৮ : ৪৫০)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য – মানবের প্রতি আস্থা ও বিজ্ঞানবোধ। তাঁর গল্পে একদিকে শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণির শরীর-মনের ক্লেদ ও গ্লানি, অন্যদিকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনপ্রবাহের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা উপস্থাপিত হয়েছে। 'চেতন, অবচেতন ও অচেতন মন, হৃদয়াবেগ, মানবীয় অনুভূতি ও বুদ্ধি, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে অখণ্ড মানবসত্তা মানিকের আরাধ্য; তার খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১৮ : ৩১১-৩১২)। এই অখণ্ড মানব, তার গড়া সমাজ ও সংস্কৃতি, তার মূল্যবোধ, যুগধর্ম প্রভৃতির প্রতি সার্বিক আস্থা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পবোধের মূল ভিত্তিস্বরূপ। জীবনসত্যের বিবর্তনশীল ক্রমপরিণতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন তিনি। মানিক সমাজসচেতন শিল্পী, আর তাই সমকালের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নানা অভিঘাত এবং এ সকল অভিঘাতে মানুষের পরিবর্তনশীল মূল্যবোধ নিরন্তর তরঙ্গায়িত করেছে তাঁর গল্পকে। শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামশীলতার প্রতি পক্ষপাত, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবতাবোধ, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সানুপুঙ্খ রূপায়ণ, আধুনিক জীবনবোধ প্রভৃতি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের মৌল বৈশিষ্ট্য। তাঁর গল্পের আধুনিকতা সম্পর্কে সৈয়দ আজিজুল হকের মন্তব্য স্মর্তব্য :

> মানিকের আধুনিকতার মূল নিহিত তাঁর জীবন সম্পর্কিত মনোভঙ্গির বিশিষ্ট প্রবণতায়। . . . প্রসঙ্গত তাঁর ব্যক্তিজীবনের কয়েকটি গুরুতর সত্যও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। প্রায় সমগ্র লেখক জীবনে চিকিৎসাতীত মৃত্যুস্পর্শী ব্যাধি, পরিণতিতে নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুচিন্তা ও জীবনসংক্রান্ত অনিশ্চয়তা, অস্তিত্বরক্ষার

> আন্তর্গরজে পানাভ্যাস – অথচ যা আসক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে এক সময় তাঁর অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তোলে – আর এই সঙ্গে তাঁর নিয়মিত দারিদ্র্য প্রভৃতি অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপরিত্যাজ্য উপাদানসমূহ তাঁর মৃত্যুকে যেমন নিকটতর করেছে তেমনি দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এসব তাঁর আধুনিক মননগঠনেও সহায়ক উপাদান। মানিক-সৃষ্ট অধিকাংশ কেন্দ্রীয় চরিত্র যে নৈঃসঙ্গ্যবোধ দ্বারা তাড়িত, তার পেছনে তাঁর ব্যক্তি জীবনের আরোগ্য-অতীত ব্যাধি ও সার্বক্ষণিক মৃত্যুচিন্তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। (সৈয়দ আজিজুল হক ২০১৮ : ৫৬)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ভেদী অনুসন্ধিৎসা মানব-মনের নিগূঢ় তাৎপর্যের কিংবা বহির্ঘটনার অন্তঃক্ষোভের রূপায়ণে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে তাঁর কথাসাহিত্যে মৃত্যুচিন্তা, রোম্যান্টিকতা কিংবা লিবিডো-তাড়না প্রভৃতির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল থেকেছে রহস্য-আচ্ছাদিত এক জীবনবোধ।

বস্তুত মানিকের সংশয়ী দৃষ্টিভঙ্গি, বিকৃত মনস্তত্ত্বের প্রতি ঝোঁক, মধ্যবিত্ত জীবনের সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতার প্রতি ঘৃণা, নরনারীর যৌন জটিলতা ও দরিদ্র মানুষের কঠোর জীবনযাপনকে সাহিত্যে তুলে আনার প্রয়াস এবং সর্বোপরি নিরাসক্ত বিশ্লেষণে বৈচিত্র্যপূর্ণ বাস্তবতাকে উপস্থাপনের প্রবণতায় কল্লোলীয় ভাবাদর্শের অনুবর্তন স্পষ্ট। 'আত্মহত্যার অধিকার' (১৯২৮), 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৩), 'সরীসৃপ' (১৯৩৩) প্রভৃতি গল্পে তিনি ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বকেই শিল্পসম্মতভাবে প্রয়োগ করেছেন।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে দেখা যায় অন্তহীন ও দুর্বিষহ দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও মানুষের আত্মহত্যার অধিকার নেই। আত্মাকে কুণ্ঠিত করায় নয়, আত্ম-বিস্তারের মধ্যেই জীবনের সত্য নিহিত। অপরিসীম প্রাণময়তা, দুর্নিবার গতি, প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াইয়ের গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক'। সভ্যতার আলো থেকে দূরে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে ভিখুর উত্থান ও বিলয়, তবু বেঁচে থাকার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বিপুল জীবনোদ্যমকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এই গল্পে। হত্যার অভিযোগে স্বামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ, পরবর্তীকালে তা রদ করা প্রভৃতি ঘটনার পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একজন গৃহবধূর জীবনকে কীভাবে বিব্রত করে, তা বিবৃত হয়েছে তাঁর 'ফাঁসি' (১৯৩৫) গল্পে। আবার মধ্যবিত্তের ক্রূরতা, নীচতা ও কদর্যতার নগ্ন পরিচয় উঠে এসেছে 'আততায়ী', 'সিঁড়ি' ও 'সরীসৃপ' গল্পে। বন্ধু বন্ধুর ক্ষতিসাধন করে, তার স্ত্রীকে কীভাবে করায়ত্ত করে তারই আখ্যান 'আততায়ী'। অক্ষম দরিদ্র ভাড়াটের ভাড়া দিতে না পারার ব্যর্থতায় তার স্ত্রী-কন্যার দেহের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কূটকৌশলের কাহিনি 'সিঁড়ি'। তবে ব্যর্থতা, হতাশা আর অসহায় অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেননি মানিক। তাঁর গল্প অন্তহীন জীবন-রহস্যের আমেজ জাগায় না। বিজ্ঞানবোধ আর বাস্তবিকতা তাঁর শিল্পীসত্তাকে প্রথম থেকেই ভাবালুতামুক্ত রেখেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমশ মার্কসবাদী চেতনার প্রভাবে বৈষম্যমূলক বণ্টনব্যবস্থা তথা ক্রটিপূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোকে সামাজিক বিকারের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর গল্পে। মানুষকে তার জটিল মনস্তত্ত্বের নিরিখে দেখার বদলে তাঁর লেখায় বড় হয়ে উঠেছে সমসাময়িক রাজনৈতিক আন্দোলন, মানুষের প্রতিবাদী সত্তা ও মানবিকতাবোধ। 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর ভিখু, পাঁচী বা 'কুষ্ঠরোগীর বৌ'-এর কুষ্ঠরোগীর বৌয়ের মতো জটিল চরিত্রের জায়গায় দেখা দিল 'হারানের নাতজামাই'-এর ময়নার মা, বা 'শিল্পী'র মদন তাঁতির মতো চরিত্র, যাদের অস্তিত্ব শুধু প্রতিবাদে, প্রতিরোধে ও মানবিকতায়।

প্রতিবাদ প্রতিরোধ সত্ত্বেও মানুষকে বিস্মৃত হননি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের সুখ-দুঃখ, তার অন্তরের নিগূঢ় প্রবৃত্তি, অবচেতনের রহস্যময় আচরণ, এসবও তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের প্রভাব সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করা যায় মানিকের রচনায়। মানব-মন বিশ্লেষণে ফ্রয়েড দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি চেতন-অবচেতন ও অচেতন মনের ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত হয়েছেন। ক্রমাগত মনোবিশ্লেষণ ও কার্যকারণের নেপথ্যের ব্যাখ্যার ফলে তাঁর গল্পের চরিত্ররা চূড়ান্ত পতনেও স্থির থেকেছে। তাদের পরিবর্তিত অবস্থার পেছনের ব্যাখ্যা – যা তাদেরই বিশ্লেষণে প্রাপ্ত – তাদের হতাশ হতে দেয়নি, ক্ষয়িষ্ণু নব-পরিণতিকেও তারা মেনে নিয়েছে। অবদমিত অদস ও লিবিডোর অন্তর্গত জটিলতা, ইডিপাস কমপ্লেক্স, ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স প্রভৃতি ইঙ্গিতগর্ভ বর্ণনায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এই পর্যায়ের গল্পে। তরুণীর কিশোরের প্রতি আকর্ষণ, তরুণের মায়ের প্রতি আকর্ষণ, তরুণী বধূর শ্বশুরের প্রতি আকর্ষণ, সন্তানহারা মায়ের পুত্র-প্রণয় প্রভৃতি জটিলতার রূপায়ণ ঘটেছে 'মহাকালের জটার জট' (১৯৩২) গল্পে। 'সরীসৃপ' গল্পে দুই বোনকে ঘিরে বনমালীর লিবিডো-তাড়িত যৌনবিকারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে; এর পাশাপাশি চারু, পরী ও বনমালীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও টানাপড়েন, প্রতারণা, প্রতিহিংসা, নির্দয়তা ও মনোবিকারের সূক্ষ্ম রূপায়ণও লক্ষণীয়। ইঙ্গিতময় তীক্ষ্ণ ভাষা, আঙ্গিকগত পরিমিতি ও সাংকেতিক প্রকাশভঙ্গি তাঁর এই পর্বের গল্পগুলোকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে।

পরিবেশগত অনুষঙ্গ, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক গঠন ও যৌনতার জটিল উপস্থাপনের সাদৃশ্যের কারণে কেউ কেউ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব আছে বলে অভিমত ব্যক্ত করলেও জ্যোতিরিন্দ্র নিজে কখনোই তা স্বীকার করেননি। বরং এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান :

> আমি তো বুঝতে পারি না প্রভাব বলতে তাঁরা কোন দিকটার কথা বলছেন? তাঁরা কি সেক্স-এর দিকটা ভাবেন! তাই বা কী করে হয়? মানিকবাবুর সেক্স তো খানিকটা উগ্র, খোলাখুলি। (জ্যেতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২৪৪)

প্রায়-সমসাময়িক লেখকদের সাহিত্য-ভাবনায় ও রচনায় সাদৃশ্য থাকা অস্বাভাবিক নয়। মানিকের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের ভাবনা ও আঙ্গিকে বেশ খানিকটা মিল রয়েছে – এ কথা যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি দুই লেখকের মানস-গঠনের দুস্তর ব্যবধানও এখানে বিবেচ্য। ফ্রয়েড-প্রভাবিত যৌনচেতনা ও বিকার উভয়ের সাহিত্যে প্রভাব ফেললেও মানিক যেখানে পরম জীবন-বিশ্বাসে মানুষের স্বপ্ন-সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্র ক্রমশ হয়ে উঠেছেন নির্লিপ্ত। তিনি নিয়তিকে ক্ষেপিয়ে তুলে যেন মঞ্চে ছেড়ে দিয়েছেন; অথচ আত্মরক্ষার ঢালটুকুও চরিত্রদের হাতে তুলে দেননি। এই পার্থক্যটুকুই দুজনের সাহিত্যের গতিপথকে ভিন্ন অভিমুখে চালিত করেছে।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরসূরি বলে অভিহিত করলেও মানিকের রাজনীতি সচেতনতার বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্রের অন্তর্মুখী নিরাসক্তির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন :

> মানিকের মতো তিনি রাজনীতি-সমাজনীতি সচেতন নন, বরং ব্যক্তিজীবনে ও সাহিত্যজীবনে ইন্ট্রোভার্ট – বাস্তব দৃশ্য ছাড়িয়ে অন্তর্লোকে জ্যোতিরিন্দ্রের উত্তরণ। তবু মননধর্মিতায়, জীবনের জটিলতার শিল্পরূপায়ণে, ব্যক্তি মানুষের স্বভাব বিশ্লেষণে তিনি মানিকের মতোই নির্মোহ নিপুণ শিল্পী। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৩৭৪)

বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'প্রাগৈতিহাসিক' এবং উপন্যাস *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬) যেমন নবযুগের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল তেমনি সুবোধ ঘোষের (১৯০৯-১৯৮০) 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও 'ফসিল' (১৯৪০) গল্প দুটি সাহিত্যাঙ্গনে নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, 'অযান্ত্রিক' নামের রসোত্তীর্ণ গল্পটিই সুবোধ ঘোষের প্রথম রচনা। সমসাময়িক কথাকারদের তুলনায় তিনি পরিণত বয়সে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করেন। তাঁর কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। সার্কাস দলের ট্র্যাপিসের খেলোয়াড় হতে শুরু করে বাসের কন্ডাকটারি – গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিচিত্র সব পেশার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত থাকতে হয়েছে। 'অযান্ত্রিক' গল্পটি সেই কন্ডাকটারির ফসল বললে অত্যুক্তি হবে না। চরিত্র আর পটভূমির নতুনত্ব তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'অযান্ত্রিক' জড় পদার্থের সঙ্গে মানুষের নিবিড় সম্পর্ক রচনার গল্প। সজীব প্রাণীর সঙ্গে স্নেহ-মায়া-মমতাময় সম্পর্কের গল্প লেখা হয়েছে ইতঃপূর্বে, কিন্তু জড়ের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক গড়ে তোলার কাহিনি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎকে একীভূত করার পথকে বেছে নিয়ে যন্ত্রযুগকে স্বাগত জানানোর হৃদয়বৃত্তি অর্জনের সময় এসেছে – এই সময়োচিত উচ্চারণটি বাংলা সাহিত্যে 'অযান্ত্রিক' গল্পেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে।

সুবোধ ঘোষ তাঁর গল্পে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য কিংবা বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশেষ বক্তব্যের শিল্পসম্মত প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'গোত্রান্তর'-সহ আরো অনেক গল্পে। সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র ও শ্রমিক-কৃষিজীবীদের পারস্পরিক সংঘর্ষের নাটকীয় ও রসোত্তীর্ণ রূপ 'ফসিল' গল্পের স্বল্প পরিসরে ব্যাপকতা পেয়েছে। সামাজিক অনুশাসনের দিব্যি দিয়ে এক জননীর কাছ থেকে তার মাতৃ-পরিচয় কেড়ে নিয়ে এবং তার বারবণিতা-পরিচয়কে প্রধান করে তাকে সমাজচ্যুত করার মর্মান্তিক কাহিনি 'পরশুরামের কুঠার'। মধ্যবিত্তের এক বিশেষ বর্গের নৈতিক অধঃপতন ও গোত্রান্তরের ইঙ্গিতপূর্ণ উপস্থাপন 'গোত্রান্তর'। গল্পটিতে অর্থপরায়ণতার একটি সম্ভাব্য পরিণতির বর্ণনায় লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে বিপ্লব ও ধনতন্ত্রের মর্মস্থল পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

সৌন্দর্যের প্রথাগত মানদণ্ডকে ভেঙে দিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার প্রয়াস রয়েছে সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম' গল্পে। মহাযুদ্ধের আবর্তে দেশব্যাপী উদ্ভ্রান্তি ও বিহ্বলতা এবং একটি ক্ষুদ্র ও দরিদ্র সংসারের ভাঙনের মর্মস্পর্শী আখ্যান 'কর্ণফুলির ডাক'। ব্যক্তিগত মতাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও তাঁর রচনার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো। 'ফসিল', 'গোত্রান্তর' প্রভৃতি গল্পে শ্রেণিচেতনার আভাস রয়েছে, তবে সেখানে কোনো সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেননি লেখক। ভালোবাসার শাশ্বত রূপ এবং মানব-মনের রহস্যময়তার স্বচ্ছন্দ ও নান্দনিক প্রকাশ 'জতুগৃহ' গল্পটি।

সুবোধ ঘোষের গদ্যভঙ্গির বিশিষ্টতা বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থানটি নির্দিষ্ট করে রেখেছে। আলংকারিক হয়েও তাঁর গদ্য উচ্ছ্বসিত নয়, সংযত। তাঁর কিছু গল্পে রয়েছে ধ্রুপদি গদ্যভঙ্গি। অপ্রচলিত তৎসম শব্দের সমাহারে এ গল্পগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাঁর গদ্যভাষা গল্পের প্রয়োজনে কখনো আলংকারিক, কখনো বর্ণনাময়, আবার কখনো রোম্যান্টিক। তবে সবগুলো ভঙ্গিই তাঁর গল্পে সুপ্রযুক্ত। কখনো কখনো একটু বেশি নাটকীয় হলেও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, ব্যঙ্গনৈপুণ্য, প্রতীকী ব্যঞ্জনা এবং অমূর্ত ভাবকে প্রাণবন্তভাবে মূর্ত করার প্রবণতার কারণে তাঁর গদ্যভঙ্গি প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র।

গল্পের আঙ্গিক, বিষয়-ভাবনা ও ভাষাভঙ্গি – সব দিক থেকেই জোতিরিন্দ্র নন্দী ও সুবোধ ঘোষ আলাদা। সমসময়ের প্রকরণ গ্রহণ ব্যতীত তাঁদের মধ্যে দৃশ্যত কোনো মিল নেই। রাষ্ট্র ও সমাজের মর্মমূলে আঘাত করার জন্য সুবোধ ঘোষ সাধারণত বিতর্কিত ও সমসাময়িক আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় পরিসরে গল্পের বিস্তার ঘটান; অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্র তুচ্ছ বিষয়কে বিস্তারিত করে তোলেন, মুহূর্তকে ভেঙে দেখানোতেই তাঁর মুনশিয়ানা।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমকালের আরেকজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) নারীপুরুষের বৈষম্য ও নারীর অধিকারহীনতা দ্বারা আবাল্য তাড়িত হয়েছেন। এর প্রতিফলন রয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। সংসারের নানা জট-জটিলতা, ঘাত-প্রতিঘাত ও সুবিধা-অসুবিধার মধ্যে থেকে নারীদের নিজস্ব

অস্তিত্ব ও মর্যাদার উপলব্ধি এবং ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ তাঁর গল্পের মূল্য উপজীব্য। ‘না’, ‘নারী প্রকৃতি’, ‘সর্পশিশু’, ‘অনাচার’ প্রভৃতি তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল গল্প।

আশাপূর্ণা দেবীর প্রথমদিকের গল্পগুলোতে জীবন-ভাবনার গভীরতা স্বল্প হলেও পরবর্তীকালের রচনায় অতল গভীরতা, প্রখর সংবেদনশীলতা ও পরিপূর্ণতার ছাপ পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর ‘না’ শীর্ষক গল্পটি ‘নারীপ্রকৃতি’ নামের গল্পটির চেয়ে প্রকরণে ও ব্যঞ্জনায় ভিন্ন।

নিত্যনতুন কথার ঢেউ, উপন্যাসে যার ঠাঁই হয় না, তা-ই যেন ছোটগল্প লিখতে প্ররোচিত করেছে আশাপূর্ণা দেবীকে। তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃতের স্পর্শ নেই, প্রকৃতির পদচারণা নেই, ধর্মীয় ছুঁতমার্গ নেই। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর গল্পের মূল সুর এক মনে হলেও তাতে উত্থান-পতনের বৈচিত্র্য রয়েছে। চমকহীন, উত্তেজনাবর্জিত গল্পের কাহিনিকে ভাষানৈপুণ্যের মাধ্যমে তিনি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছেন; নারীর ঘরের ও মনের অন্দরমহলকে বঙ্গীয় পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর গল্প প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

> আশাপূর্ণা গুপ্ত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের কেবল বহির্লোকের নয়, অন্তর্লোকেরও নিপুণ কথাকার। . . . মেয়েদের চোখে এই জীবনকে অন্তর্গত নরনারীকে দেখেছেন আশাপূর্ণা গুপ্ত। আর সেই দেখার মধ্যে কোন মেয়েলিপনা নেই। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৩২১)

আশাপূর্ণা দেবীর শৈশব কেটেছে উত্তর কলকাতায়। সংস্কারাচ্ছন্ন ঠাকুরমার কঠোর শাসনের কারণে তিনি প্রথাগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পরবর্তীকালে মায়ের আনুকূল্যে ঘরে বসেই বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। তাঁর মা ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠক। মায়ের উৎসাহেই সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয় তাঁর। ১৯২২ সালে মাত্র তেরো বছর বয়সে শিশুসাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য-প্রয়াসের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে স্বামীর অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্যজগতে পদার্পণ করেন। পূর্ণবয়স্কদের জন্য লেখা তাঁর প্রথম গল্প ‘পত্নী ও প্রেয়সী’ (১৯৩৬)। আশাপূর্ণা দেবীর অভিজ্ঞতার পরিসর বিস্তৃত নয়। পিতৃকুল, মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলের গণ্ডিবদ্ধ পরিসরের জীবনাভিজ্ঞতাই তাঁর গল্পের অবলম্বন। ‘. . . নিরাসক্ত প্রকাশের প্রকরণ-হেতু, অনেক সময় নাকি এমনও ভাবা হয়েছিল যে, আশাপূর্ণা ছদ্মনামে পুরুষ লেখক’ (ভূদেব চৌধুরী ২০০০ : ৯২)। নারীসুলভ ভাবাবেগ থেকে মুক্ত হয়ে পারিবারিক জীবনের অনুপুঙ্খ চিত্রণে তাঁর মমত্ববোধের ছাপ পরিস্ফুট হয়েছে।

বিশ শতকের নারী স্বাধীনতার চিত্র আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের মূল উপজীব্য। পারিবারিক অর্গল থেকে নারীর মুক্তি ও একান্নবর্তী পরিবারগুলোর ভাঙনের এক শতাব্দীব্যাপী সময়ের চালচিত্রে বাঙালি নারীর অন্দর ও বাইরের চিত্রকে তিনি গল্পে প্রাধান্য দিয়েছেন। গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনকে তিনি নারীর

অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাঁর গল্পে প্রকাশিত হয়েছে পুরুষের সঙ্গে প্রতিতুলনায় নারীর মনুষ্যত্বের সমান স্বীকৃতির কথা। লেখকের ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতাই তাঁর এই প্রত্যাশাকে তীব্রতর করেছে। নারীদের সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবা, জ্ঞানের আলো থেকে তাদের দূরে রাখা – এসকল বঞ্চনার শিকার তিনি নিজেও; তাই তাঁর গল্পে সেই সমাজচিত্র তুলে ধরতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। তবে নারীর জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সাহিত্যে কেবল তাকে ব্যবহার করাই নয়, আশাপূর্ণা তাদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তাটিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন মেয়েরাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ; পুরুষের সঙ্গে নারীর পার্থক্য প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের সমাজবিধিরই পরিণাম।

সংসারের নানা জটিলতার মাঝে নারী কীভাবে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করছে, পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতায় কীভাবে তার হৃদয়ে-মননে জাগরণের অনুরণন জাগছে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত ডিঙিয়ে সে কীভাবে নিজের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হচ্ছে – এ সবই অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গল্পে। 'আত্মহত্যা' (১৯৪৮) গল্পে ধ্বনিত হয়েছে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। নিম্নমধ্যবিত্তের নানা দুর্বলতা, আত্মপ্রবঞ্চনা ও মানবিকতাবোধের অবমাননার বিরুদ্ধে তাঁর কলম ছিল প্রতিবাদী। এ গল্পটিতে তা অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সর্পশিশু' (১৩৫৪) গল্পেও সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে ফেলী নামের একটি অনাথ শিশুর কুটিল হয়ে ওঠার আখ্যান এ গল্পটি। 'অনাচার' (১৯৫৯) গল্পে হিন্দু সমাজের নানা ক্ষতিকর সংস্কার, আচার ও বিধির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন লেখক। 'ইজ্জত' গল্পেও সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোক শ্রেণির বিরুদ্ধে ছোটলোকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'শাস্তি' গল্পটি এক অত্যাচারী সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের গর্জে ওঠার কাহিনি। পুত্রের দ্বারা এক বাগ্‌দী মেয়ের ধর্ষণের শাস্তিস্বরূপ মা তার সন্তানকে উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেয়।

আশাপূর্ণা দেবী বাঙালির অন্দরমহলের সম্পর্কের টানাপড়েনকে গল্পে স্থান দিয়েছেন আন্তরিকতার সঙ্গে। পারিবারিক পরিসরে পুরুষ-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য রাজনীতির প্রয়োগে কীভাবে তৈরি হয় প্রতিদিনের মেয়েলি প্রতিরোধ, কীভাবে যৌনতাকে খুব সূক্ষ্মভাবে নিজের সুবিধার্থে প্রয়োগ করে পুরুষ-প্রাধান্যের আপাতকাঠামো বজায় রেখে বিনা সংঘর্ষে নারী জয় করে নিতে পারে নিজস্ব অধিকার, তার আত্মপ্রত্যয়ী উপস্থাপন রয়েছে আশাপূর্ণার গল্পে। নারীবাদ প্রসঙ্গে উচ্চবাচ্য না করে বহুযুগের প্রচলিত শৃঙ্খল ভাঙার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তাঁর গল্পে। আশাপূর্ণা দেবীর গল্প প্রসঙ্গে সমালোচক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেন:

> বিচিত্র ধরনের গল্প লিখে আশাপূর্ণা তাঁর চিন্তা, বুদ্ধি, কৌতুক ও পর্যবেক্ষণের নৈপুণ্য দেখালেও সমাজ সংসারের সংঘর্ষে ব্যক্তি মানুষ যেখানে নিঃসঙ্গ ও

অসহায়, ক্ষতিপূরণে তৎপর, ব্যঙ্গমুখর কিংবা প্রতিশোধস্পৃহায় জাগ্রত – কিংবা নতুন কোনো মানসতার হঠাৎ আমূল পরিবর্তন – সেখানে তিনি প্রথম শিল্পী। (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ১৩৮৬ ব.: ৭)

সমসাময়িক সমাজের গতিপ্রকৃতির উপস্থাপন এবং নারীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ব্যঞ্জনাময় প্রকাশে সংযোগহীন সাদৃশ্য ছাড়া জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পের বিশেষ মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাবনা ও সৃষ্টির ধরন, ভাষা ও আঙ্গিক নির্বাচন, মানুষের মন ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া – কোনো ক্ষেত্রেই দুজনের মধ্যে দূরবর্তী আত্মিক যোগাযোগ ঘটেনি।

কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) অসামান্য পর্যবেক্ষণ ও নিবিড় অনুভবের শক্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁর অননুকরণীয় রচনাশৈলী ও গদ্যভঙ্গির কারণে তিনি পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেননি, বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার বাইরেই থেকে গেছেন। জনপ্রিয়তার মোহকে দূরে সরিয়ে রেখে গদ্য ও আঙ্গিক নিয়ে নিরীক্ষায় মনোনিবেশ করেছিলেন কমলকুমার। তাঁর গল্পের বিষয় যেমন নতুন, তেমনি গল্প বলার ভাষাটিও অভিনব – তিনি প্রচলিত ছাঁদকে পরিহার করে স্বতন্ত্র এক বাংলা গদ্যভাষা নির্মাণ করেছেন। ফরাসি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতার দরুন তিনি বাংলা গদ্যে ফরাসি মেজাজ আনতে চেয়েছেন। 'তিনি নিজে অনেকসময় বলতেন, বাংলা গদ্যের সিনট্যাক্স হুবহু ইংরেজি গদ্যের অনুকরণে, তিনি সেই প্রথা ভেঙে ফেলে ফরাসি গদ্যের প্রকরণ আনতে চান' (অলোক রায় ১৯৬৭ : ৫২)। গদ্যের ভেতর তৎসম শব্দের চকিত প্রয়োগ মুহূর্তে বিষয় থেকে কথনকে পৃথক করে দেয়, আর এর মধ্য দিয়েই তাঁর গদ্যশৈলীতে মূর্ত হয়ে উঠেছে এক ভিন্ন মাত্রার দ্বান্দ্বিকতা। চিত্রশিল্পী এই লেখকের রচনার নির্মাণশৈলীতে সঞ্চারিত হয়েছে চিত্রকলার অনুষঙ্গ ও করণকৌশলের দ্যোতনা। রচনায় বাকপ্রতিমা সৃষ্টির মাধ্যমে কমলকুমার নির্মাণ করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের সংঘবদ্ধ জীবনের এক আশ্চর্য আবহ, যা তাঁর শিল্পীসত্তার স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞান।

কমলকুমার মজুমদার বিপুল পাঠকের প্রশংসাধন্য হতে চাননি, চেয়েছেন সংখ্যায় স্বল্প হলেও মনোযোগী একটি পাঠকগোষ্ঠী। তাঁর রচনা ভাষাগত নিরীক্ষার কারণে ক্রমশ হয়ে উঠেছে আরো বেশি দুরবগাহ। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ক্রমবিবর্তন অনুসরণ করলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) সাধুরীতির গদ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) রচনায় অপেক্ষাকৃত সরল রূপ ধারণ করেছে। বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যের ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। লেখ্য ভাষাকে মুখের ভাষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও চলিত ক্রিয়াপদকে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র-পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মানিক) প্রত্যেকেই প্রথম জীবনে

সাধুরীতির গদ্যেই লিখেছেন; তাঁরা বর্ণনায় সাধু এবং সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। জগদীশ গুপ্ত ও সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) প্রথমে সাধু গদ্যে লিখলেও পরবর্তীকালে চলিত রীতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কমলকুমার মজুমদারই সম্ভবত আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একমাত্র কথাসাহিত্যিক যিনি সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভে চলিত গদ্যকে আশ্রয় করলেও পরবর্তীকালে সাধুরীতির গদ্যের চর্চা করেছেন।

তেইশ বছর বয়সে চলিত গদ্যে লেখা 'লালজুতো' (১৯৩৭) গল্পটির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে কমলকুমারের আবির্ভাব ঘটে। রচনার ক্ষেত্রে নিজস্বতা অর্জনের জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় আরো এগারো বছর। বন্যা-উপদ্রুত মানুষের আখ্যান 'জল' (১৯৪৮) শীর্ষক গল্পটি তাঁকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করে। মধ্যবর্তী এই এগারো বছরে স্বাধীনতা সংগ্রাম, খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, কৃষক আন্দোলনের প্রস্তুতি-সহ নানাবিধ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন তিনি। কলকাতার জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। জীবিকাসূত্রে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে, যার প্রতিফলন রয়েছে তাঁর পরবর্তীকালীন রচনায়। এর পাশাপাশি আঙ্গিক ও ভাষা নিয়ে কমলকুমারের নিজস্ব অভিনিবেশ ও নিরীক্ষা তাঁর গল্পে সংযোজন করেছেন ভিন্ন মাত্রা।

কমলকুমার মজুমদারের গল্পে মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের নানা দিক উঠে এলেও তাঁর বিশিষ্টতা ভাষা ও ভাবনার আধুনিকতায়। 'মল্লিকাবাহার' গল্পটি তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতা থেকে দুই নারী পরস্পরের উষ্ণ শরীরী সান্নিধ্য কামনা করে পরস্পরের প্রেয়সীতে পরিণত হয় এই গল্পে। প্রসঙ্গত স্মতর্ব্য, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'সোনার চাঁদ' গল্পে রয়েছে পুরুষের সমপ্রেমের ইঙ্গিত। এই বিতর্কিত বিষয় নিয়ে 'লিহাফ' (১৯৪২, বাংলা অনুবাদে 'লেপ') নামে একটি গল্প লিখে উর্দুভাষী লেখিকা ইসমত চুগতাই (১৯১৫-১৯৯১) ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কমলকুমারের 'মল্লিকাবাহার'-এর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু না হওয়ার কারণ – *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটি অনেকেই ধৈর্য ধরে পড়েননি, কিংবা পড়লেও ঠিকমতো বুঝতে পারেননি (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯২ : ২০)। তাঁর 'তাহাদের কথা', 'নিম অন্নপূর্ণা', 'মতিলাল পাদরী'-সহ বেশ কয়েকটি স্মরণীয় গল্পে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবিক বিপন্নতা-সহ সমকালের বিবিধ সংকট চিত্রিত হয়েছে।

কমলকুমার মজুমদারের 'তাহাদের কথা' (১৯৫৮) গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামী মানুষের স্বপ্নভঙ্গের গ্লানি ও নিঃসঙ্গ জীবনের কথা সুনিপুণ আঙ্গিক-সৌকর্যে বিবৃত হয়েছে। তাঁর গল্পে ব্যক্তির অন্তর্জগতের কথা যেমন আছে তেমনি রয়েছে সমষ্টিগত বঞ্চনার ইতিহাস। 'মল্লিকবাহার', 'মতিলাল পাদরী', 'ফৌজ-ই-বন্দুক' (১৯৬১) গল্পে ব্যক্তির সমস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে 'জল', 'তেইশ', 'কয়েদখানা', 'তাহাদের কথা' প্রভৃতি গল্পে উত্থাপিত হয়েছে সামষ্টিক সংকটের প্রসঙ্গ। শেষোক্ত গল্পগুলোয় সাধারণত নিম্নবিত্ত বা ধ্বসে-পড়া মূল্যবোধের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রিত হয়েছে।

সমষ্টিকেন্দ্রিক মানুষের সমস্যার আখ্যানগুলি গড়ে উঠেছে গ্রামাঞ্চল বা শহরতলিকে কেন্দ্র করে, অন্যদিকে ব্যক্তিসমস্যার কাহিনির পটভূমি নির্মিত হয়েছে কলকাতা বা অন্য কোনো নাগরিক পরিমণ্ডলকে ঘিরে।

প্রথম পর্যায়ের গল্পে কমলকুমার মজুমদার কৃষক আন্দোলন, স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও বিশ্বযুদ্ধকালীন মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে দরিদ্র মানুষের অসহায়তা দেখিয়েছেন। সামষ্টিক জীবনের সমস্যাই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের থিম-ভিত্তিক গল্পে ভাষাগত নিরীক্ষা প্রধান হয়ে উঠেছে, এই পর্যায়ের গল্পে উঠে এসেছে নাগরিক জীবনপ্রবাহ – বিশেষত স্থান পেয়েছে অভিজাত শ্রেণির বিপরীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। এই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত 'খেলা' ও 'বাগান' নামের সিরিজ গল্পে ভাষা ক্রমান্বয়ে জটিলতর হয়েছে (রত্না জোয়ারদার ১৯৯৭)। ভাষাগত জটিলতার কারণে তাঁর এই পর্যায়ের গল্পগুলোর সঙ্গে নির্বাচিত অভিনিবিষ্ট পাঠকের বাইরে সাধারণ পাঠকের সংযোগ স্থাপিত হয়নি।

কমলকুমারের স্বতন্ত্র ভাষারীতি নিয়ে লেখক-সমালোচকদের মধ্যেও রয়েছে বিতর্ক। এই ভাষারীতির সমালোচনা করে নবনীতা দেব সেন মন্তব্য করেছেন :

> মানুষে মানুষে যোগস্থাপনই ভাষার উদ্দেশ্য তাই ভাষাকে নির্ভর করতে হয় কিছুসংখ্যক প্রতীকের উপরে। তার কাজ কেবল সংকেত সরবরাহ করাই নয়, তার অতিরিক্ত কিছু, এবং এই অতিরিক্ত অংশটুকু থেকেই ঘটে সাহিত্যের উৎসরণ। সাহিত্য মানেই সঙ্গ, সংসর্গ . . . এর অর্থ ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলা। কমলকুমারের সাহিত্য এক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্যর্থ। (নবনীতা দেব সেন ১৯৮১ : ৪৭)

অপরপক্ষে এই মূল্যায়নের বিপরীত মতামত ব্যক্ত করেছেন দেবেশ রায়। তিনি সার্বিক বিবেচনায় কথাশিল্পী হিসেবে কমলকুমারের সার্থকতাকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে :

> অনুভূতির ও অভিজ্ঞতার সম্প্রসারণ, ভাষার বহন ও ধারণ-ক্ষমতাবৃদ্ধি, বিষয়ের পরিধিপ্রসার – তাঁর রচনামাধ্যমে এই কাজগুলি বা এর কোন একটিও করে ওঠা একজন কথাশিল্পীর সার্থকতার অনস্বীকার্য চিহ্ন। কমলকুমার মজুমদারের সাহিত্যিক জীবন দীর্ঘ, রচনাসংখ্যা অতি অল্প, কিন্তু তিনি এই তিনটি কাজই করতে পেরেছেন। কথাসাহিত্যের সমস্ত শর্ত পূরণ করেও খুব কম লেখকের পক্ষেই এই তিনটি কাজ করে ওঠা সম্ভব হয়। যাঁরা পারেন তাঁরা সেই সাহিত্যের নির্মাণকর্তাদের ভিতর গণ্য হন। কমলকুমার মজুমদার সোয়া শ বছরের বাংলা কথাসাহিত্যের প্রধান নির্মাণ-কর্তাদের একজন। (দেবেশ রায় ২০১৮ : ১৪৬)

কমলকুমার মজুমদারের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আপাত-সাযুজ্যের একটি ক্ষেত্র ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ। ফ্রয়েডের প্রভাবে তৎকালীন কথাসাহিত্যিকদের রচনায় মনস্তত্ত্বের সুলুক সন্ধানে যৌনতার জটিল ভূমিকা অগ্রাধিকার পাওয়ায় বিষয় ও ভাবনায় অনেক লেখকের মধ্যে দূরবর্তী সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দুই লেখকের ভাষাভঙ্গি ও সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, কমলকুমার মজুমদার ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি ধারার প্রতিনিধি।

জ্যোতিরিন্দ্রের সমসাময়িক আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কথাশিল্পী নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৭-১৯৭৫)। বাঙালি নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের বিভিন্ন দিক স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক চাপে পর্যুদস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবন, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, নগর-জীবনের ব্যর্থতা ও হতাশার চিত্র নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর গল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সমাজসচেতন শিল্পী, তবে কোনো বিশেষ মতাদর্শে তিনি আস্থাশীল ছিলেন না। সুবোধ ঘোষ কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনি রাজনীতি সচেতন নন। সচেতন সংস্কারক-কণ্ঠ উচ্চকিত নয় তাঁর গল্পে। কোনো বিশেষ মত বা গোষ্ঠী দ্বারা প্রভাবিত হননি তিনি। সমাজকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে তিনি খুব কাছ থেকে এর অসঙ্গতিগুলো খতিয়ে দেখেছেন, কিন্তু এসবের প্রতিকারের পথ বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর প্রথমদিকের কিছু গল্পে সমস্যার প্রতিকারের লক্ষ্যে সংস্কারসুলভ মনোভাব প্রকাশ পেলেও শিল্পীসত্তার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। সামাজিক চেতনার চেয়ে সামাজিক পরিস্থিতি নির্মাণেই তাঁর মূল ঝোঁক। তাঁর সাহিত্যচর্চার সময়কাল মোটামুটিভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় থেকে শুরু করে সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই কালপর্বে সমাজ পরিবর্তনের ধারা তাঁর গল্পে অকৃত্রিম সততার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র শিল্পী হিসেবে কিছুটা ন্যাচারালিস্ট। তাঁর পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎ তাঁর গল্পে প্রগাঢ় ছাপ রেখে গেছে। আশা কিংবা নৈরাশ্য, কোনোটাই তাঁর রচনার মূল সুর নয়; তবে চিত্রণের নৈপুণ্যে আর পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাঁর গল্পে নিপীড়িতের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। তিনি জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) মতো তাঁর গল্পের চরিত্রদের সাধারণত কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি করেন না। তাঁর গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে ক্রূরতা কিংবা বিকারের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পে বিশেষ স্থান দখল করে আছে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। এই মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত চরিত্রেরা অর্থনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দেয় না। এই দুই শ্রেণির মানুষের জীবনচেতনা, মূল্যবোধ, সংস্কার ইত্যাদি তাঁর গল্পের মূল উপজীব্য। তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মানবিক মূল্যবোধের বিচিত্র রূপায়ণ। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উপস্থাপনেও তিনি

আগ্রহী। নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা আর মনোজটিলতার চালচিত্র ধরা পড়েছে তাঁর ‘চড়াই উৎড়াই’ (১৯৫০), ‘অবতরণিকা’ (১৯৪৯), ‘অসবর্ণা’ (১৯৫৪), ‘বিকল্প’, ‘টিকেট’ প্রভৃতি গল্পে।

শহুরে মধ্যবিত্তের আত্ম-অবমাননার আখ্যান ‘টিকেট’ গল্পটি। নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায়ত্ব আর মানব-মনের নিগূঢ় বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে ‘বিকল্প’ গল্পে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের কথাকার হলেও ‘চড়াই উৎরাই’ গল্পে মধ্যবিত্তের দৃষ্টিতে উচ্চবিত্ত আর নিম্নমধ্যবিত্তের বিভাজন রেখা চিত্রিত করতে গিয়ে তাদের সাযুজ্য নির্মাণ করেছেন। এই গল্পে লেখক তিনটি শ্রেণির প্রতিনিধিদেরই দক্ষতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তাঁর গল্পে নারীর একটি স্বকীয় সত্তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক জটিলতা ও চরিত্রের সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বময় টানাপড়েনের গল্প ‘শাল’। ‘অবতরণিকা’, ‘অসবর্ণা’ ও ‘সেতার’ও একই পর্যায়ভুক্ত গল্প। নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ, তার স্বাধীনতা ও অধিকার সচেতনতা এবং নিজস্ব সত্তার সাহসী প্রকাশের গল্প ‘অবতরণিকা’। গল্পকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর আত্মনির্ভরতা এবং পুরুষের সাহায্য ছাড়া তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ও সার্থকতা অর্জনের প্রয়াসকে নানাদিক থেকে তুলে ধরেছেন। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের জন্ম ফরিদপুরে, তাই তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে পূর্ব বাংলায়। তাঁর সাহিত্যজীবনের মধ্যপর্বের কয়েকটি গল্পে পূর্ববঙ্গের পল্লিপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ রূপ এবং এখানকার মানুষের গ্রামীণ জীবনের চালচিত্র স্থান পেয়েছে। ‘রস’, ‘পালঙ্ক’, ‘বন্যা’ এ পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকটি গল্পে মুসলমান চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাঁর পূর্বে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের গল্প ‘মহেশ’, প্রবোধকুমার সান্যালের (১৯০৫-১৯৮৩) উপন্যাস *হাসুবানু* ব্যতীত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্পে মুসলমান চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যদিও মুসলমান সমাজের বাস্তবতা সেখানে ততটা নেই। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘রস’ ও ‘পালঙ্ক’ গল্পে হিন্দু ও মুসলমানের চিন্তাভাবনার পার্থক্য সম্পর্কে লেখকের সচেতনতার পরিচয় রয়েছে। ‘রস’ গল্পের মোতালেফ, মাজু খাতুন এবং ‘পালঙ্ক’ গল্পের মকবুল আর ফাতেমাকে বাস্তবতার নিরিখে নির্মিত চরিত্র বলেই মনে হয়।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উভয়েই বিশেষ কোনো সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, নির্দিষ্ট কোনো মতবাদেও তাঁদের আস্থা ছিল না। চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে দুজনের অবস্থান স্বতন্ত্র। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্পের নারীদের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারীদের পার্থক্য বিদ্যমান। নরেন্দ্রনাথের গল্পের নারী চরিত্ররা নারী জাগরণের প্রভাবে সৃষ্ট আত্মসচেতন নারী, যারা সমাজে নিজেদের একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করে নিতে সচেষ্ট। অপরপক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রের নারীদের আত্মসচেতনতার

লক্ষ্য অপরের কাছে ব্যক্তিক পরিচয়কে স্পষ্ট করা নয়; এসব নারী চরিত্রের অনেকে প্রেম ও যৌনতার ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামতকে গুরুত্ব দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসময়ে তাঁর ভাবধারার বিপরীত মেরুর সমাজবাদী ইতিহাস-চেতনাসম্পন্ন যে কয়েকজন লেখকের আবির্ভাব ঘটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৭-১৯৭০) তাঁদের অন্যতম। সমসাময়িক জীবনের বিভিন্ন অভিঘাতকে তিনি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে। দেশপ্রেম ও মানবিকতার বোধ সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

লেখক হিসেবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন। কিন্তু কখনোই কোনো বিশেষ মতবাদের পক্ষ অবলম্বন করেননি তিনি। নিজের গল্পে যাবতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে দেশপ্রেম ও মানবতাবাদকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে, শিল্প-সাহিত্য কখনোই বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারে না। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতাই শেষ কথা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সৃষ্ট ক্ষত ইতিহাস আর স্বাদেশিকতার আলোকে বিধৃত হয়েছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায়। তিনি একইসঙ্গে সময় ও সমাজ সচেতন কথাশিল্পী। মানিকের মতো মার্কসবাদের অন্তর্লীন মানবতাবোধ থেকে বিচ্যুত হননি কখনো। সমাজ-দৃষ্টির বিচারে তিনি সুবোধ ঘোষ, সুশীল জানা (১৯১৬-২০০৮), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৭-২০০৭) ও ননী ভৌমিকের (১৯২১-১৯৯৬) সমপঙ্‌ক্তিভুক্ত হলেও তাঁর গল্পে শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের চিত্র পাওয়া যায় না। তাঁর 'দুঃশাসন', 'হাড়' (১৩৫২ ব.), 'নক্রচরিত', 'বীতংস' (১৩৫২ ব.), 'বনজ্যোৎস্না' প্রভৃতি গল্পে সময় ও রাজনীতি সচেতনতা থাকলেও গল্পকার হিসেবে রোম্যান্টিকতা ও নাটকীয়তার প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল। অনেক গল্পেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি রোম্যান্টিক, সেখানে নাটকীয় মোচড়ের মাধ্যমে সত্যের উন্মোচন কিংবা গল্পের অন্তর্নিহিত বক্তব্য প্রকাশের প্রবণতা লক্ষণীয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক গল্প প্রতীকাশ্রয়ী। ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে শোষক শ্রেণির চরিত্র উদ্‌ঘাটনে তাঁর কলম ছিল ক্ষুরধার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ নিশ্বাস পড়ছিল, দুর্নীতি ও কালোবাজারির দাপটে গোটা বাংলা জুড়ে অন্নবস্ত্রের ভয়ংকর সংকট শুরু হয়েছিল, মজুতদার ও ব্যবসায়ীদের লোভের কারণে কলকাতার সাধারণ মানুষ হয়েছিল সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার, সেই অস্থির কালপর্বে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ আর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তীব্র প্রতিবাদ। তাঁর 'হাড়', 'দুঃশাসন', 'নক্রচরিত', 'পুষ্করা' গল্পগুলোতে এর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

তেতাল্লিশের মহামন্বন্তরের মর্মস্পর্শী আখ্যান 'হাড়'। একদিকে বুভুক্ষু মানুষের হাহাকার আর অন্যদিকে রায়বাহাদুরের বিলাসিতা হাড়ের প্রতীকে শিল্পসফলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে নারায়ণ

গঙ্গোপাধ্যায়ের এই গল্পে। মহাভারতের যুগের নির্মম দুঃশাসনের পরিবর্তিত ও সমকালীন রূপ চিত্রিত হয়েছে তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বস্ত্র-সংকটকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পৌরাণিক কাহিনির সঙ্গে তুলনা করে চোরাকারবারির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে গল্পটিতে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে আঞ্চলিক জীবনের চালচিত্র। 'বীতংস' (১৩৫২ ব.), 'সৈনিক' (১৩৫২ ব.), 'বনজ্যোৎস্না' (১৩৭৬ ব.) প্রভৃতি গল্প প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'বীতংস' গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে কৃষিজীবী অরণ্যচারী মানুষজনকে চা-বাগানের শ্রমিক বানানোর ফাঁদ। বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত সাঁওতাল জীবন এবং ভূমিলুণ্ঠনের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহের আখ্যান 'সৈনিক'। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতার গল্প 'বনতুলসী' (১৩৫২ ব.)। শহুরে যান্ত্রিকতার প্রতি ধিক্কারচিহ্ন 'ভোগবতী' (১৩৫২ ব.)। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সচেতনতা ও আঞ্চলিক জীবনচিত্রের মেলবন্ধন ঘটেছে 'বনজ্যোৎস্না' গল্পে। আগস্ট আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ডুয়ার্সের জঙ্গল আর সাঁওতাল কুলি- জীবনের চিত্র রয়েছে এই গল্পে। এখানে রাজনৈতিক সচেতনতার ঊর্ধ্বে কেন্দ্রীয় চরিত্র ভুটানি মেয়েটির প্রতি লেখকের পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মানবতাবোধের আরেকটি দৃষ্টান্ত ১৩৫০ বঙ্গাব্দে ক্যালকেমিকো কর্তৃক পুরস্কৃত গল্প 'ইতিহাস' (১৯৪৩)। মৃত অতীতের তথ্যস্তূপের বিপরীতে চলমান দ্বন্দ্বমুখরতা ও মানব-মনের সুপ্রবৃত্তিকে স্বাগত জানিয়ে মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। তবে অতিনাটকীয়তার কারণে গল্পটির শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে মনে হয়।

শ্লেষাত্মক ভঙ্গি ও কাব্যময়তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গদ্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। সূক্ষ্ম পরিহাস-যুক্ত এই কাব্যময় গদ্য বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। অনুরূপ সূক্ষ্ম পরিহাসময় শ্লেষাত্মক ভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খেলনা' (১৯৪৬), 'মাছের দাম', 'মাছ' প্রভৃতি গল্পে। তবে 'খেলনা' গল্পটি বাদ দিলে এই দুই লেখকের গদ্যে শ্লেষের ব্যবহার স্বতন্ত্র। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্লেষ রাষ্ট্রের প্রতি, শাসন ব্যবস্থার বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট অনাচারের প্রতি; অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে শ্লেষ ব্যবহৃত হয়েছে চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে প্রকট করার জন্য।

দুঃসহ দুর্যোগের সম্মুখীন মানুষের সংগ্রামকে মানবিকভাবে উপস্থাপন করেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। অন্যদিকে এরকম ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর দৃষ্টিভঙ্গি নিরাসক্ত। সমসাময়িক নানা বিতর্কিত প্রসঙ্গকে আশ্রয় করে পল্লবিত হয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প; সেখানে প্রতিবাদের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর চরিত্রদের মধ্যে প্রতিবাদের স্বর ফুটিয়ে তোলেননি, বরং তারা যেন পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতেই সচেষ্ট। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, সমসাময়িক এই দুই লেখকের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক রয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসময়ের লেখকদের মধ্যে অপর এক প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদার (১৯১৮-২০০১)। তাঁর গল্পের স্বাতন্ত্র্যের মূলে রয়েছে বিষয়-ভাবনা ও ভাষাশৈলীর চমৎকারিত্ব এবং বর্ণনারীতির অভিনবত্ব। অমিয়ভূষণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য লেখেন না, বরং মননশীল পাঠককে ভাষার ইন্দ্রজালে আকর্ষণ করেন। বাংলা গল্পের নিবিষ্ট পাঠকদের কাছে তিনি একজন সমাদৃত লেখক।

'প্রমীলার বিয়ে' (*পূর্বাশা* ১৯৪৬) নামের একটি গল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানবিরোধী লেখক অমিয়ভূষণ মজুমদারের বাংলা গল্পভুবনে আবির্ভাব ঘটে। জন্ম পূর্ববঙ্গে হলেও তাঁর সাহিত্যজীবন অতিবাহিত হয়েছে ভারতের উত্তরবঙ্গে। তিনি দীর্ঘ কয়েক দশকের নানা রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ ও এসবের আর্থ-সামাজিক অভিঘাতের সাক্ষী। আর তাই তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের ফলে উদ্ভূত দুই বাংলার বিপর্যস্ত জনজীবনের মর্মস্পর্শী বর্ণনা।

উত্তরবঙ্গের অবহেলিত জনজীবন ও জাতিভিত্তিক জীবনচর্যার পরিচয় অমিয়ভূষণের রচনাতেই প্রথম উপস্থাপিত হয়েছে। জীবনের নানা টানাপড়েন, প্রেম ও যৌনতা, সামাজিকভাবে অস্বীকৃত পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদির মধ্যে চরিত্রের সপ্রাণ উপস্থিতি তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মহানগরীর নাগরিক জীবনের তুলনায় তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে গ্রাম-গঞ্জ ও অরণ্যের তুলনামূলকভাবে নির্ভার সহজ জীবন। আজীবন কলকাতা নগর থেকে দূরে উত্তরবঙ্গে বসবাস করার ফলে তাঁর গল্পে গ্রামীণ সজীবতা, আঞ্চলিকতা ও প্রান্তিক মানুষের উপস্থিতি লক্ষণীয়। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, ডুয়ার্স, কালিম্পঙের পার্বত্য পরিবেশের স্মরণীয় উপস্থাপন রয়েছে তাঁর কয়েকটি গল্পে। নিম্নবর্গীয় আদিবাসী সমাজ, বিশেষত ডুয়ার্সের রাভা, মেচ, রাজবংশী সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র তাঁর গল্পে আন্তরিকতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর কোনো কোনো ছোটগল্পে ঐতিহাসিক সংকেত, অতীতচারিতা, ব্যক্তির আত্মম্ভরিতা ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদের চিহ্ন রয়েছে।

কেবল গল্প-ভাবনা কিংবা বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব নয়, সেইসঙ্গে নির্মাণ কৌশলের অভিনবত্বও বাংলা কথাসাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। ইতিহাস, পুরাণ, কল্পনা ও বাস্তবের এক বিচিত্র বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পে একটি বাস্তবোত্তর জগৎ সৃষ্টি হয়। তাঁর রচনার আবহ ভাববিহ্বল নয়, বরং মননধর্মী।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের অনেক গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রদের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো – গতানুগতিক জীবন যাপনে হাঁপিয়ে উঠে তারা কোনো এক পূর্ণতার সন্ধানে যাত্রা করে। একে পলায়নপর মনোবৃত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, আবার এভাবেও দেখা যায় যে, মনস্তাত্ত্বিকভাবে চরিত্রগুলো উদ্বাস্তু, যাযাবর। এই প্রবণতার প্রকাশ রয়েছে লেখকের 'উরুণ্ডী', 'সাদা মাকড়সা' প্রভৃতি গল্পে। মানব-সম্পর্কের জটিল ও বিচিত্র বন্ধনের পরিণতি তাঁর গল্পে গ্রিক ট্র্যাজেডির নিয়তিবাদের মতোই অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী।

‘উরুণ্ডী’ ও ‘ইতিহাস’ গল্পে মানবিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে স্বামী-স্ত্রী ও মাতা-পুত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ‘ইতিহাস’ গল্পে নিরুদ্দেশ সন্তানের জন্য পুত্রশোক গোপন করে এক মায়ের ‘গুহগিন্নি’র ব্যক্তিত্ব বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টার সংযত রূপায়ণ ঘটেছে। অবক্ষয়িত সভ্যতার সঙ্গে শূন্যগর্ভ ও নিঃসঙ্গ মানবাত্মার হাহাকারের চিত্র ‘দীপিতার ঘরে রাত্রি’ ও ‘কলঙ্ক’। ‘দীপিতার ঘরে রাত্রি’ গল্পে পরিশীলিত রুচি ও জীবনবোধ প্রেমের উপলব্ধিকে কেমন দূরবর্তী করে তোলে তার শিল্পসফল প্রকাশ ঘটেছে। পারিবারিক আভিজাত্য ও মূল্যবোধের সংকটের কথাচিত্র ‘কলঙ্ক’।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের গল্পের নারী চরিত্রগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা বিশ্লেষণমুখী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারীদের মতোই অমিয়ভূষণের নারীরাও কখনো কখনো ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার শিকার। এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারীদের মতোই তারাও আত্মপ্রেমের আশ্রয় নিয়েছে। অমিয়ভূষণের ‘সুনীতি’ ও ‘পদ্মিনী’ গল্পে একাকী নারীরা নিঃসঙ্গতা মোচনের জন্য উদ্‌গ্রীব। তাঁর কোনো কোনো নারী চরিত্রের গতিবিধি আপাতদৃষ্টিতে নিয়মবিরুদ্ধ হলেও গল্পের ঘটনাপ্রবাহে তা ইতিবাচকতার সঞ্চার ঘটায়। ‘তাঁতীবউ’ গল্পে তাঁতির সন্তান-আকাঙ্ক্ষাকে পরিপূর্ণতা দিতে তাঁতিবউ ফকির থেকে শুরু করে জমিদারের সঙ্গে উপগত হয়। ফকিরের সংসর্গে জন্ম নেওয়া সন্তান রুগ্‌ণ হওয়ার কারণে তাঁতি নিরুদ্দেশ হলে, সুন্দর সন্তান লাভের আশায় জমিদারের সঙ্গে সহবাস করে তাঁতিবউ। লক্ষণীয়, তাঁতিবউ সমাজের সেই পরমসহিষ্ণু নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী, যারা সংসারের সুখের জন্য অক্লেশে নিজেকে উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত।

অমিয়ভূষণের গল্পে লোকায়ত জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। ‘ভূকম্পন’, ‘সাদা মাকড়সা’, ‘পলদহ’, ‘দুলারহিন্‌দের উপকথা’, ‘তাঁতীবউ’, ‘উরুণ্ডী’ প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত হয়েছে গ্রামীণ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বাস্তবতা। ‘সাইমিয়া ক্যাসিয়া’ গল্পে দুর্গম পার্বত্য পরিবেশের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক সংকটের চিত্রে লোকায়ত জীবনের ট্র্যাজেডিতে সঞ্চারিত হয়েছে ধ্রুপদি আবহ।

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দেশভাগে উন্মূল মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ মনোজগৎ অমিয়ভূষণকে তাড়া করে ফিরেছে। শিকড় ছিঁড়ে চলে যাওয়ার হাহাকার এবং উৎসে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর গল্পের ক্ষেত্রভূমি। ‘উরুণ্ডী’ গল্পের পুলিন শোভাকে বলে – “ফারাও ছিল মিশরের রাজা। তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একদল লোক বেরিয়ে পড়েছিল। পিতৃভূমির খোঁজে। তাকে ‘এক্সোডাস’ বলা হয়ে থাকে” (অমিয়ভূষণ মজুমদার, ‘উরুণ্ডী’, ২০১০ : ৬১)। বস্তুত এই নিরন্তর সন্ধান ও যাত্রার অনুষঙ্গ অমিয়ভূষণের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও গঠনশৈলীর নতুনত্বে অমিয়ভূষণ মজুমদারের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তিনি একটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতি নির্মাণে প্রয়াসী হয়েছেন; সেইসঙ্গে তাঁর বিষয়ভাবনাও মনননির্ভর। বিষয় ও আঙ্গিকের স্থাপত্যের কৃৎকৌশল তাঁর করায়ত্ত। তাঁর গদ্যশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বৈঠকী কথকতার ভঙ্গি। বিষয় অনুযায়ী তাঁর ভাষা কখনো বিবৃতিমূলক, সেখানে কথকতার ভঙ্গিটি নৈর্ব্যক্তিক। আবার তাঁর ভাষা কখনো-বা তির্যক। অন্তর্গূঢ় জীবন ও জগতের চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণের গদ্যে কখনো কখনো জাদুবাস্তবতার আবহ নির্মিত হয়, যা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও কখনোসখনো ঘটে থাকে। অমিয়ভূষণের গল্পের ভাষা প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন :

> ভাষাব্যবহারে তাঁর অমোঘ তীক্ষ্ণতা ও অব্যর্থতা, গল্পকে অনাবশ্যক মেদবর্জিত করে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার একাগ্রতা, বহু কৌণিক জীবনকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখার শিল্পসামর্থ্য, সুতীব্র সমাজচেতনার সঙ্গে জীবনের গভীর রহস্যময়তার প্রতি অনিবার্য অঙ্গুলিনির্দেশ – এইসব গুণে অমিয়ভূষণের গল্প এক বিশিষ্ট স্বাদ বহন করে। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৪২৬)

স্বতন্ত্র ভাষা ও করণকৌশলের অভিনবত্বে বাংলা সাহিত্যে অমিয়ভূষণ মজুমদার ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উভয়েই বিশেষ স্থানের অধিকারী। উভয়ের রচনাতেই ভারতবর্ষের অস্থির সমকাল উপস্থিত; যদিও এর উপস্থাপনায় কাল-সচেতনতার আভাস নেই তাঁদের গল্পে। অমিয়ভূষণ বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে তাঁর গল্পের উপজীব্য করেছেন; অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্র কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনচিত্রের রূপকার। চরিত্রের অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণে দুজনই দক্ষ শিল্পী; তবে অমিয়ভূষণ কেবল চরিত্রের মনোজগৎ নির্মাণেই আগ্রহী ছিলেন না, বৃহত্তর মানবসমাজ ও জনগোষ্ঠীর সমন্বিত যাপনচিত্রের উপস্থাপনেও তিনি সমান আগ্রহী। তাই বলা চলে, অমিয়ভূষণ মজুমদার ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দুই পৃথক চেতনালোকের শিল্পী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় যে সামাজিক অবক্ষয়ের জন্ম দিয়েছে সেই সান্ত্বনাহীন সংকটের সফল রূপকার সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫)। আদ্যন্ত নাগরিক ও আধুনিক গল্পকার সন্তোষকুমার ঘোষ ঘটনার আকস্মিকতা থেকে সরে এসে, কাহিনিকে বর্জন করে, বুদ্ধির অস্ত্রে হৃদয়কে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে বাংলাসাহিত্যে তিনিই সম্ভবত পথিকৃৎ। বুদ্ধিকে তান্ত্রিক আচারের ন্যায় ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি সমসাময়িক অন্য লেখকদের থেকে তিনি নিজের আঙ্গিককে পৃথক করে নিয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-সহ বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক প্রথিতযশা লেখকের মতো সন্তোষকুমার ঘোষের জন্মও পূর্ব বাংলায়। ফরিদপুরের রাজবাড়িতে। সাংবাদিক পিতার চাকরির সুবাদে ষোলো বছর

বয়সে তাঁকে সপরিবারে পাড়ি জমাতে হয় কলকাতায়। পিতার মতো তিনি নিজেও সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; যদিও জীবনের একটা বড় অংশ জুড়ে তাঁকে জীবিকার অনিশ্চয়তায় ভুগতে হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো সন্তোষকুমার ঘোষেরও সাহিত্যে পদার্পণ ঘটে কাব্যচর্চার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত জীবনে বহু সংগ্রামে সমৃদ্ধ সন্তোষকুমার ঘোষ রাজনৈতিক উত্তাপে দগ্ধ নাগরিক জীবনকে সচেতন শিল্পীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে তাঁর সাহিত্যে তুলে এনেছেন। তিনি কালসচেতন কথাশিল্পী; কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা সুবোধ ঘোষের মতো তাঁর গল্পে শ্রেণিসংগ্রামের কথা নেই। তবে রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির শৃঙ্খলাজনিত দ্বন্দ্ব একসময় তাঁর লেখাকে যেমন প্রভাবিত করেছে, তেমনি পার্টির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটলেও মার্কসবাদের মানবতাবোধ থেকে তিনি নিজেকে কখনোই বিচ্যুত করেননি।

সন্তোষকুমার ঘোষের প্রথমদিকের গল্পে বারবার ভিড় করেছে সাধারণ মানুষ, শ্রমই যাদের একমাত্র পুঁজি। সামাজিক নিরাপত্তার বলয়ে কখনো এরা স্বাগত নয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এমনকি ধর্মীয় শোষণে এরা পর্যুদস্ত। 'সমাজ-সচেতন গদ্যশিল্পী সন্তোষকুমার ঘোষের চেতনায় সামাজিক ভাঙনের টান প্রখর ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল' (ভূদেব চৌধুরী ২০০০: ১০১)। তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে সমসাময়িক মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবক্ষয় ও মনোবিকলন। এছাড়া তিনি নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রা ও সার্বিক মূল্যবোধকে সহৃদয়তার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, স্বপ্নভঙ্গ, প্রেমহীনতার অস্বস্তি সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। নিম্নবিত্তের জীবন-যন্ত্রণা, মানসিক বিপর্যয়, দ্বন্দ্ব ও অসহায়তাকে তিনি 'শুকসারী' (১৩৬০ ব.), 'পরমায়ু' (১৩৬৪ ব.), 'চীনেমাটি' (১৩৬৬ ব.), 'কড়ির ঝাঁপি' (১৩৬৬ ব.) প্রভৃতি গল্পে স্থান দিয়েছেন। বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর প্রথম পর্যায়ের গল্পে সমবেত মানুষের জীবনজিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক সংকট ও তার প্রকাশ এবং তৃতীয় পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন সেই ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের সদর্থক সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। আপাত-তুচ্ছ বিষয় কিংবা চরিত্রকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে স্থান দিয়েছেন তাঁর গল্পে। প্লটহীনতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টানা গল্প লেখায় তিনি নিরুৎসাহী। *শুকসারী* (১৯৫৩), *চীনেমাটি* (১৯৫৪), *আমার প্রিয় সখী* (১৯৬০), *ছায়াহরিণ* (১৯৬১), *বাইরে দূরে* (১৯৬৭) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলো লেখকের আত্মপ্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছে।

সন্তোষকুমার ঘোষের গল্পে প্রায়শই একটি আত্মজৈবনিক মাত্রা লক্ষণীয়। স্মৃতি বা তীব্র হৃদয়ানুভূতি তাঁর গল্পের আবহ নির্মাণ করে, আর সেই আবহই শেষ পর্যন্ত মুখ্য হয়ে ওঠে। অপরের শোকে শোকার্ত মানুষের শোকের মূলে থাকে সাধারণত নিজের জন্য শোক। 'শোক' গল্পে একটি মৃত্যু

সংবাদকে কেন্দ্র করে জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীতা এক বৃদ্ধার হৃদয়ানুভূতিই মুখ্য হয়ে উঠেছে। গল্পটি মৃত্যুর পদপ্রান্তে বসে এক বৃদ্ধার জীবনের তীক্ষ্ণ ও গভীর পর্যালোচনা। 'কানাকড়ি' গল্পে সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হয়েছে মানুষের অধোগমনের চিত্র। অর্থনৈতিক অসাম্য কী করে মধ্যবিত্তের নীতি-নৈতিকতার বোধকে অকার্যকর করে দেয় তারই মর্মস্পর্শী আখ্যান এই গল্পটি। অবক্ষয়িত জীবনের বিবেচনায় গল্পটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

সন্তোষকুমার ঘোষের 'কানাকড়ি' গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবক্ষয়িত সমাজে ব্যক্তির স্খলন এবং অর্থনৈতিক অসাম্যের ফলে উদ্ভূত পরিবর্তিত জীবনব্যবস্থা স্থান পেয়েছে। গল্পের চরিত্র সাবিত্রী নিজের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে থেকেছে, কিন্তু সময়ের করাল গ্রাস তার সেই বিশ্বাসে ভাঙন ধরিয়েছে। সাবিত্রী অশুভ সময়ের প্রেক্ষাপটে উপায়হীন মধ্যবিত্ত নারীর প্রতীক। 'দুই প্রস্থ' গল্পে অনিকেত, নিরাশ্রয় নারীর সংগ্রামের পাশাপাশি নারীহৃদয়ের অসূয়ার চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে জীবন সংগ্রামের চেয়ে উৎকট হয়ে ধরা পড়েছে ঈর্ষার প্রাবল্য। আবার চাকচিক্যের আড়ালে সমাজের ভঙ্গুরতাকে ঢেকে রাখার গল্প 'চীনেমাটি'।

১৯৫৮ সালের পরে লেখা গল্পগুলোতে সন্তোষকুমার ঘোষ ক্রমে ব্যক্তির অন্তর্জগৎ সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হয়েছেন। যদিও সেখানেও মানুষের সম্পর্কের সংঘাতের চিত্র আছে, মনোবিকলন আছে, কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ব্যক্তির অন্তশ্চৈতন্যের উপর আলোকসম্পাত করা হয়েছে তাঁর এই পর্বের গল্পে।

সন্তোষকুমার ঘোষ বিষয়বস্তু নির্বাচনে মননধর্মী, আঙ্গিক নির্মাণে কুশলী। তাঁর ভাষা স্বনির্বাচিত, ঋজু ও বুদ্ধিদীপ্ত। প্রথমদিকে তিনি সাধুরীতির গদ্যে গল্প লিখেছেন; যেমন, 'বিলাতী ডাক' (১৯৩৭), 'শীত-বসন্ত', 'ক্ষণনীড়', 'দক্ষিণের বারান্দা' প্রভৃতি। যদিও তার বহু আগেই বাংলা কথাসাহিত্যে চলিত গদ্যের চর্চা প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তিনি সাধুরীতির গদ্য থেকে সরে এসে চলিত গদ্য ব্যবহারেও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'তাঁর প্রসাধিত তীক্ষ্ণ ভাষা বিশেষভাবে একালের ভাষা। এর সঙ্গে ১৯৪০-পূর্ববর্তী বাংলা ছোটগল্পের ভাষার যোগ নেই' (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৩৯০)।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে ভাষা ও আঙ্গিকে নানা অমিল থাকলেও বিষয় ও ভাবনার বৈচিত্র্যে দুজনের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্তোষকুমার ঘোষ উভয়ের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের বিপর্যস্ত রূপটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দুজনই গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরে পদার্পণ করলেও তাঁদের উভয়ের রচনাই নাগরিক অনুষঙ্গ-প্রধান। তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কালসচেতনতা সন্তোষকুমার ঘোষের মতো প্রত্যক্ষগোচর নয়। জ্যোতিরিন্দ্র সময়ের চাপকে যুক্ত করে দেন ব্যক্তিমানুষের প্রবৃত্তি-চালিত অন্তর্লোকের সঙ্গে। তাঁর স্বকীয় বর্ণনাভঙ্গি বহির্বাস্তবের সমস্যাকে অতিক্রম করে মানুষের অন্তর্লীন সংকটকে মূর্ত করে তোলে।

জ্যোতিরিন্দ্রের সমকালীন আরেকজন শক্তিমান লেখক বিমল কর (১৯২১–২০০৩), বাংলা ছোটগল্পের কাঠামো পরিবর্তনে যাঁর প্রত্যক্ষ অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পঞ্চাশের শেষ ও ষাটের শুরুতে বাংলা ছোটগল্পের জগতে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়। *ছোটগল্প : নতুন রীতি* নামের একটি পত্রিকা ছিল এই আন্দোলনের মুখপত্র। সাহিত্যিক হিসেবে বিমল করের আত্মপ্রকাশ এরও কিছুকাল পূর্বে, ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে, 'অম্বিকানাথের মুক্তি' গল্পের মাধ্যমে। শুরু থেকেই বিমল কর খুব সচেতনভাবেই সাহিত্যে তাঁর স্বকীয় পরিচয় নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাটি স্বল্পায়ু হলেও এর মাধ্যমেই তিনি সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর সরব ও ব্যতিক্রমী উপস্থিতির জানান দিয়েছিলেন। এই পত্রিকার মূল তত্ত্ব ছিল তত্ত্বহীনতা। তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী, "ছোটগল্পের তাত্ত্বিক কোনো ধারণায় আমরা বিশ্বাসী নই। 'ছোট' কথাটারও কোনো অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা অক্ষম। কোনো ধরনের লেখা সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে না" (বিমল কর ২০০৯ : ২২)।

বিমল করের প্রযত্নে প্রকাশিত পত্রিকাটি বাংলা ছোটগল্পের জগতে বিরাট পালাবদল এনেছে। তাঁর গল্পে পাওয়া যায় আত্মজৈবনিক সুর ও স্বীকারোক্তির আভাস। চেতনামগ্ন ভাবপ্রবাহে বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয় সমাজ ও বাস্তবের খণ্ডিত দৃশ্যাবলি। মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের সূত্র-সম্বন্ধের চিন্তা ও স্বপ্নের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ, নিঃসঙ্গজীবনের বেদনাবোধ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতীকী উপস্থাপন বিমল করের গল্পকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত করেছে। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সূত্রে তিনি তাঁর গল্পে স্থান দেন একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যকে। সমকালীন জীবনের অস্থিরতা, মানব-মনের জটিল ও রহস্যময় অধ্যায়, মনোজগতের দ্বান্দ্বিকতা তাঁর গল্পের প্রেরণা হিসেবে উপস্থিত। নিঃসঙ্গতা তাঁর গল্পের প্রধান এক অনুষঙ্গ। ছোটগল্প যে মনস্বী লেখকের আত্মপ্রকাশের প্রকৃষ্ট বাহন, বিমল করের গল্প তা মনে করিয়ে দেয়।

মৃত্যুভাবনা বিমল করের গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। 'অম্বিকানাথের মুক্তি', 'আঙুরলতা' (১৯৫৬), 'নিষাদ' (১৯৫৮) প্রভৃতি গল্পে এর প্রকাশ লক্ষণীয়। 'আঙুরলতা' গল্পে মৃত্যু এসেছে দার্শনিক অভিঘাত নিয়ে। 'নিষাদ' শিরোনামের গল্পটি মৃত্যুর মাধ্যমে নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের ইঙ্গিতময় প্রকাশ। প্রতীকধর্মী গল্প 'মানবপুত্র' পরিবেশ রচনায় তাঁর আশ্চর্য কৃতিত্বের নিদর্শন। 'সুধাময়' গল্পে সাধারণ মানুষের কাছে পরম প্রার্থিত জীবন, যা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুধাময়ের কাছে বিরাট এক শূন্যতা, সেই শূন্যতার শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে। মানুষের সীমাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও তা চরিতার্থ করার সীমিত সামর্থ্যের প্রতীকী চিত্রায়ণ রয়েছে 'সোপান' গল্পে।

বিমল করের কোনো কোনো গল্পে রয়েছে প্রতীকী দ্যোতনা। জাদুকরি গদ্য, গল্পের গতিশীলতা, 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'-এর ব্যঞ্জনা তেমন একটা প্রাধান্য পায়নি তাঁর গল্পে। বরং মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ নির্মোহ জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি গল্পের পাথেয় করে তুলেছিলেন। তাঁর 'মানবপুত্র', 'নিষাদ', 'বরফ

সাহেবের মেয়ে', 'সোপান' প্রভৃতি গল্পে প্রতীকী অনুষঙ্গের ব্যবহার ও প্রতীকধর্মিতা বারবার ফিরে এসেছে। মানব মনস্তত্ত্বের সমস্ত আলো-অন্ধকার তাঁর গল্পে মায়াময় পরিবেশ রচনা করেছে।

বিমল করের গল্পে মনের গভীরে ডুব দেওয়ার সক্ষম প্রয়াস যেমন আছে, তেমনি মানুষের মনের এক-একটি রূপকে ধীরস্থির গতির মধ্যে হঠাৎ কোনো এক শিল্প-আধ্যাত্মিকতার আলোয় চকিত করে তোলার প্রয়াস আছে। তাঁর গল্পের ভাষার গতি ধীরস্থির, একটু রহস্যময় শীতলতা, বিষণ্নতাকে সর্বাগ্রে জড়িয়ে তাঁর গদ্যভঙ্গি ও ভাষার চলমানতা রূপ পায় (বীরেন্দ্র দত্ত ২০১৮ : ৪০৩)।

বিমল করের গল্প কোনো বিশেষ রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ছোটগল্পের প্রথাসিদ্ধ শিল্পরূপকে অস্বীকার করতে গিয়ে তিনি নিজের সামর্থ্য ও প্রবণতা অনুযায়ী গল্পের আঙ্গিকে ভিন্নতা আনতে চেয়েছেন। প্রতিদিনের চেনা ও গণ্ডিবদ্ধ জীবন থেকে তিনি তুলে এনেছেন এমন সব বিক্ষিপ্ত ঘটনা, যেখানে মানুষের অসংকোচ বেঁচে থাকা প্রাধান্য পেয়েছে। মনঃসমীক্ষণের মাধ্যমে জীবনসত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে তাঁর গল্পে।

ব্যক্তি ও পরিবারের অন্তর্ভেদী রূপ, বিকার ও মানব-মনের বহুধাবিভক্তির অনুসন্ধান এবং প্রেমপ্রবাহের অন্তর্নিহিত স্বভাবের আলোকে বলা যায়, বিমল কর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছুটা অনুগামী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রের মতোই তিনিও অন্তর্মুখী লেখক এবং জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের চরিত্রদের মতোই তাঁর গল্পের চরিত্ররা ব্যক্তিগত আত্মিক সমস্যা ও আত্মিক জিজ্ঞাসায় আক্রান্ত। কল্পনার মধ্য দিয়ে তারা যে জীবন গড়তে চায়, তা বাস্তবায়িত না হলে গল্পের পরিবেশে নেমে আসে অবসাদ, বৈক্লব্য ও বিষণ্নতা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, *ছোটগল্প : নতুন রীতি* পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয়েছিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুঃস্বপ্ন' গল্পটি। প্রচলিত গল্পপাঠে অভ্যস্ত জনৈক পাঠক গল্পটির কড়া সমালোচনা করলে বিমল কর তার একটি আক্রমণাত্মক জবাব দিয়েছিলেন।

রমাপদ চৌধুরী (১৯২২-২০১৮) জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমসাময়িক কথাশিল্পীদের মধ্যে আরেকজন উল্লেখযোগ্য গল্পকার। আঙ্গিকের নতুনত্ব, বিষয়বৈচিত্র্য ও ভাবনার ভাঙাগড়ায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন একটি নিজস্ব কথনরীতি, যার নাম দিয়েছিলেন 'মিশ্রতরঙ্গ রীতি' (রমাপদ চৌধুরী ২০১৮ : ৮)। তাঁর বেড়ে ওঠা মেদিনীপুরের খড়গপুরে, তবে পিতার রেল কোম্পানিতে চাকরির সুবাদে ভারতবর্ষের নানা জায়গার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে উত্তর কলকাতায় এসে স্থিত হন। এর ফলস্বরূপ নগর ও প্রান্তিক উভয় স্থানের মানুষের জীবনপ্রবাহের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নানাভাবে তরঙ্গায়িত হয়েছে তাঁর গল্প। আদিবাসী জীবন ও উত্তর কলকাতার নাগরিক জীবন – ভিন্ন দুই ভৌগোলিক পরিসরের জীবনযাত্রার উপস্থাপন তাঁর গল্পকে দিয়েছে বিশিষ্টতা। এর সঙ্গে সংশ্লেষ ঘটেছে তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার। রাঁচী-পালামৌ-হাজারিবাগ-

ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ অঞ্চলের আদিবাসী জীবন প্রথমদিকে তাঁকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছে। অন্যদিকে খড়গপুর ছিল একটি স্বতন্ত্র রেলনগরী যেখানে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মানুষের আগমন ঘটত। তাই অল্পবয়স থেকেই বিচিত্র ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

রেলস্টেশনের জীবন রমাপদ চৌধুরীর গল্পে ঘুরেফিরে এসেছে। 'ভারতবর্ষ' (১৯৬৮), 'উদয়াস্ত' (১৯৪৩), 'সহযোগ' প্রভৃতি গল্পে রেল সংস্কৃতি ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। তৎকালীন সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুবিস্তৃত রেল যোগাযোগ গড়ে ওঠায় রেলপথকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনেও গতির সঞ্চার হয়েছিল। এই পথ ধরে ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র যেমন অবারিত হয়েছে, তেমনি বিস্তৃতি লাভ করেছে বিপ্লবী তৎপরতাও। রেললাইন ভারতবর্ষের জীবনধারার খোলনলচে বদলে দিয়েছিল – যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় রমাপদ চৌধুরীর 'দরবারী' গল্পে। লাপেরা অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন এবং ইংরেজ পাদরিদের ধর্মবিস্তারের উৎকট রূপ এই গল্পে চিত্রিত হয়েছে। পরবর্তীকালে তাঁর 'মহুয়ামিলন', 'ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি গল্পে রেলস্টেশনের অনুষঙ্গে বিবৃত হয়েছে আদিবাসী জীবন-নির্ভর আখ্যান। তাঁর বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' গল্পটিও রেলস্টেশনকে কেন্দ্র করে মাহাতোদের বদলে যাওয়ার কাহিনি। সাহেবদের ছুড়ে দেওয়া পয়সার জন্য মাহাতোদের পুরো গ্রামের ভিখিরিতে পরিণত হওয়ার গল্প 'ভারতবর্ষ'। অভাব ও লোভের বশবর্তী হয়ে পুরো গ্রামের সঙ্গে গ্রামের নির্লোভ, নির্মোহ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক শেষ মানুষটিরও পরাভবের মর্মভেদী আখ্যান এই গল্পটি।

রমাপদ চৌধুরীর গল্পের গদ্য ও আঙ্গিকগত নিরীক্ষার দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকে তিনি ভাষার চাকচিক্যে আগ্রহী ছিলেন, পরবর্তীকালে সযত্ন পরিচর্যায় তাঁর ভাষা হয়ে উঠেছে আতিশয্যমুক্ত। 'উদয়াস্ত' থেকে 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' গল্পের পরম্পরায় এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁর গল্পের মর্মমূলে রয়েছে ইতিহাসচেতনা। লোকজীবনের অন্তর্লীন এক ইতিহাসবোধ প্রচ্ছন্নভাবে ক্রিয়াশীল থাকে তাঁর গল্পে। লোকসমাজে প্রচলিত উপাখ্যান ও স্থানীয় কিংবদন্তির মিথ হয়ে ওঠাকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তাঁর কয়েকটি আদিবাসী জীবন-নির্ভর গল্প। যেমন, 'দরবারী' গল্পটির চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক, কিন্তু এর ঐতিহাসিক পটভূমি ও সম্ভাব্যতাকেও অস্বীকার করা যায় না। জোনাথন ম্যাকক্লাস্কি ও মুণ্ডা মেয়ে শোনিয়ার বিয়োগান্ত প্রেমকাহিনি যিশুর গরিমা প্রচারক ক্রুসেডারদের নির্মম অভিযানকে অতিক্রম করে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে যায় দুটি বিরুদ্ধ সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব-মিলনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক দলিল। 'রেবেকা সোরেনের কবর' গল্পটিতেও দেখা যায় সাঁওতাল মেয়ে রূপমতি আর ম্যাকু সাহেবের ব্যর্থ প্রেমকাহিনি থেকে গড়ে উঠেছে আরেক লোক-পরম্পরা। রূপমতির ভ্রান্ত খ্রিষ্টান পরিচয় ও শিকড়হীন অস্তিত্ব তার নিজস্ব লোকজীবনের

সান্নিধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তার কবর পরিণত হয় গ্রাম্য পীঠস্থানে। রূপমতির কবরকে ঘিরে পরবর্তীকালে গ্রামে লোকউৎসব পালিত হয়।

রমাপদ চৌধুরীর এই ইতিহাসবোধের পরিচয় তাঁর উত্তরকালের নগরকেন্দ্রিক গল্পগুলিতেও পাওয়া যায়। 'গত যুদ্ধের ইতিহাস' গল্পে নামহীন এক মেয়েকে আশ্রয় করে ১৯৪০ থেকে ১৯৫০, এই দশ বছরের কলকাতা শহরের চালচিত্রকে তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর উত্তর কলকাতার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পগুলোতে ফুটে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী মধ্যবিত্ত জীবনের তুঙ্গস্পর্শী নানা অভিঘাত। তৎকালীন নাগরিক মধ্যবিত্তের বিপর্যস্ত জীবন, অন্তহীন সমস্যা ও ক্রমাগত বদলে যাওয়ার ট্র্যাজেডিই তাঁর এই পর্বের গল্পের বিষয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের চরিত্রদের মতোই রমাপদ চৌধুরীর এই পর্বভুক্ত গল্পের চরিত্ররাও প্রতিবাদী নয়। তারা নিরুপায়ভাবে সময়ের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়। এদিক থেকে রমাপদের গল্পের মধ্যবিত্তরা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মধ্যবিত্তের সমগোত্রীয়। দুজনের গল্পেই সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের আত্মগ্লানি, আত্মসংকট ও আত্মপ্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। কাঠের আলমারির সঙ্গে সযত্নে লালিত এতদিনের মূল্যবোধকেও এক পর্যায়ে বিসর্জন দিতে হয়। মধ্যবিত্তের এই বিবর্তনের গল্প রমাপদ চৌধুরীর 'আলমারিটা'।

বিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের সামাজিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজচর্যার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যৌনতার প্রসঙ্গও ঘুরেফিরে এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, বিশ্বায়ন ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ মধ্যবিত্তের প্রাত্যহিকতাকে যেমন নবরূপ দিয়েছে, তেমনি ভিন্নতা দান করেছে মধ্যবিত্তের যৌনতাকে। তবে বাংলা ছোটগল্পে পরিবর্তনশীল সমাজ ও জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যৌনচেতনার বিবর্তন রমাপদ চৌধুরীর গল্পে স্থান পায়নি। তাঁর গল্পে যৌনতা আছে, তবে তা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মতো উচ্চকিত নয়, নীরব এবং অস্পষ্ট। অপরদিকে জ্যোতিরিন্দ্র যৌনতাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করে গল্পে স্থান দিয়েছেন।

বিষয়বস্তুর বিচারে এই দুই লেখকের মধ্যে কিছু সাযুজ্য থাকলেও, জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে জীবন ও অনুভূতির যে তাৎক্ষণিক চিত্রাভাস পাওয়া যায় তা রমাপদ চৌধুরীর গল্পে অনুপস্থিত। গ্রাম, শহর, শহরতলি, আঞ্চলিকতা থেকে শুরু করে নাগরিক জীবনযাপন – সকল পরিসরে অবাধ বিচরণ থাকায় ভুয়োদর্শী জীবনের ছাপ ফুটে উঠেছে রমাপদ চৌধুরীর গল্পে। সেইসঙ্গে মানুষের জটিল মানসিকতার সংহত, সংযত, পরিশীলিত উন্মোচনরীতি তাঁর গল্পকে সুখপাঠ্য করে তুলেছে। এর বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের চারণক্ষেত্র সীমিত। তিনি কলকাতার পরিবর্তনশীল মধ্যবিত্তদের নিয়ে যেসব গল্প লিখেছেন সেখানে কাহিনির তেমন বিস্তার নেই, তার পরিবর্তে স্থান পেয়েছে চরিত্রদের মনস্তাত্ত্বিক জগতের অনুপুঙ্খ। তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন নিয়ে লেখেননি। যৌথ-চেতনা তাঁর গল্পে অনুপস্থিত।

বাংলা কথাসাহিত্যে সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) আত্মপ্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও বিচিত্রমুখী জীবন-অভিজ্ঞতার জটিল পথ ধরে। বাংলা গল্পের অঙ্গনে তাঁর আবির্ভাবের কিছুকাল পূর্ব থেকেই এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। বিষয় নির্বাচনের স্বাতন্ত্র্যের নিরিখে সমরেশ বসুকে তাঁদের থেকে আলাদা করা যায়।

১৯৪৬ সালে শারদীয় *পরিচয়*-এ প্রকাশিত 'আদাব' গল্পটি সমরেশ বসুকে গল্পকার হিসেবে পরিচিতি এনে দেয়। তাঁর শৈশব কেটেছে পূর্ব বাংলার বিক্রমপুরে এবং কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে কলকাতার উপকণ্ঠে নৈহাটিতে। পরবর্তীকালে তাঁর জীবন সংগ্রাম, বিচিত্র পেশা ও সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং তারই ফলস্বরূপ হাজতবাসের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা বিস্তৃতি লাভ করে। যা তাঁকে জুগিয়েছে কথাসাহিত্য রচনার পর্যাপ্ত রসদ। সংবেদনশীলতা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সমরেশ বসু কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই রাজনৈতিক আদর্শ তাঁর বিভিন্ন গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যজীবনের শুরুতেই তিনি লাভ করেছেন সমাজের নিচুতলার মানুষের সান্নিধ্য এবং সাম্যবাদী মতাদর্শের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। তাঁর গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের অপরাজেয় সত্তার আখ্যান, সমূহ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে জীবনের বলিষ্ঠ প্রত্যয়। তাঁর অনেক গল্পেই বৈচিত্র্যময় জীবনের বিচিত্র সংগ্রামের কথা বিবৃত হয়েছে।

পরবর্তীকালে পার্টির সঙ্গে সমরেশ বসুর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হলেও সাহিত্যজীবনের প্রারম্ভেই তিনি যে জীবনবোধে দীক্ষিত হয়েছিলেন তা থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর গল্পের রাজনৈতিক চেতনার মূলে রয়েছে সমকালের নানা ঘাত-প্রতিঘাত। কালসচেতনতা সমরেশের গল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক সচেতনতা ও কালচেতনাই তাঁর 'কিমলিস' গল্পটির ভিত্তিস্বরূপ। 'আদাব', 'জলসা', 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি গল্পে সর্বহারাদের জীবন সংগ্রামকে আশ্রয় করে তাঁর মানবিকতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে। 'জলসা' গল্পে শ্রমিক-ভাবনা ও 'প্রতিরোধ' গল্পে কৃষক আন্দোলনের রূপায়ণ সমরেশ বসুর লেখকসত্তার এই বিশেষ দিকটির পরিচয় বহন করছে। 'মনন অপেক্ষা অভিজ্ঞতা, বিশ্লেষণ অপেক্ষা আবেগনির্ভরতা, সহমর্মিতা অপেক্ষা দুঃখবেদনার শরিকানা সমরেশ বসুর ছোট গল্পের স্বকীয়তা দিয়েছে' (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০১৬ : ৩৯২)।

সমরেশ বসুর গল্পের বিষয়বস্তু বিচিত্র – গ্রামবাংলার লোকায়ত জীবন থেকে শুরু করে, খুনি, চোর, পকেটমার বা তথাকথিত ঘৃণ্য মানুষদের জীবন ও তাদের স্বপ্নের কথাও স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। প্রগাঢ় মানবিক আবেগ ও সহানুভূতি নিয়ে তিনি গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন। তাঁর গল্পে সম্পর্কের গভীর অন্বয়ের মাধ্যমে সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে। বিয়োগান্ত জীবনের অভিজ্ঞতা

আর্থসামাজিক বাস্তবতায় যাদের জীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে সমরেশ বসু তাঁর গল্পে সেইসব মানুষকে স্থান দিয়েছেন। ‘পসারিণী’ গল্পে বড় হয়ে উঠেছে ছিন্নমূল মানুষের জীবন সংগ্রাম। একটি অনন্যোপায় মেয়ের মফস্বল শহরের ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের হকার হয়ে ওঠা এবং সেই পেশায় তার নানামুখী প্রতিবন্ধকতার মানবিক আখ্যান এই গল্প। সমরেশ বসু আত্মবীক্ষণের আলোয় রাজনীতির অন্তর্গূঢ় পাঠ নিয়েছেন তাঁর হাজতবাসের (১৯৪৯-১৯৫০) সময়ে। পারিপার্শ্বিক মানুষকে চেনা ও সেই আলোয় বৃহত্তর জীবনকে দেখা – আত্মপরিচয়ের এই অনুসন্ধান তাঁর গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয়। বস্তিজীবন, চটকলের শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম এবং নৈহাটি-হালিশহর-জগদ্দলের জীবনযাত্রা তাঁর গল্পে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষের টিকে থাকার এই লড়াইকে প্রকটিত করতে তিনি গ্রহণ করেছেন কখনো গদ্যের প্রত্যক্ষ ভঙ্গি, কখনো ভাবের কাব্যিক স্পর্শ, আবার কখনো ব্যঙ্গাত্মক তির্যক কথনরীতি।

শ্রমিক জীবনের সংগ্রাম ও আন্দোলন নিয়ে রচিত সমরেশ বসুর ‘কিলমিস’ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের কুটিল বিন্যাসে শিল্পাঞ্চলের জীবনধারা-কেন্দ্রিক একটি আখ্যান। ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিখ্যাত ‘আদাব’ গল্পে দেখা যায় কারফিউ ও ১৪৪ ধারার মধ্যে আটকে পড়েছে ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন পেশার অপরিচিত দুই শ্রমিক। দাঙ্গার ফলে উদ্ভূত সংকট ও দুর্ভোগের কারণে তারা একে অন্যের সহযাত্রী, আর তাই নিজেদের ধর্মীয় পরিচয় জানার আগেই তাদের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক পর্যায়ে নিজেদের সম্প্রদায়গত পরিচয় প্রকাশিত হলেও তাদের সৌহার্দ্য অটুট থাকে, তারা একে অন্যের সমব্যথী হয়। বিদায়কালে তারা একে অন্যকে আদাব জানায়। এই গল্পে মানুষকে উপস্থাপন করা হয়েছে এক বলিষ্ঠ ভূমিকায়। সাম্প্রদায়িক সহিংসতার মূলে যেমন আছে মানুষ, তেমনি নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও মানুষই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তাই সবার উপরে স্থান পায় মানবধর্ম।

সমরেশ বসু সংবেদনশীল লেখক, গল্পের চরিত্রদের সঙ্গে একাত্মতায় বিশ্বাসী। তাঁর গল্পে কখনো চরিত্রের আবেগঘন বর্ণনা, আবার কখনো নিরাসক্ত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা এক বিশেষ দ্যোতনার সঞ্চার করে পাঠক-হৃদয়কে আন্দোলিত করে।

রাজনীতি সচেতনতার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে সমরেশ বসুর স্পষ্ট পার্থক্য থাকায় বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিকেও দুই লেখকের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সমরেশ বসুর সোচ্চার কণ্ঠের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্রের অনুচ্চ উচ্চারণ দুজনের ভাষাভঙ্গিকেও পৃথক করে দিয়েছে। তাছাড়া সমরেশ বসু জীবনঘনিষ্ঠ ও আবেগসমৃদ্ধ গদ্যভাষার জালে পাঠককে আকর্ষণ করেন, যে ভঙ্গিটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

স্বভাববিরুদ্ধ। নির্মোহ ও নিরাবেগ থেকে চরিত্রদের গল্পের পাকে ফেলে দেওয়া জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যচর্চার সমসাময়িক কালে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে আরো অনেক শক্তিমান গল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র (১৯০৮-১৯৯৪), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৩০-২০১৯), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ (১৯৩০-২০১২), মতি নন্দী (১৯৩১-২০১০), সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩-২০০৫), প্রফুল্ল রায় (জ. ১৯৩৪), দেবেশ রায় (১৯৩৫-২০২০) প্রমুখ গল্পকার তাঁদের স্ব স্ব রচনাশৈলী ও বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে খ্যাতিমান হয়েছেন। তাঁদের কারো কারো সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প-ভাবনা, ভাষা, আঙ্গিক ও চিন্তার অল্পবিস্তর সাযুজ্য রয়েছে, আবার কারো অবস্থান জ্যোতিরিন্দ্রের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে। তাঁর সমসাময়িক কালে সক্রিয় এ সকল লেখকের সম্মিলিত প্রয়াস ও অবদানে বাংলা গল্প বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহিত্যাঙ্গনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদের অর্জন প্রশংসনীয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সমকালীন সাহিত্য দ্বারা ততটা উজ্জীবিত হননি, যতটা আন্দোলিত হয়েছেন তাঁর সমকাল দ্বারা। তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্বটি অবিভক্ত বাংলার ইতিহাসের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি ঘটনার অভিঘাতে বিপর্যস্ত মানুষের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ব্যবচ্ছেদ তাঁকে মধ্যবিত্ত মানসের গল্পকার হিসেবে প্রসিদ্ধি এনে দিয়েছে। তাঁর সাহিত্যে তিনি সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহকে বাস্তবতার সমান্তরালে তথ্যনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেননি; তবে ওই কাল-পরিসরের মানুষের জীবনের নানা সংকট ও চেতন-অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকে তিনি তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন।

কেবল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নন, তাঁর সময়ের প্রায় সব প্রথিতযশা কথাশিল্পীই তাঁদের সমকালকে নিজেদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্মে নানাভাবে উপস্থাপন করেছেন। উত্থানপতনবন্ধুর ওই সময়কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজস্ব ভাবনা ও আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন সবাই মিলে। যেন অসংখ্য দক্ষ শিল্পী একত্রিত হয়ে একটি বৃহদাকার শিল্পকর্ম নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর সাযুজ্য থাকলেও এসব লেখকের রচনার আঙ্গিক ও সমাজ-বিশ্লেষণ পরস্পর থেকে আলাদা। সময়চেতনা ও মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা অনেকের গল্পেই উঠে এসেছে বটে; তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যে মূল বৈশিষ্ট্য, চরিত্রের জটিলতর মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াবিক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ঘনতা, তা আর কারো লেখায় সমভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

সেই সময়ের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে অমিল থাকলেও একটি ক্ষেত্রে সাযুজ্য রয়েছে। পাঠকপ্রিয়তা লাভের স্বাভাবিক আগ্রহ সত্ত্বেও তাঁদের কেউ শুধুমাত্র পাঠকের মনোরঞ্জনের

জন্য গল্প লেখেননি। জনপ্রিয়তা অর্জনের চেয়ে তাঁরা সৃষ্টির গভীরতাকে আরো ব্যঞ্জনাময় করে তোলার ব্যাপারে প্রয়াসী ছিলেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর জীবদ্দশায় পাঠকপ্রিয়তা পাননি সেভাবে। জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হলেও নিজের সৃষ্টি নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না। তিনি জানতেন, যে ধরনের গল্প লিখে তিনি তৃপ্তি পান, সেই ধরনের গল্প সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে না। তা সত্ত্বেও নিজের আঙ্গিক ও ভাষাভঙ্গিকে তিনি বিসর্জন দেননি। পর্যাপ্ত স্বীকৃতির অভাব নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন :

> মনে হয় খুব বেশিদিন আমি সাহিত্যচর্চা করছি না। পূর্বসূরিদের সাহিত্যে যথাযথ তৃপ্তি আমি পাইনি, যেন আরো কি দেবার রয়ে গেছে। তা দিতে হবে আমাদের, তাই আমার সাহিত্য মঞ্চে প্রবেশ। তারপর তো কত বছর কেটে গেল। যতটা ক্ষমতা ছিল সেই অনুযায়ী স্বীকৃতি বোধহয় আজো পাইনি। তাতে অবশ্য আমার কোনো আপশোস নেই। যা দিয়ে গেছি বাংলা সাহিত্যে বেশ কিছুকাল তার স্থান অক্ষুণ্ন থাকবে, এতেই আমার সান্ত্বনা। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২৭০)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমকালে অনেক সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতির তুঙ্গ স্পর্শ করলেও তিনি হয়তো উপরিউক্ত সান্ত্বনার কথা ভেবেই নিজেকে প্রবোধ দিয়েছেন। শেষ জীবনে আনন্দ পুরস্কারে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিও পেয়েছেন। তবে লেখক হিসেবে স্বধর্ম থেকে তিনি কখনোই বিচ্যুত হননি।

সহায়কপঞ্জি

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০), 'উরুণ্ডী', *শ্রেষ্ঠ গল্প*, ৩য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০১৬), 'গল্পে যৌবনের স্বপ্নযন্ত্রণা বিদ্রোহ : কল্লোল-গোষ্ঠী', *কালের পুত্তলিকা: বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৬), 'সমরকালীন লেখকদের ছোটগল্প', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৬), 'প্রবাসী-ভারতবর্ষ-বিচিত্রা-শনি চিঠি-গোষ্ঠী', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৬), 'স্বাধীনতার পরে ছোটগল্প', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অলোক রায় (১৯৬৭), *সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য*, সম্পাদনা : অলোক রায়, সাহিত্যলোক, কলকাতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (১৩৮৬ ব.), 'ভূমিকা', *আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯৫৩), 'ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৪১৬ ব.), 'আমার সাহিত্যজীবন আমার উপন্যাস', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪৩, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (১৪১৬ ব.), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সঙ্গে ধীমান দাশগুপ্তের সাক্ষাৎকার', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪, সংখ্যা ৪৩, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'মঙ্গলগ্রহ', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

দেবেশ রায় (২০১৮), 'অভিনব ব্রতকথা', *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

নবনীতা দেব সেন (১৯৮১), 'পিঞ্জরে বসিয়া পাঠক এবং অথবা সিদ্ধতান্ত্রিকের শব্দসাধনা', *চতুরঙ্গ*, মাঘ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (২০১৮), 'ছোটগল্পের সংজ্ঞা', *সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প বিচিত্রা*, কবি, ঢাকা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (২০০১), 'শুধু কেরানী', *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : সৌরীন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বিমল কর (২০০৯), 'ছোটগল্পের কথা', *গল্প পড়ার মহড়া*, সম্পাদনা : শম্পা চৌধুরী, রত্নাবলী, কলকাতা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৭), 'ভূমিকা', *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা

বীরেন্দ্র দত্ত (২০১৮), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *বাংলা ছোট গল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ২য় খণ্ড*, ৮ম সংস্করণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (২০০০), 'বাংলা ছোট গল্প : চালচিত্র', *ছোটগল্পের কথা*, ভূদেব চৌধুরী, ৩য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

– (২০১৬), 'কল্লোল-গোষ্ঠী', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৮), 'দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প', *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, ভূদেব চৌধুরী, ৫ম প্রকাশ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

– (২০০৯), 'ছোটগল্পের কথা', *গল্প পড়ার মহড়া*, সম্পাদনা : শম্পা চৌধুরী, রত্নাবলী, কলকাতা

ভূদেব চৌধুরী (২০০০), 'বাংলা ছোটগল্প : চালচিত্র', *ছোটগল্পের কথা*, ৩য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

– (২০১৮), 'দ্বিতীয় পর্বের বাংলা গল্প', *বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার*, ৫ম প্রকাশ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

রমাপদ চৌধুরী (২০১৮), 'উপক্রমণিকা', *গল্পের ভুবন : রমাপদ চৌধুরী*, নীহার শুভ্র অধিকারী, পুনশ্চ, কলকাতা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮), *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৮), 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তার স্বরূপ', *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

চতুর্থ অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ

বিচিত্র মানব-মন বৈপরীত্যের সমাহারে নিয়ত দ্বন্দ্বময়। মনের অবচেতন স্তরকে মানুষ পুরোপুরি জানতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। নিজের মৌল প্রবৃত্তিগুলোকে সহজে চিহ্নিত করে তার উপর সতর্ক নজরদারি করতে পারলেও অবচেতনে যে নিত্যনতুন ভাবনারাজি সঞ্চিত হয় তার সন্ধান পাওয়া তার পক্ষে দুঃসাধ্য। পরিবার, পরিবেশ, সমাজ, সংস্কার, শিক্ষা, আচার ইত্যাকার বিধি-বিধান দিয়ে সচেতন ও অবচেতন মনের ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিজেকে সামাজিক করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হলেও, চেতন বা অবচেতন মনের উদ্ধত আকাঙ্ক্ষাকে পরিশীলিত রূপ দেওয়া কখনো কখনো দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ ব্যক্তিমন বিপথগামী হওয়ার সকল আয়োজন নিজের অবচেতনেই সম্পন্ন করে রাখে। এই বিপথগামিতার প্রকাশভঙ্গিও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরকম হয়। বেপরোয়া কেউ প্রকাশ্যেই মনের ক্লেদকে চরিত্রের ভূষণ বানিয়ে তোলে; আবার কেউ গভীর গোপনে লালন করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সেই অতল অমানিশা থেকেও কখনো কখনো জ্বলে ওঠে আলো। বৈচিত্র্যের অপরিচিত দ্যুতি ঠিকরে বের হয় অন্ধকারের তলকুঠুরি থেকে, তাকে আরো আলোকোজ্জ্বল করে তোলে। তবে তা বিরল ব্যতিক্রম।

চেতনার অন্তর্মহলের গ্রন্থিমোচন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মনস্তত্ত্ব-প্রধান গল্পকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গল্পের চরিত্রদের দিয়েই তাদের অন্তর্লোকের সন্ধান করান তিনি। পরিপার্শ্ব থেকেই তিনি গল্পের চরিত্রদের তুলে আনেন, তারপর নিজস্ব চেতনালোকের শৈল্পিক সত্তার মিথস্ক্রিয়ায় তাদের বিশেষায়িত করে গল্পে উপস্থাপন করেন। যুদ্ধ-দেশভাগ-দাঙ্গা-মন্বন্তরপীড়িত বাঙালি মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও অস্তিত্বের সংকট, তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মসম্মানবোধ, সংকীর্ণতা ও পলায়নপরায়ণতা, বিবেক ও বিবেকহীনতা, নর-নারী সম্পর্কের জটিল রসায়ন, প্রেম-প্রেমহীনতার অনুরাগ-বীতরাগ, যৌনতার বিচিত্র প্রকাশ, নারীর রহস্যজটিল মনোজগৎ, বয়ঃসন্ধিকালীন নবচেতনা, অস্থিরতা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত, প্রকৃতি-নিমগ্ন সত্তার বৈচিত্র্যময় উদ্ভাসন প্রভৃতির অনুসন্ধানে সূক্ষ্ম ও বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রের মানস উন্মোচনে বহুতল প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করেছেন নিরন্তর। সমকালীন প্রেক্ষাপটে সমকালের কথা উচ্চ-নিনাদে প্রকটিত না করে, সময়ের চাপকে তিনি যুক্ত করে দেন ব্যক্তিমানুষের প্রবৃত্তিচালিত অন্তর্লোকের সঙ্গে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর ছোটগল্পে মানুষের বহুধাবিভক্ত মানসলোকের অন্ধকারে পুঞ্জীভূত অবদমনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন। মানুষের মৌল প্রবৃত্তিগুলোর অস্বাভাবিক বিকাশ-সহ মানব-মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দমিত, অবদমিত বাসনার বিকৃতিকেও তিনি সযত্নে ব্যবচ্ছেদ করে চরিত্রের মনের আকুতিকে উন্মোচিত করেছেন। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গল্পের কথক ও চরিত্রদের প্রায় প্রত্যেকেই নিজের মনের গোপন গহ্বরের ক্লেদ ও গ্লানি-সহই উপস্থিত হয়েছে পাঠকের সামনে। বহিরঙ্গের সমাজসিদ্ধ স্বাভাবিকতার আড়ালে তাদের বহুরৈখিক মানসপটের জটিল আকাঙ্ক্ষা একদিকে যেমন অসংকোচে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি আবার কদাচিৎ অধরা অমৃতও উঠে এসেছে সেই অতল থেকে।

এই পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে উপস্থাপিত মানব-মনের বহুরৈখিকতাকে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা যেতে পারে : (১) মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব, (২) নারী মনস্তত্ত্ব, (৩) নিসর্গচেতনা, (৪) প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব, (৫) কিশোর-মানস এবং (৬) মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ।

এর মধ্যে পাঁচটি পরিচ্ছেদভুক্ত প্রবণতাগুলোর বাইরেও জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের চরিত্রদের মধ্যে অন্য যেসব প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় – যেমন, বয়োবৃদ্ধ মানুষের বিচিত্র মনস্তত্ত্ব, আতঙ্ক, মৃত্যুচেতনা, নিয়তি, বিকার ও অবদমন প্রশমনের নানা মাত্রা ইত্যাদি – সেগুলো নিয়ে 'মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ' শীর্ষক ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে একত্রে আলোচনা করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম পর্যায়ের (১৯৪৬-১৯৫৬) গল্পগুলোতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এর মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা সমাজ-বাস্তবতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অভিঘাতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনজীবনে এসেছিল প্রভূত পরিবর্তন। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভাঙন ধরেছিল ব্রিটিশ শাসনামলেই। ভাগ্যের অন্বেষণে সাবেক ঔপনিবেশিক রাজধানী কলকাতায় ভিড় করা গ্রামের মানুষের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এই নগরকেন্দ্রিকতা গ্রামের অর্থনীতিতে যেমন প্রভাব ফেলেছে তেমনি শহরে আসা মানুষগুলোও স্বপ্নভঙ্গের শিকার হয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে। রাজনৈতিক টানাপড়েন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের পরিণামে পূর্ব বাংলা থেকে দেশান্তরিত অগণিত উদ্বাস্তুর চাপ – সব মিলিয়ে এই বিপর্যস্ত সময়ে অনিবার্য প্রক্রিয়ায় মানবচিত্তে তৈরি হচ্ছিল এক ধরনের বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা। আর সেই নিঃসঙ্গতাই তীব্রতর ও তীক্ষ্ণতর করেছিল সংবেদী কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অনুভূতিলোককে। বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কলকাতা শহরের প্রতি যুগপৎ বিবিক্তি ও সম্মোহন এবং বিকর্ষণ ও আকর্ষণের দ্বান্দ্বিকতায় নাগরিক জীবনপ্রবাহে ভেসে থাকা হতভম্ব মানুষ তাঁর এই পর্বের গল্পের প্রধান উপজীব্য।

যুদ্ধতাপে উত্তপ্ত দিশেহারা কলকাতা শহরের ছুটে চলা জীবন, অসংখ্য মানুষের নাগরিক জীবনের বদ্ধতার গ্লানি, জীবিকার জন্য নিম্নবিত্তের কঠোর সংগ্রাম, তথাকথিত সভ্যতা ও আধুনিকতার আড়ালে এক নৈরাজ্য ও দুর্নীতির তিমিরের রাজত্ব – সমকালীন এই সমাজ-পরিস্থিতি অনিবার্যভাবেই স্থান করে নেয় কথাসাহিত্যিকদের রচনায়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেও উল্লেখ করেছেন, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের অভিশাপ, আঘাত, যন্ত্রণা ও অবক্ষয় আমার লেখায় ধরতে চেয়েছি' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৭ ব. : ৩১৬)। ঔপনিবেশিক সময়ের ভয়াবহ দারিদ্র্য কীভাবে একদল মানুষকে অমানবিক নারকীয় জীবন যাপনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তার নৈতিক অধঃপতনকে অতলস্পর্শী করে তুলছে, তারই সাহিত্যিক দলিল জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্যায়ের গল্পগুলো। ভূদেব চৌধুরী প্রসঙ্গক্রমে যথার্থই মন্তব্য করেছেন :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র (১৯১২-১৯৮২) শহুরে মধ্যবিত্তের বিত্ত থেকে আত্মিক অবনমন, এবং অবশেষে উন্মূলনের ছকটি মানচিত্রের স্পষ্ট রূপরেখায় চিহ্নিত। সে-চিত্রণে যাথাযথ্যের শেকড় নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠুরতার সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। (ভূদেব চৌধুরী ২০০০ : ৯৭)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর প্রথম পর্বের রচনায় নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। মধ্যবিত্তের হতাশা, স্খলন আর গ্লানির ইতিহাস নির্মিত হয়েছে তাঁর এই পর্বের গল্পে। তাছাড়া নাগরিক জীবনের অতিরিক্ত নিয়ম-শাসিত প্রবণতার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ তার যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে ছাড়া চারপাশের আর কারো সম্পর্কেই তার ভাবনার অবকাশ ছিল না। এর ফলে তৎকালীন সমাজবাস্তবতায় এমন এক মধ্যবিত্ত গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল যারা মূলত নির্লিপ্ত, উদাসীন, নির্বিবেক ও হৃদয়হীন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি মূলত অর্থের কাছে নিজের বিবেকবুদ্ধিকে নির্বিকারচিত্তে সমর্পণ করে দিয়েছিল। ফলে সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্ক উভয়ই যেন খুব দ্রুত সর্বার্থেই বিনিময়যোগ্য পণ্যে পরিণত হলো। আর প্রবল হয়ে উঠল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম ও স্বার্থচিন্তাও। সমকালের পরিপ্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলো মধ্যবিত্তের এই অবক্ষয়ের চিত্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক তাঁর প্রথম পর্বের লেখায় যুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদি বিপর্যয়ে পর্যুদস্ত বাঙালি মধ্যবিত্তের অবক্ষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই পর্বে চাকরিচ্যুত কেরানি, নিম্নবেতনভুক চাকুরে, দেশভাগের শিকার পূর্ববঙ্গের মানুষ – প্রধানত এরাই তাঁর গল্পের মূল চরিত্র। এই মধ্যবিত্তের আবার শ্রেণিভেদ আছে, উপর-নীচ আছে, আকস্মিক অথবা ধারাবাহিক পতন আছে, এবং কদাচিৎ উত্থানও আছে। মধ্যবিত্তের যুদ্ধোত্তর এই বাস্তবতার আখ্যান জ্যোতিরিন্দ্রের পূর্বেই কম-বেশি রচিত হয়েছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), প্রবোধকুমার সান্যাল (১৯০৫-১৯৮৩), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭৫), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭১) প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের কলমে। এর সঙ্গে যোগ করা যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), বনফুল (১৮৯৯-১৯৭৯), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৪৭), সরোজকুমার রায়চৌধুরীর (১৯০৩-১৯৭২) নামও। যুদ্ধবিধ্বস্ত, মন্বন্তরপীড়িত বাংলার আর্তনাদ শুনেছিলেন এঁরা সকলেই। এই করাল কালপর্বেই প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন ‘শুধু কেরানী’ ও ‘পুন্নাম’, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনা করেছেন ‘হাড়’ ও ‘বীতংস’ এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে উঠে এসেছে ‘চড়াই উৎরাই’ ও ‘বিকল্প’-এর মতো নাগরিক মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের কাহিনি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এই কালপর্ব থেকেই তুলে এনেছেন সময়ের উত্তাপে দগ্ধ নাগরিক মধ্যবিত্তের অধঃপতনের চালচিত্র। তাঁর এই পর্যায়ের গল্পগুলোতে তিনি কখনো রোম্যান্টিক বাস্তববাদী, কখনো নিসর্গ-সংবেদী, আবার কদাচিৎ অস্তিত্ববাদী হলেও, প্রায়শই তিনি কলাকৈবল্যবাদী।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বিশেষত্ব চরিত্রনির্ভরতা। তাঁর প্রায় সব গল্পে চরিত্রই কাহিনিকে টেনে নিয়ে যায়, কাহিনির পেছনে চরিত্র ধাবিত হয় না। সহজ কথায়, এখানে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে কাহিনির গতিমুখ নির্ধারিত হয়। এটাই জ্যোতিরিন্দ্রের বর্ণনারীতির সহজাত

ভঙ্গি। চরিত্রকে ধাপে ধাপে তৈরি করে এমন বির্পযয়ের মধ্যে তিনি নিয়ে গিয়ে ফেলেন যেখানে তারা অস্বস্তি বোধ করে, হাঁসফাঁস করে, পরিপার্শ্বের চাপ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে আরো গভীর পাঁকে নিমজ্জিত হয়। এসব চরিত্রকে তিনি নিজে থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন না, বরং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন ঘটনার চোরাপাঁকে পড়ে তারা কে কেমন আচরণ করে। কেউ হয়তো টিকে যায় শেষ অবধি, কারো সলিল সমাধি ঘটে, কারো-বা পরিণতি উল্লেখ না করে লেখক পাঠকের উপর মীমাংসার ভার ছেড়ে দেন। টিকে থাকার মন্ত্র না জানলেও এগিয়ে যেতে হয় বলেই চরিত্ররা কোনো একদিকে হাঁটতে শুরু করে গল্পের দায় কাঁধে নিয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে মধ্যবিত্তকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে একটি অসম, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঐতিহাসিক সময়ের ধারাবাহিক কাহিনি বলে গেছেন নির্মোহভাবে। সরাসরি নিয়ন্ত্রক হিসেবে সময় এই যুদ্ধে উপনীত হয়নি হয়তো, কিন্তু তাঁর অনেক গল্পে পর্দার আড়ালের কুশীলব হিসেবে সময়ের অনড় অবস্থান বোঝা যায়। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে সময় যেন প্রবল প্রতাপশালী অর্জুনের সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সূতপুত্র কর্ণ বধের মন্ত্র শিখিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত। অবক্ষয় এখানে অর্জুন আর বাস্তবতা কর্ণ। তবে জ্যোতিরিন্দ্রের লেখা মহাভারতের এই যুদ্ধে মধ্যবিত্ত কারা? মধ্যবিত্ত স্রেফ কুরুকুলের পদাতিক সৈনিক, পাণ্ডবদের দিব্যাস্ত্রে নিয়তি যাদের মরণ লিখে রেখেছে। বীরত্বের খেতাব নেই তাদের, কোনো প্রশংসা তো নয়ই। এমনকি ইতিহাসও কোথাও তাদের চিহ্ন রাখেনি। আর গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বহু গল্পে এদের কবর খুঁড়ে গিয়েছেন গোরখোদকের নিস্পৃহতায়। *শালিক কি চড়ুই* গ্রন্থের 'ভোলাবাবুর ভুল' (১৯৫৪) গল্পে তিনি তাঁর চরিত্রকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন – 'আমরা মধ্যবিত্ত, আমরা যাযাবর। আমরা – আমাদের সংজ্ঞা কেবল আমরাই' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ভোলাবাবুর ভুল', ২০১৫ক : ১১৯)।

মধ্যবিত্ত আদতে কারা? মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোনো একক সংজ্ঞা প্রদান করা দুরূহ। সহজ ভাষায় বলা যায়, উচ্চ ও নিম্নবিত্তের মাঝামাঝি শ্রেণিটিই মধ্যবিত্ত। মাঝারি আয় বিশিষ্ট কিংবা সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে মধ্যশ্রেণিভুক্ত লোকজনকে মধ্যবিত্ত বলা যেতে পারে (নাজমুল করিম ১৯৯৩ : ১৬১)। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক অঁদ্রে বেতিইয়ের মতে :

> There is no single criterion for defining the middle class. Occupational function and employment status are the two most significant criteria, although education and income are also widely used. (Bétille 2018 : 76)

আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা বরাবরই বিশিষ্ট। বাংলার নবযুগের ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাসংস্কার ইত্যাদি মূলত মধ্যবিত্তেরই কীর্তি। এখানকার

ভূমি ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগ থেকেই এতদঞ্চলে এক মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। কৃষকদের দুর্দশা ও জমিদারি উপস্বত্বের বহুবিভাগের ফলে উনিশ শতকের অন্ত্য-পর্যায়ের মধ্যেই বাঙালি মধ্যবিত্তের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই তার 'সুস্থ সন্তুষ্ট' রূপ দ্রুত বিকৃত হতে থাকে। বস্তুত গ্রামে নাগরিক জীবনের প্রভাব বিস্তারের ফলে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা ক্রমে গ্রাম-বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হারিয়ে 'অনুপস্থিত ভূস্বামী' ('absentee landlord') শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে (বিনয় ঘোষ ১৯৬০ : ১৭১-১৭২)। এই মধ্যশ্রেণিটির ক্রমবর্ধমান নগরমুখিতার মধ্য দিয়ে প্রধানত কলকাতা শহরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে আধুনিক মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটেছে।

> বাংলাদেশে আধুনিক নাগরিক মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে প্রধানত কলকাতা শহরের আর্থিক কর্মজীবন কেন্দ্র করে। কলকাতার আর্থিক কর্মজীবন শিল্পকেন্দ্রিক ছিল না, বাণিজ্য ও প্রশাসনকেন্দ্রিক ছিল . . .। তার ফলে কলকাতার নাগরিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে কেবল একধরনের কর্মজীবনের বিস্তার হয়েছে ও বৈচিত্র্য বেড়েছে, সেটি হল 'services' বা চাকরি। . . . শিল্পোন্নত দেশেও চাকরির ক্ষেত্রের বিস্তার হয়, কিন্তু সেখানে সেটা শিল্পায়নের গতির 'over-head' হিসেবে গড়ে ওঠে, কিন্তু অনুন্নত দেশে তা হয় না। . . . অনুন্নত দেশে যেহেতু যন্ত্রায়ণ ও শিল্পায়নের পথে বাধার সৃষ্টি হয়, সেইজন্য যন্ত্রের কাজ সাধারণ মানুষের মেহনত দিয়েই করা হয়। . . . কলকাতা শহরের আর্থিক জীবনের বিকাশ অনেকটা এই ধারাতেই হয়েছে। কুলিমজুর, হকার, পোর্টার, ভিক্ষুক, চাকর প্রভৃতি 'non-productive' প্রলেটারিয়েট-শ্রেণীর কথা বাদ দিলে যাঁদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মধ্য ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার ও বিচিত্র রকমের শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত সব কর্মচারী। (বিনয় ঘোষ ১৯৬০ : ১৭৪-১৭৫)

তবে মধ্যবিত্ত নির্দিষ্ট আর্থিক অবস্থায় বিরাজমান একটি শ্রেণি মাত্র নয় – এটা একটা সংস্কৃতি, একটা আদর্শ, অনেকগুলো পরিশীলিত আচারের সমন্বিত রূপ। মধ্যবিত্তের একটা স্বকীয়তা আছে, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। আরো স্পষ্ট করে বললে, রাষ্ট্রের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে যারা ব্যাপ্ত করে থাকে, ব্যাপক অর্থে তাদেরকেই আমরা মধ্যবিত্ত বলি। তার হয়তো অর্থের টানাটানি আছে, কিন্তু শিক্ষা ও রুচি দিয়ে সেই অভাব সে পূরণ করে নিচ্ছে। আবার কারো অর্থ আছে, সে সেটা শিক্ষা ও রুচির পেছনে ব্যয় করে নিজেকে সম্পূর্ণতা দানের চেষ্টা করছে। এরা সবাই মধ্যবিত্ত। সবকিছুর সুষম সমন্বয়ে এরা জীবন পরিচালনা করে কিংবা করতে চায়। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে নানামুখী অর্থনৈতিক টানাপড়েন ও বিপর্যয় যখন এই সাম্যাবস্থার ব্যত্যয় ঘটায় তখন মধ্যবিত্তের আত্মপরিচয়ের সংকট শুরু হয়। পতন

শুরু হয় তাদের; ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তারা। এই নানামুখী সংকটের মুখে সর্বস্বান্ত হয়ে রাস্তায় নেমে আসে মধ্যবিত্ত মানুষ। সময়ের জাঁতাকলে পড়ে মধ্যবিত্ত দিশেহারা হলেও তার একটা নিজস্ব মানদণ্ড সবসময় ছিল। কিন্তু দিন-দিন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি তাকে নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর করে তুলেছে, তার অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মূল কুশীলব অস্তিত্বের সংকটে পড়া এই পরিবর্তিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই। এই পর্যায়ে আলোচনার সুবিধার্থে, মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক বাঙালি মধ্যবিত্তের বহুধাবিভক্ত মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনের লক্ষ্যে লেখকের মধ্যবিত্তপ্রধান গল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত মানসিকতার বিভিন্ন স্তর বিভাজনের আলোকে এ আলোচনাকে কয়েকটি পর্বে বিন্যস্ত করা যায়, যথা – (১) মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও অস্তিত্বের সংকট, (২) মধ্যবিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা, (৩) মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ, (৪) মধ্যবিত্তের সংস্কার, (৫) মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা, (৬) মধ্যবিত্তের পতন ও পলায়নপরতা এবং (৭) নারীর প্রতি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি।

মধ্যবিত্তের মূল্যবোধ ও অস্তিত্বের সংকট

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্তকে মোটা দাগে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা গেলেও তাঁর অধিকাংশ গল্প মূলত নিম্নমধ্যবিত্তদের কেন্দ্র করে রচিত। এই নিম্নমধ্যবিত্তরা একসময় মধ্যবিত্ত জীবনযাপন করলেও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময় তাদের নিম্নতর অবস্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। মানসিকতা, সংস্কার ও চিন্তাচেতনায় মধ্যবিত্ত হওয়া সত্ত্বেও দারিদ্র্য তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ফলে উভয়মুখী চাপে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এদের মধ্যে কারো কারো নড়ার ইচ্ছা ও শক্তি কোনোটাই নেই, কেউ আবার উঠে দাঁড়াতে চায়, স্বপ্নও দেখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পারে না। কেউ-বা দৈবের জন্য অপেক্ষা করে। জেনে হোক বা না জেনে, নিজেদের চারদিকে তারা দেয়াল তৈরি করে নিয়েছে। তারা উত্তীর্ণ হতে চায় সমস্ত শৃঙ্খল নিয়েই, অঘটনের মধ্য দিয়ে; যাকে তারা নাম দিয়েছে স্বপ্ন। যদিও জানে না এরপর কী আছে; কোথায় গিয়ে তারা পৌঁছাবে। এদিকে কিছু ছেড়ে যাওয়ার সাধ্য নেই, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেছে পুরো মাত্রায়। উপায়হীন এই মধ্যবিত্ত তাদের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি এক করা সত্ত্বেও প্রতিবন্ধকতা এড়াতে না পেরে স্ব অবস্থানে অনড় থাকতে বাধ্য হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আমরা একের পর এক এসব চরিত্রই পাই যারা মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কারের মাঝেও ব্যক্তিগত উন্নতির রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে, কিংবা মুহূর্তের লাভের আশায় সম্ভাবনার টুঁটি চেপে ধরেছে। নিরেট বাস্তবতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের এই মানসিকতাকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। চরিত্রদের উপর পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাপ প্রথমে

নিজের কাঁধে নিয়ে তিনি বোঝার চেষ্টা করেছেন এ ভার তারা আদৌ বইতে পারবে কি না। তিনি জীবনের সূক্ষ্ম অভিঘাতগুলোকে অকস্মাৎ এমনভাবে সামনে নিয়ে আসেন যাতে চরিত্রগুলো তাদের সপ্রতিভতার মুখোশ খুলে নিজেদের গোপন চেহারা দেখিয়ে দেয়। নীতিবাগীশ অবস্থানে দাঁড়িয়ে লেখক একে অস্বাভাবিকতা বা অপরাধ হিসেবে উপস্থাপন করেননি, বরং কখনো কখনো সত্যের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পের চরিত্রদের অনিবার্য এই স্খলন।

'বন্ধুপত্নী' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পের সুধাংশু চরিত্রটি লেখকের চরিত্রনির্মাণ দক্ষতার গুণে উপরিউক্ত প্রবণতার উদাহরণ হিসেবে বহুরৈখিক হয়ে উঠতে চেয়েছে। বিবাহ নামক সামাজিক স্বীকৃতি সত্ত্বেও সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করতে সংকোচ বোধ করেছে, কিন্তু কথা বলার সময় জানালার বাইরে থেকে বন্ধুপত্নীর কনুই বাড়িয়ে দেওয়াকে ইঙ্গিত মনে করে তার হাত জাপটে ধরেছে। বিষয়টা শেষ পর্যন্ত এরকম হলেও একে এত সরলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়তো ঠিক হবে না। গল্পকারের ভাষার জাদু অনুঘটক হয়ে উঠে গল্পের এই চরিত্রটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে তুলেছে। সুধাংশুর স্ত্রী রেবা তার সঙ্গে সংসার করেনি। বেনারস থেকে বারবার কলকাতায় এসে সংসার করা পোষায়নি তার পক্ষে। সুধাংশুও কোনো চেষ্টা করেনি। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বেনারস যাওয়া হয়ে ওঠেনি তারও। তাই টেকেনি সংসার। অথচ সুধাংশুর ভাষ্য মেনে নিলে রেবাকে অপরাধী বলে মনে হয়। সুধাংশুও রেবার নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বন্ধুর কাছে ঘটনা বর্ণনা করে শান্তি খোঁজে। সুধাংশু নিজেই জানায় – 'একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনি নিষ্ঠুরের মতো কাউকে বলে তারপর তার কাছ থেকে সৎ-পরামর্শের জন্য হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২২২)। সুধাংশু শুধু রেবার গল্পটুকু শুনিয়ে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চায়নি; সে হয়তো নিজের অজ্ঞাত কাহিনি পাঠককে শুনিয়ে তার সহমর্মিতা পেতে চেয়েছে। কাহিনি বর্ণনার শুরুতেই সে স্বীকার করে নিয়েছে, এই গল্প তার স্ত্রী রেবাকে নিয়ে হতে গিয়েও মূলত তার নিজেরই গল্প হয়ে উঠেছে। সে বলে নিয়েছে – 'বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত-অনুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্য গল্প হয় না' ('বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২১৯)। গল্পকার নিজেও তাঁর কিছু গল্পে তত্ত্ব-আলোচনার বাইরে এসে শুধু কাহিনির অভিনবত্বে পাঠককে বিহ্বল করে দিতে চেয়েছেন। এসব গল্পে পা হড়কাবার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও জীবনের ছকবন্দি মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোকে বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দিয়ে এদের পরিণতি দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে চেয়েছেন লেখক। তাই 'মঙ্গলগ্রহ' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পে নিপাট তরুণীর সামনে দাঁড়িয়ে মাংস খেতে না-পারা পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই মধ্যবিত্ত কেরানির হাঁসফাঁস বাস্তবতার নির্যাস ছেঁকে নির্মিত বলে মনে হয়। না, সেখানেই নাটকীয়তা শেষ হয় না; গল্পের শেষে করুণ কেরানিটির সমস্ত সম্ভ্রমকে গল্পকার মাটিতে মিশিয়ে দেন।

বাঙালি মধ্যবিত্ত কেরানি নানাবিধ রঙিন ফ্যান্টাসি গোপনে বুকে বয়ে বেড়ায়; এক পর্যায়ে বুড়ো হয়, মরে যায় – 'যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের, মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা' (জীবনানন্দ দাশ ২০১৭ : ২৭)। আর কখনো হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে মানুষটি হতচকিত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, পোষা প্রাণীর মতো আত্মসমর্পণ করে। 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পের এই করুণ কেরানিটিরও সেই একই দশা। বাত রোগে কাবু স্ত্রী হেমলতার বিপরীতে পরিপাটি যৌবনা নতুন প্রতিবেশিনী লীলাময়ী তাকে নিজের অনুগত করে তোলে। পুরো গল্প জুড়ে লীলাময়ীর প্রতি তার ছোঁকছোঁকানি শেষ হয় মঙ্গলগ্রহের লাল শক্ত সিমেন্টের ওপর চোখ রেখে। মঙ্গলগ্রহ – প্রতিবেশিনীর ঘর। গল্পের ভিত তৈরি করার উদ্দেশ্যে গল্পকার শুরুতেই কেরানিটির মুখে বলিয়ে নেন :

> সকালে অবশ্য আমাদের সংসার আগে জাগে, তারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানি, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, তাড়াহুড়া খুব। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মঙ্গলগ্রহ', ২০১৫ক : ২৪১)

অন্যদিকে নতুন আসা প্রতিবেশিনী যেন অন্য গ্রহের মানুষ। তাদের ঘরে লালচে হ্যাজাক, জানালার পর্দা আর লীলাময়ীর বিশাল বিকশিত খোঁপায় থমথমে যৌবনের ছটা কেরানির ঘরের নারীদের আরো হতশ্রী করে তোলে। এ যেন অন্য এক কল্পনার জগৎ ভুল করে তার সামনে দুয়ার খুলে দিয়েছে। সে নারীর চোখে-ঠোঁটে হাসির ঝলক সম্মোহিত, বিপন্ন করে তোলে কেরানিটিকে। প্রবল রোমান্টিকতায় আক্রান্ত হয়ে তার খোলা দরজায় ঢুকে পড়ে সে। শেষে নিজেকে বাস্তবতার নিরেট মাটিতে আবিষ্কার করার মাধ্যমে তার কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে। গল্পকার অবশ্য তা খোলাসা করে পাঠককে বলেন না। কিন্তু তিনি কুৎসিত হোঁতকা ইঁদুরের কথা বলেন। খাদ্যের লোভে সে ইঁদুর গৃহস্থের ঘরে ঢোকার জন্য হোস-পাইপ বেয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে; কিন্তু পা হড়কে গিয়ে পুনরায় নর্দমায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। কেরানিটি নিজেকে ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা না করলেও তাকে উচ্ছিষ্টলোভী ইঁদুর ভাবতে পাঠককে তেমন বেগ পেতে হয় না। আবার এরাই তাদের চেয়ে অবস্থাপন্ন, অভিজাতদের সঙ্গে তুলনা টেনে কোথাও মিল খুঁজে পেলে কিংবা কোথাও উঁচুতে ওঠার সুযোগ পেলে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে মনে মনে। যে-কোনো ক্ষেত্রে সবলকে পরাস্ত করতে পারার কিংবা সমানে সমানে টেক্কা দেবার তৃপ্তি দুর্বলকে দ্বিগুণ আমোদিত করে। এটাও বাঙালি মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক প্রবণতা :

> না, রাত্রে ওদের ঘরের উজ্জ্বল আলো আর আমাদের ঘরের রেড়ির বাতির বৈষম্যটা যতই চোখে লাগুক, যত উজ্জ্বল আর অদ্ভুত ঠেকুক না কেন, এখন, সকালে, যখন

> একই রকমের বিবর্ণ ধূসর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও বসে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বস্তি পেলাম। হোক বড়লোক – ভাবলাম – এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন সেই শ্যাওলা পড়া পুরানো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপায় নেই। ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হল আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সম্ভ্রান্ত কোনও যাত্রী এসে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বসে তখন কি এই ভেবে উৎফুল্ল হব না যে আমার অসুবিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্তত এদিক দিয়ে থাকবে না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মঙ্গলগ্রহ', ২০১৫ক : ২৪১)

চরিত্রের আত্মকথনের মাধ্যমে 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে লেখক বাঙালি মধ্যবিত্তের মনোজগতের আরেকটি অন্ধকার গুহায় মশাল জ্বালিয়ে দেন।

বস্তুত উনিশ শতকের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত "চাকরির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালীর যে প্রতিমূর্তি (image) চোখের সামনে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে, সেটি হল 'কেরানীর মূর্তি'" (বিনয় ঘোষ ১৯৬০ : ১৭৫)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্যায়ের বেশ কিছু গল্প জুড়ে রয়েছে মধ্যবিত্ত কেরানিদের শ্রেণিগত ক্লেদ, যাতনা, অসহায়তা, প্রতি মুহূর্তে সম্মান বিসর্জন দিয়ে টিকে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা ও আত্মসমর্পণ। এককথায় তাদের জীবনের কদর্য রূপগুলো একে একে উন্মোচিত করে সেই সময়ের মধ্যবিত্ত কেরানির জীবনকে পাঠকের বিবেচনার জন্য সামনে নিয়ে এসেছেন গল্পকার।

জীবনের কাছে প্রতিনিয়ত মার খাওয়া মধ্যবিত্ত কেরানিরা নিজেদের অসহায় অবস্থা লুকাতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বারবার ধরা পড়ে যায়। লেখক নিজেই নিষ্ঠুরের মতো তাদের অসম্পূর্ণতাগুলো দেখিয়ে দেন, রাস্তায় নামিয়ে আনেন তাদের। গল্পের চরিত্রদের অপ্রস্তুত অবস্থা পাঠকের কাছে নিঃসংকোচে উপস্থাপিত হয়, কেউ কেউ অবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, সেই দক্ষতাটুকুও যেহেতু তাদের নেই, একপর্যায়ে তারা থমকে যায়, হাল ছেড়ে দেয়। কেউ কেউ 'তারিণীর বাড়ি-বদল' (প্রথম প্রকাশ : *পূর্বাশা* ১৯৫১, *বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পের তারিণীর মতো গায়ের জোরে বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে গিয়ে বুকের পাঁজর ভেঙে মরে পড়ে থাকে রাস্তায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্তরা মোটের উপর প্রায় একই রকম জীবনযাপন করে। ঝামাপুকুর কিংবা দর্জিপাড়ার বস্তিতুল্য এলাকায় তাদের বাড়ি; ঘরে বেতো রোগী স্ত্রী আর জনা কয়েক হাড় জিরজিরে ছেলেমেয়ে। চাকরি তাদের জুনিয়র ক্লার্কের, যে চাকরি এরই মধ্যে চলে গেছে বা যাই-যাই করছে; যুদ্ধের বাজারের মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে দুটো বাড়তি পয়সার জন্য যারা চাকরির পর টিউশনি কিংবা এটা-ওটা ছুটকো কাজ করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সামনের রাস্তা অন্ধকার, পেছনের

একফালি চাঁদও সমস্যার তামস-মেঘে ঢাকা। জীবনের কাছে তাদের চাহিদা নেহাত সামান্য হলেও প্রত্যাশার প্রান্তে কদাচিৎ পৌঁছতে পারে তারা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর এক আত্মজৈবনিক রচনায় *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাস প্রসঙ্গে কেরানিদের অসহায়ত্বের কথা নিজেই স্বীকার করেছেন :

> আমি স্বীকার করছি আলো দেখাবার জন্য উত্তরণ দেখাবার জন্য আমি এই বই লিখিনি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলোর মধ্যে এমন একটা মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী শোনাতে পারত। বিপন্ন, বিপর্যস্ত, অবক্ষয়িত সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনওরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি . . . , আমি যেসব চরিত্র দেখেছিলাম তারা জীবিকার অন্বেষণ, খাওয়া, ঘুম, মৈথুন, সন্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোনোদিনই তারা কিছু করে না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২৩১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখক তাঁর স্মৃতিচারণায় নিজেই জানান, 'তারিণীর বাড়ি-বদল' গল্পটি থেকে লেখক *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেয়েছেন। তাই তাঁর উপরিউক্ত উক্তি *বারো ঘর এক উঠোন* উপন্যাসের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য তাঁর গল্পের জন্যও ততটাই প্রযোজ্য। বরং আরেকটু বাড়িয়ে বলা যায়, *বারো ঘর এক উঠোন*-সহ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথমদিকের উপন্যাসগুলো যেহেতু এক অর্থে তাঁর সেই সময়কার গল্পগুলোর বিস্তৃত রূপ, সেহেতু সেই উপন্যাসগুলোর চরিত্র গঠন ও অন্যান্য আঙ্গিক নির্মাণে তিনি তাঁর গল্পের উপরই নির্ভর করেছেন। তিনি বাস্তব জীবনে কেরানিদের যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই তাদের চিত্রিত করেছেন গল্পে ও উপন্যাসে।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্তরা কোনোক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে টিকে থাকতে চায় তারা। এগুলো তাদের সহজাত জীবনাচরণ হলেও এই বাস্তবতার চাপে পিষ্ট হবার ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে যার অবস্থান একটু ভালো তার আতঙ্কই সবচেয়ে বেশি। আর যারা যেনতেনভাবে টিকে আছে তারা নির্বিকার, নির্বাণপ্রাপ্ত যেন। তাই 'চার ইয়ার' (*চার ইয়ার* ১৯৫৫) গল্পে সবার প্রথমে চাকরি খোয়ানো হাবুল অনায়াসে বলতে পারে – 'এখন আর দিক ফিক নেই। যেদিক খুশি হাঁটলেই হল' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চার ইয়ার', ২০১৫ক : ১৬৮)। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যবিত্তের এই সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের যেন কোনো জাগতিক আকাঙ্ক্ষা নেই, উদ্দেশ্য নেই। বস্তুবাদী পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় জীবনকে টিকিয়ে রাখতে এরা হঠকারী দর্শনের আশ্রয় নিয়েছে। ভিন্ডির চেয়ে মাংস প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও

নিজেদের প্রবোধ দিতে শ্রেয়তর অলীক রসের সন্ধান করছে। সেই আশ্রয়ে বস্তুগত দারিদ্র্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে চায় তারা। নিজের ছেলের প্রশংসা করতে গিয়ে 'গানের ফুল' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে জলধরবাবু বলেন :

> তাই বলে মাংসের চেয়ে ভিন্ডি ওদের কাছে প্রিয় মনে করবেন না আবার – বরং তার উলটো। কিন্তু হলে হবে কী, মাংসের চেয়েও প্রিয়তর, শ্রেয়তর রসের সন্ধান ওরা পেয়েছে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গানের ফুল', ২০১৫ক : ৪০৫)

জলধরবাবুর ধারণায় গান হচ্ছে সেই শ্রেয়তর রস যার নেশায় তিনি তাঁর পরিকল্পনাহীন পরিবারটিকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। সে নেশায় তিনি নিজেও এতটা বুঁদ হয়ে আছেন যে, হাড় জিরজিরে বাচ্চাগুলোর প্রতিবেশীকে গান শুনিয়ে চেয়ে নেওয়া মুড়ি নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করা দেখেও তিনি তা অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারেন। জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যবিত্ত কেরানি এভাবেই আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্য দিয়েই তৃপ্ত থাকে জীবনভর। এরা সমাজে নিজেদের অবস্থান খুঁজে ফিরতে থাকে; আড়চোখে অন্যের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মাপতে চায়। কারো কথায় বিদ্রুপের ছিটে আসছে কি না, কেউ হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইছে কি না, সহানুভূতির আড়ালে অপমান করতে চাইছে কি না কেউ – এসব বিষয়ে তাদের কড়া নজর। তীব্র অহংয়ের বলয় তারা এতদূর ছড়িয়ে রাখে যে, সাধারণ কথায়ও তারা অপমানিত বোধ করে। 'মাছের দাম' (*ট্যাক্সিওয়ালা* ১৯৫৬) গল্পের বৈদ্যনাথ এই শ্রেণিরই একজন :

> বৈদ্যনাথ এটা কিছুতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেন নি। জামা-কাপড়, সন্দেশ, রাবড়ি, ফলমূল বা খেলনা কিনে দিয়ো বললেও বৈদ্যনাথ বাবুর এত রাগ হতো না। মাছ। বৈদ্যনাথবাবুর ঘরে মাছ আসে না। প্রোটিনের অভাবে তাঁর ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ সরাসরি বৈদ্যনাথের ঘরের হাঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। 'তুমি ভাল খেতে দিতে পারছ না সন্তানদের।' মাছের নাম করে পাঁচটা টাকা মুঠ থেকে আলগা করে দিয়ে কৃপণ বিরাজমোহন আজ বেশ ভালোভাবেই বৈদ্যনাথের পৌরুষকে খোঁচা দিয়ে গেল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মাছের দাম', ২০১৫ক : ৩৪৮)

নিজের ব্যর্থতার জন্য বৈদ্যনাথের লজ্জা নেই, কিন্তু ব্যর্থতা দেখিয়ে দেওয়ায় তার পৌরুষে আঘাত লাগে। সংসার, সন্তান-সন্ততি তার, সে তাদের খাওয়াতে-পরাতে পারুক না-পারুক আত্মীয় হলেও দাক্ষিণ্য দেওয়ার ছলে আরেকজনের তা দেখিয়ে দেওয়ার কোনো অধিকার নেই। অথচ তারা নিজেরাও দেখতে চায় না, বৈদ্যনাথেরা নিজের দিকে তাকায় না কখনো। সঙ্গতি না থাকা সত্ত্বেও অনেক

সন্তান জন্ম দেওয়া নিয়ে তাদের লজ্জা নেই, সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করা নিয়ে মাথাব্যথা হয় না, কিন্তু আরেকজন সহানুভূতি দেখাতে চাইলে তারা আত্মসম্মানবোধে আঘাত পায়। তাই বলে টাকাটা সে ছুড়ে বা ছিঁড়ে ফেলে না, বরং এমন একটা উপায় বের করে যেখান থেকে সে নিজেও ভাগ পেতে পারে। অর্থদাতা মাছ কিনতে বলেছে বলে নয়, মাছ কিনলে তার পাতেও এক টুকরো (সম্ভবত সবচেয়ে বড় টুকরোটা) জুটবে – এই প্রচ্ছন্ন ভাবনা তাকে মাছ কিনতেই অধিক উৎসাহিত করে তোলে। তাই স্ত্রী-সন্তানদের অন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মাছ কেনার পক্ষে সে যুক্তি খুঁজে বের করে। গল্পে উল্লেখ না থাকলেও বৈদ্যনাথের আচরণ থেকে এটুকু স্পষ্ট আন্দাজ করে নেওয়া যায়। এই ধরনের মানসিকতা মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আবার অকারণ সহানুভূতি দেখানোও মধ্যবিত্তের আরেকটি আত্মতৃপ্তির অজুহাত। প্রয়োজনের সময়ে এগিয়ে না আসলেও প্রয়োজন ফুরালে তারা কে কী করতে পারত তার ফিরিস্তি শুনিয়ে দিতে উদ্‌গ্রীব থাকে। 'রিপোর্ট' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পের চরিত্ররা তাই বলে :

> 'না, মাইরি, পাড়ায় আমরা দশজন আছি – তুমি যে এমনভাবে তলিয়ে গেছ, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছিলে, সব খুলে মেলে বললে কি আর একবেলা দু'বেলা করে আমরা পাত পাততে দিতুম না – ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এর ওর বাড়ি? যতই গরীব আছি না কেন!' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রিপোর্ট', ২০১৫ক : ৪৭১)

মুখে খাবার তুলে না দিতে পেরে ক্ষিতীশ তার স্ত্রী-কন্যাকে খুন করে পালিয়ে যাবার পর এলাকার লোকজন রকে বসে এই আলাপ করছিল। সবার গলার স্বরে আক্ষেপ ঝরে পড়ছিল, কেন ক্ষিতীশ এমন কাণ্ড করার বদলে তাদের জানায়নি। পাড়া-প্রতিবেশীরা যে সাহায্য করে না, এমন না। তারা সাহায্য করে, আত্মীয় জ্ঞান করে, দুঃখে কাতর হয়, আনন্দ ভাগাভাগি করে, আবার ছদ্ম সহানুভূতির ভানও করে। এ আরেক বৈশিষ্ট্য মধ্যবিত্তের। ভালো-মন্দ সমস্ত অনুভূতির আকর এরা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পের মধ্যবিত্তদের নির্মাণ করতে গিয়ে এর কোনোটিকেই বাদ দেননি। এ প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণটি যথার্থ :

> কিন্তু আমার ধারণা উনি যে শুধু বাস্তববাদী লেখক – এটা কখনই বলা ঠিক নয়। তিনি তার চেয়েও একটু বেশি। তাঁর চেনা জানা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের কথাই তিনি লেখেন। কিন্তু শুধু বাস্তবদৃশ্যের মধ্যেই তিনি থেমে যান না। তাঁর মূল লক্ষ্য সবসময় থাকে আরও ভিতরে। মানুষ হিসেবে এরা একটা শ্রেণীর হ'লেও প্রত্যেকেই আলাদা। এখন একরকম। আবার একটু পরেই সে বদলে যায়। তাদের রূপ সকালে একরকম। বিকেলে ঠিক তার বিপরীত। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪২৩ ব. : ৩৪)

সুনীল এখানে যাদের নিম্নমধ্যবিত্ত বলছেন বস্তুত তারা মধ্যবিত্তই। সময় ও পরিস্থিতির চাপে তারা নিজেদের গুটিয়ে নিতে নিতে নিচে এসে ঠেকেছে। এদের একটি অংশ আবার সেখানেই থেমে নেই, নিম্নবিত্তের কাতারে গিয়ে মিশেছে। শিক্ষা-সংস্কার-আচার-ব্যবহার বাদ দিলে তাদের আর আলাদা করা যায় না নিম্নবিত্ত থেকে। শ্রেণিচরিত্রের দিক থেকে যারা প্রকৃত নিম্নবিত্ত তারা বরং এদের চেয়ে ভালো আছে। তাদের পেশা আর কাজ নিয়ে বাছবিচার নেই। মধ্যবিত্তরা এনট্রান্স পরীক্ষার সার্টিফিকেটে বাঁধা পড়ে গেছে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রের 'তারিণীর বাড়ি-বদল' গল্পের গয়লানির শাড়ি তারিণীর স্ত্রীর শাড়ির চেয়ে দামি।

সামর্থ্যের অভাবে মধ্যবিত্তদের কেউ কেউ দৈনন্দিন প্রয়োজনকে বজ্রআঁটুনিতে বেঁধে ফেলেছে, গানের শ্রেয়তর রস দিয়ে এরা মাংসের স্বাদ ভুলতে চায়; টর্চ, হারমোনিয়াম, রেডিও তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয়, শৌখিনতা। তাদের মতে এইসব বিলাস বজায় রাখা অপচয়ের নামান্তর। 'দিগ্‌দর্শন' (*পতঙ্গ* ১৯৬১) গল্পের নগেন তাদেরই প্রতিনিধি :

> 'একটা টর্চ রাখতে হবে, দরকারে আসুক না আসুক, একটা ছুরি রাখতে হবে, ছড়ি রাখতে হবে, হ্যান্ড ক্যামেরা থাকবে, সাইকেল থাকবে – সাইকেল, হারমোনিয়াম – কি রেডিয়োকেও আমি অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে করি। কিচ্ছু দরকার নেই। এমনি তো কলকাতা শহর চারদিক হইহল্লা, গানে-বাজনায় মাতোয়ারা। ঘরের ভেতর আর গোলমাল বাড়ানো কেন।' চোখ দুটো দার্শনিকের মতো ওপর দিকে তুলে দিয়ে নগেন বলল, 'থাকলে হাঙ্গামা, মেরামত করতে দাও দোকানে, চাবি ভেঙে গেছে, ব্যাটারি ফুরিয়েছে, কিনে আনো চাবি, নতুন ব্যাটারি, নতুন... আর হারিয়ে গেলে, চুরি গেলে বুক চাপড়ানো, হায়-হুতাশ করা – ভারী বিশ্রী।'
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'দিগ্‌দর্শন', ২০১৫ক : ৭৭০)

এই ব্যয়কুণ্ঠার কারণে তারা তাদের পরিবার ও সন্তানদের বঞ্চিত করতে থাকে জীবনভর। ফলে পরিবারের শিশুদের মনে বঞ্চনার বোধ তীব্রতর হয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তু ভিন্ন উপায়ে করায়ত্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় তাদের কেউ কেউ। নগেনের ছেলে নরহরি তাই টর্চটা চুরি করে প্রতিবেশী সারদার কাছ থেকে। সে জানে এমন সব সুন্দর জিনিস এভাবে ছাড়া অন্য উপায়ে তার ভাগ্যে জুটবে না। সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার ব্যর্থতা নরহরির বাবা নগেনের নয়; মিতব্যয়ী বা কৃপণ যা-ই হোক নগেন সন্তানের এই আচরণ সমর্থন করে না, এই ব্যর্থতা ভঙ্গুর মধ্যবিত্ত সমাজ-কাঠামোর, যে কাঠামো পরিবারের উপর ভেঙে পড়ে। আর তাই 'সিংহরাশি' (*খেলনা*, ১৯৪৬) গল্পে এগারো বছরের মালবিকা বলে – 'সাগরিকা আমার চেয়ে ঢের কালো; বুঝলেন, মা বলে ওর বিয়ে দিতে অনেক যন্ত্রণা হবে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সিংহরাশি',

২০১৫ক : ৩০), দশ বছরের সন্তু গান শুনিয়ে বিনিময় খোঁজে – 'কই আমাদের কিছু দিলেন না?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গানের ফুল', ২০১৫ক : ৪০৭)। মালবিকা সুধীরের মেয়ে; যে সুধীর দেশের জন্য বিপ্লব করে সাত বছর জেল খেটে এসে এখন মিলিটারি কনট্রাক্টরের অধীনে কমিশনে কাজ করে। যে সুধীর 'ফিমেল ইমান্সিপেশনের' পক্ষপাতী। যে ভাবে, জাতির একটা বৃহৎ অংশকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অধীনে আটকে রেখে দেশ যে অমার্জনীয় ভুল করেছে তার প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে সে বহুদিন ধরে। তার এগারো বছরের অপুষ্ট বড় মেয়ে মায়ের বরাত দিয়ে যখন বলে, তার কোলের কালো বোনটিকে বিয়ে দিতে অনেক যন্ত্রণা হবে, তখন সুধীরের পারিবারিক বুনিয়াদের অন্দরমহলের অন্ধকার প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অথচ হামবড়া ভাব নিয়ে সে কথককে জানায়, তৃতীয় সন্তানটি মেয়ে হওয়ার পর তার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সে নাকি বলেছে :

> সুধা, তুমি তো ইন্টারমিডিয়েট অবধি পড়েছ, মূর্খ নও। ছেলে হলো না বলে তোমার মতো মেয়ের মন খারাপ করা শোভা পায় না। একটু উদার বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাকাও ইউরোপের দিকে। রেস, রীতিমতো রেস চলছে সেসব দেশে আজ নারী আর পুরুষে। প্রতিযোগিতায় কেউ হটতে চায় না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সিংহরাশি', ২০১৫ক: ৩৪)

জীবন থেকে ক্রমাগত পালিয়ে বেড়ানো জীবনবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণির আদর্শ প্রতিনিধি এই সুধীর, যে নিজেকে রাজবন্দি হিসেবে পরিচয় দিয়ে হাততালি পেতে চায়, আবার যুদ্ধের বাজারে ট্যানারির ব্যাবসা করে বড়লোক হতে চায়; যে স্ত্রীকে নারী স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়, আবার একের পর এক সন্তানের জন্ম দিতে থাকে।

'গানের ফুল' গল্পের স্কুলশিক্ষক জলধরবাবু এক্স ডেটেন্যু সুধীরেরই একটি মার্জিত, পরিশীলিত রূপ, জীবনদর্শনের চাপে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হলেও মধ্যবিত্ত সংস্কারকে পরম যত্নে আগলে রেখেছেন। সাত-সাতটি সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি স্বেচ্ছায় ডেকে আনা দারিদ্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এক অর্থহীন জীবনদর্শন তৈরি করে নিয়েছেন ঢাল হিসেবে। পিতা-মাতা হওয়ার সার্থকতাকে আরো শক্ত করতে পরবর্তী দুটি পুত্রসন্তানের নামও ঠিক করে রেখেছেন জলধরবাবু। কিন্তু বর্তমান সাত সন্তানের মধ্যে তিন-তিনটি মেয়ে রয়েছে বলে কামনা করেন অনাগত সন্তানটি যেন ছেলে হয়। তাঁর এই হঠকারী জীবনাচরণ তাঁকে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ করে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্বিকারচিত্তে নিজের শিশুদের শিখিয়ে চলেছেন – 'পৃথিবীর মায়া কাটাব বলে উদাসীর সাজে সেজেছি মা' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গানের ফুল' ২০১৫ক : ৪০৩)। অন্যদিকে 'সম্মান' (*খেলনা*, ১৯৪৬) গল্পে মধ্যবিত্তের আরেকটি অসচ্ছল অধোগামী অংশকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আরো নির্দয় ও করুণভাবে চিত্রিত করেন, যখন সেই চরিত্রটি অর্থসাহায্যের জন্য একটি

অফিসে এসে প্রার্থিত অর্থ না পেয়ে বাড়তি সুবিধা হতে পারে বলে মনে করে নিজের ব্রাহ্মণ পরিচয়টি প্রকাশ করে। প্রচলিত বিশ্বাস তার মধ্যে এই ধারণার জন্ম দিয়েছে যে, হিন্দু সমাজে তার আসন উচ্চ বলে তাকে সাহায্য করা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাদের আগের তেজ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আকাঙ্ক্ষা যদিও ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, তাই বলে একেবারে উবে যায়নি। সেই ভরসায় ক্ষীণ কণ্ঠে নিজের কুলমান প্রকাশ করে সাহায্য প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করা যায় কি না তার চেষ্টা চালায়। পূর্বের ব্রহ্মতেজ এখনো অবশিষ্ট থাকলে অবশ্য তার ভিন্ন রূপ প্রকাশ পেত; আর যাঁর কাছ থেকে প্রাপ্তির আশায় সে ছুটে এসেছে তিনিও এভাবে নিরাশ করতেন না। বলা বাহুল্য আধুনিক যুগে এই পরিচয়টিই বরং তার অপমানকে আরো তীব্র করে তোলে, তার বর্ণগত পরিচয় আরো তুচ্ছ হয়ে ওঠে, কারণ তা জানানোর পরও তাকে কোনো সাহায্য দেওয়া হয় না।

যাঁর কাছে এই কুলশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিয়ে বাড়তি সুবিধা আদায় করতে চেয়েছে সেই ভদ্রলোকটিও একদা মধ্যবিত্ত, অধুনা উচ্চবিত্ত। তিনি জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম পর্যায়ের গল্পের অনিয়মিত চরিত্রদের একজন, যিনি তাঁর মধ্যবিত্তের তকমা কাটিয়ে উঠে কোনোক্রমে উপরের দিকে উঠে এসেছেন। না, তাঁর দৌড় কিন্তু থামেনি। এখন তিনি স্বীকৃতি চান তাঁর বড়লোকির। বেণীমাধব নামের এই চরিত্রটি প্রয়োজনীয় পরিশ্রম আর সুযোগের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের আখের গুছিয়ে নিয়ে এসেছেন। যিনি এখন বোঝেন কার সঙ্গে সম্পর্ক করলে, কোথায় বিনিয়োগ করলে বৈষয়িক লাভ অবধারিত। যিনি চাকরিপ্রার্থীর মুখে 'আপনারা হলেন Local God' শুনে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন, কিন্তু জুতসই রেফারেন্স নেই বলে তাকে চাকরি দেন না। অন্যদিকে কেউকেটা লোকের চাকরিপ্রার্থী আত্মীয়কে শুধু চাকরিই দেন না, খানিক তোষামোদও করে নেন।

এটা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের কোনো কোনো মধ্যবিত্ত চরিত্রের অন্যতম প্রবণতা। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে কখনো কখনো নির্মমভাবে এদের মানসিকতাকে নগ্ন করে দেখিয়েছেন। সেই মধ্যবিত্তের সময়, চাহিদা আর যাপন আজকের থেকে অনেক ক্ষেত্রে আলাদা হলেও মনোজগৎ কিন্তু এতটুকুও পাল্টায়নি। তারা এখনো তেমনই, তারা কখনোই হয়তো পাল্টাবে না। নানা সমস্যায় আকীর্ণ এই মধ্যবিত্ত জীবনেরই রূপকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। সমালোচক অসীম সামন্তের মতে, 'সারাজীবন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির ক্ষুধা-তৃষ্ণা, লোভ-লালসা, নীচতা, হ্যাংলামো আর সর্পিল অধঃপতনের গল্প লিখে গেছেন তিনি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের মূল ভরকেন্দ্রই ছিল – মধ্যবিত্তের পচন' (অসীম সামন্ত ২০১৭ : ৫৪)।

মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ

সময় ও সমাজের ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত এই নিরাশ্রয় মধ্যবিত্তের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তাদের মনোজগৎকে স্তরে স্তরে বিশ্লিষ্ট করার সময়ে ক্লেদ ও গ্লানির সঙ্গে কখনো কখনো আত্মসম্মানবোধও ধরা পড়েছে লেখকের চোখে :

> হাঁটতে গিয়ে ছবির পথ গোলমাল হয়। কান গরম হয়ে গেছে। চাবুকের বাড়ি খেয়ে মানুষের এত যন্ত্রণা হয় না। না, তার কথা, টাকা চেয়ে না পাওয়ায় কী এসে যায়, কিন্তু বেছে বেছে শেষে অবিনাশের কাছে কি না সে হাত পাতল। আশ্চর্য।
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সমতল', ২০১৫ক : ৩৬-৩৭)

'সমতল' (*খেলনা* ১৯৪৬) গল্পের চরিত্র ছবি দারুণ অপমানিত। অবিনাশের কাছে টাকা চেয়েছে বলে নয়, পায়নি বলে অপমানটা ভীষণ বিঁধেছে তাকে। অবিনাশ তাদের ঘরেই মানুষ। এখন সেক্রেটারিয়েটে চাকরি পেয়ে দিন ঘুরে গেছে তার, সন্তর্পণে সরে পড়েছে তাদের জীবন থেকে। অথচ এই ছবির সঙ্গে অবিনাশের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। টাকাটা পেলে হয়তো ছবির অপমানের জ্বালা এতটা তীব্র হতো না। অবিনাশের এড়িয়ে যাওয়া তাকে নিজের কাছে আরো ছোট করে দিয়েছে। টাকাটা না দিয়ে অবিনাশ তাদের অতীত সম্পর্কের অসারতাকে প্রকাশ করে দিয়ে গেছে তার কাছে। সযত্নে আগলে রাখার মতো ওই সম্পদটুকুই হয়তো অবশিষ্ট ছিল ছবির; কিন্তু টাকা ধার চেয়ে তা জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছে সে। অভাবের চেয়েও এখন মুহূর্তের অসম্মান তার চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আত্মসম্মানবোধ মধ্যবিত্তের বর্ম। তাই দিয়ে সে সকল বঞ্চনা আড়াল করে রাখে। অন্য কোনো শ্রেণির নিজেকে রক্ষা করার এমন ঢাল নেই; এটাই তার রক্ষাকবচ। তাই 'গানের ফুল' গল্পে যে বাচ্চারা চেয়ে নিয়ে মুড়ি কাড়াকাড়ি করে খায় তাদেরকে টাকা দিলে তাদের মা চিরকুট লিখে পাঠায় – 'আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর যা-ই দিন, ওদের হাতে পয়সা দেবেন না – পয়সা দিয়ে ওদের ভিক্ষুক হতে শেখাবেন না' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গানের ফুল', ২০১৫ক : ৪০৮)। অর্থের উৎস নিয়ে বাঙালি মধ্যবিত্তের নিজস্ব সংস্কার আছে। তারা অনুপার্জিত পড়ে-পাওয়া অর্থকে ঘৃণার চোখে দেখে। এমনকি উপার্জনের উপায়টি ভদ্রস্থ না হলেও তারা সেই অর্থকে, অর্থের মালিককে সামনাসামনি বা আড়ালে ধিক্কার জানায়। খাবার চেয়ে খেতে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংকোচ না থাকলেও হাত পেতে পয়সা নিতে হলে তারা অপমানিত হয়। মধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতে লোভ না করার চর্চা আছে বলে তারা সচরাচর বিনা পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনকে সুনজরে দেখে না। আবার সেই চর্চা অভাবে-অনটনে ক্ষয়ে যায় বলে

অপ্রত্যাশিতভাবে খাবারদাবার কিংবা কোনো জাগতিক সুবিধা পেলে আনন্দিতও হয়। কিন্তু সরাসরি অর্থভিক্ষাকে তারা তখনও যেমন মেনে নিতে পারেনি, তেমনি এখনো বোধ করি মেনে নিতে পারে না।

মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধের সুদৃঢ় বর্মটিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরখ করে দেখতে চেয়েছেন সৈকতের তপ্ত বালিতে তাদের উল্টে দিয়ে। সমুদ্রের শতবর্ষী কাছিম তীরের বালিতে ডিম পাড়তে এসে ভুলক্রমে একবার উল্টে গেলে নিজেকে যেমন আর সোজা করতে পারে না, ফিরে যেতে পারে না পূর্বাবস্থায় – বাঙালি মধ্যবিত্তের অবস্থাও অনেকটা তেমনই। এই ঢালই তখন হয়ে ওঠে তার মৃত্যুফাঁদ। মধ্যবিত্তদের কেউ কেউ মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত এই ঢাল ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাঁচতে চায়, আবার কেউ উঠে দাঁড়াবার চালাকি শিখে নেয়। 'ভিজিট' (*চার ইয়ার* ১৯৫৪) গল্পের নিবারণ রক্ষিত তাদেরই একজন। মেয়েকে নিয়ে নিবারণ রক্ষিত সরাসরি কোঠায় চলে যাননি, যেতে পারেননি; ভদ্রপাড়াতেই কোঠা বানিয়ে নিয়েছেন, লুকিয়ে খদ্দের আনছেন মেয়ের জন্য। কারণ মধ্যবিত্ত সংস্কার তাঁকে যেতে দিচ্ছে না, নিজের অতীত তাঁকে থমকে দিচ্ছে বারবার। এমনকি খদ্দের আনতে গিয়েও তাঁকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। মেয়ের দেহ উপভোগ করতে সরাসরি আমন্ত্রণ জানাতে পারছেন না খদ্দেরদের; লজ্জা তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন, কিন্তু একেবারে নির্লজ্জ হয়ে উঠতে পারেননি এখনো।

এটাও মধ্যবিত্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য – তারা একলাফে পাতালে নামতে পারে না, সংস্কার তাদের আটকে রাখে। একবারে মৃত্যু তাদের ভাগ্যে জোটে না, একটু একটু করে তারা প্রতি মুহূর্তে মরবে, এই যেন তাদের নিয়তি। এ যেন রক্ষিতবাবুর যক্ষ্মার মতো – কাশতে কাশতে ফুসফুস বের হয়ে আসার উপক্রম, তবু নিশ্বাস চলছে এখনো। একমুহূর্তের শান্তির জন্য সস্তা সিগারেটে টান দিয়ে জীবনীশক্তি খুঁজে নেন রক্ষিতবাবু। মুক্ত বাতাস তাঁর কণ্ঠরোধ করতে চাইলে তামাকের ধোঁয়া তাঁকে রক্ষা করে। তামাকের ধোঁয়া এখানে পরিস্থিতির রূপক, যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হবে তা-ই তাঁকে মুহূর্তের স্বস্তি দিচ্ছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধের চমকপ্রদ উদাহরণ রাইচরণ চরিত্রটি ('রাইচরণের বাবরি', প্রথম প্রকাশ : *দেশ* ১৯৩৬, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প* ২০১৫)। লেখকের অন্য সব চরিত্র থেকে সে আলাদা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। মধ্যবিত্তের গৎবাঁধা আদর্শ নিয়ে সে ভাবে না। তার আদর্শ স্বতন্ত্র, চিন্তাভাবনাও তা-ই। মধ্যবিত্ত হলেও তার আছে এক অমূল্য সম্পদ, যা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। নিজের সাম্রাজ্যে সে রাজা; বাকিরাও তাকে সেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এমনকি লেখকও জানান, কলকাতা শহর ঘুরে তার মতো বাবরি দ্বিতীয়টি বের করা যাবে না। সে নিজের সম্পদে শুধু গর্বিত নয়, তার সঠিক পরিচর্যাও করে, তাই নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে পারে। সে যৎকিঞ্চিৎ ভয় পায় স্ত্রী মানদাকে। নতুবা আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই তার। দুর্মূল্যের বাজারে সে একশ পঁচিশ টাকা মাইনে পেয়েও থিয়েটারের চাকরি এককথায় ছেড়ে দেয় কেবল এই আশঙ্কায় যে, তার মাথার বাবরিটিকে দর্শক

ভুল করে পরচুলা ভাবতে পারে। অথচ এমন কিছু অর্থগৌরব তার নেই, কাপড় সেলাই করে সে জীবিকা নির্বাহ করে। একশ পঁচিশ টাকা তার জন্য অনেক। তা দিয়ে প্রতি মাসে স্ত্রী মানদাকে স্কার্ট-পাড় শাড়ি উপহার দিতে পারত। তবু সে থিয়েটারের চাকরি অবলীলায় ছেড়ে দিয়েছে তার শখের বাবরিটির অমর্যাদা হবে বলে। এ প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের মূল্যায়ন :

> রাইচরণের মাথায় আছে পরিপুষ্ট সুন্দর বাবরি – কোঁকড়া, লম্বা, চিকন, সাপের মতো ঢেউ খেলানো। দর্জিগিরিতে সামান্য তার উপার্জন, তাই বাবরির জন্য তেল খরচে তার বউ মানদা খেপে যায়। এমন সময় তার কাছে প্রস্তাব আসে থিয়েটারে অভিনয়ের। তার যা নাকি 'শরীরের টাইপ, চুলের ফ্যাশন', সে একেবারে অ্যাকটিং করার জন্য। রাইচরণ প্রস্তাব অবাস্তব বলে ফিরিয়ে দেয় কিন্তু স্ত্রী মানদা এই প্রস্তাব লুফে নেয়। বউয়ের চাপে রাইচরণকে এই সিদ্ধান্ত নিতেই হয়। খলিফাগিরি ছেড়ে সে থিয়েটারে নামবে। কিন্তু সে থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জানল 'নাটকের সবটাই মিথ্যে', সেখানে সাজপোশাক, হাবভাব, মায় কথাবার্তা পর্যন্ত সব বানানো, কৃত্রিম। তাই যদি হয় তাহলে দর্শকরা ভাববে ডাকাতবেশী রাইচরণের বাবরিটাও মিথ্যে – তার বাবরি আসল নয়, পরচুলা – 'স্টেজে নামবার আগে গ্রিনরুম থেকে মাথায় চাপিয়ে এসেছে'। একশো পঁচিশ টাকা মাহিনের চেয়ে রাইচরণের বাবরির মায়া অনেক বেশি। জনপ্রিয়তার তাগিদে, সাফল্যের সহজ তাড়নায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীও অন্যের ধরণে, চলতি প্রকরণে, মূলধারার স্রোত অনুসরণ করে গল্প লিখতে চাননি, পরচুলা পরতে চাননি, তাঁর নিজস্ব বাবরিকে কেউ পরচুলা ভাবুক তা মেনে নিতে পারেন নি। (অশ্রুকুমার সিকদার ১৪১৬ ব. : ৪১)

রাইচরণের মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে সমালোচক গল্পকারের মিল খুঁজে পেয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেও জানিয়েছেন, তিনিও তাঁর সৃষ্ট মধ্যবিত্ত চরিত্রদের একই শ্রেণিভুক্ত। তাঁর আর্থিক অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। উপরন্তু সাহিত্যচর্চার জন্য তিনি অর্থ রোজগারের অন্য অনেক সুযোগ পায়ে ঠেলেছেন। এমনকি সাহিত্যকে অর্থ রোজগারের হাতিয়ার করে তুলতে পারার সকল সক্ষমতা সত্ত্বেও সস্তা জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাননি। মূলধারার সাহিত্য লিখে জনপ্রিয় হতে চাননি কখনো। এমন নয় যে তাঁর জনপ্রিয়তার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু তিনিও রাইচরণের মতো, নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে অর্থ ও সুনাম উপার্জনে অনাগ্রহী। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর গল্পের চরিত্র রাইচরণ – উভয়েই নিজেদের স্বকীয়তার জগতে এমনভাবে নিমগ্ন যে, বাইরের সকল প্রলোভনই সেখানে তুচ্ছ।

মধ্যবিত্তের সংস্কার

মধ্যবিত্তের পরিচয় কেবল তার আর্থিক অবস্থানে নয় – তার রুচিতে, সংস্কারে, শিক্ষায়ও। এখানে মধ্যবিত্তের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা হয় না। ধনী কিংবা দরিদ্র উভয়কে তাদের অর্থ-বিত্তের পরিমাণ ও পরিমাপ দিয়ে পৃথক করতে পারা গেলেও একই দাঁড়িপাল্লায় মধ্যবিত্তের ওজন নেওয়া যায় না। তাকে মাপার একক ভিন্ন। মধ্যবিত্ত ব্যাপক বিত্তের অধিকারী হতে পারে, কিংবা তস্য গরিব হতে পারে, কিন্তু তাকে মাপতে হলে তার রুচি, শিক্ষা আর সংস্কারের সমন্বিত বাটখারা দিয়ে তার ওজন নিতে হবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্ত চরিত্ররা আবার এদের মধ্যেও এক কাঠি সরেস। পরিস্থিতির চাপে তারা জর্জরিত, তারপরও সংস্কারের জীর্ণতাকে ভাংতে পারছে না। এটাই তাদের যক্ষের ধন, অবলম্বন। তারপরও শেষ রক্ষা হয় না, নানা দুর্বিপাকে মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সীমারেখা মুছে যেতে থাকে ক্রমশ, পরস্পরের সঙ্গে তারা দ্রুতলয়ে এমনভাবে মিশে যেতে থাকে যেন আর কখনো আলাদা করা যাবে না এই দুই শ্রেণিকে। বিত্তের অধোগামিতার মধ্যে তাও কোনোক্রমে হয়তো টিকে থাকা যায়, কিন্তু এর সঙ্গে চিত্তও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যে সংস্কারকে মধ্যবিত্ত ভূষণ জ্ঞান করে, জানে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র হিসেবে, তাও যখন পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে খসে পড়ে, তখন মধ্যবিত্ত আর আশ্রয় খুঁজে পায় না।

তাই ‘সমতল’ (*খেলনা* ১৯৪৬) গল্পে মাইনের অভাবে শিশুটি স্কুলে যায় না জানতে পেরে ছবি ভাবে :

> এই আরেকটি পরিবার। হয়তো তেমনি অসহায়, বোনের রোজগারে সংসার চলে। ইস্কুলের মাইনে চালাতে না পেরে ছোট ভাইটির পড়াশুনা বন্ধ হয়ে গেল, আশা ভরসা সব এখানে এসেই শেষ। এই শহরে আরও কত পরিবার আছে এমনি কে জানে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘সমতল’, ২০১৫ক : ৪০)

ছবির এই উপলব্ধির কিছু পরেই শিশুটি জানান দেয় – ‘তার চেয়ে এক কাজ করো না, আমাদের পাড়ায় উঠে এসো, রোজ সেখানে অনেক বাবু আসেন, দিদির তো এখন অনেক ভাল ভাল শাড়ি’ (‘সমতল’ ২০১৫ক : ৪১)। মধ্যবিত্তের শেষ আশাটিকেও এভাবেই ধুলিসাৎ করে দেন লেখক – নির্বিকার, নির্মমভাবে।

মধ্যবিত্তের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কার পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে প্রায়শই। শিক্ষার আলো যৎকিঞ্চিৎ আঁধার দূর করতে সমর্থ হলেও সংস্কারের বলয়ে গিয়ে তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে বাধা অতিক্রম করে বাইরে পৌঁছতে পারে না। ‘সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু’ (*মহীয়সী* ১৯৬১) গল্পটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ :

> এটা ইউরোপ না, আমেরিকা না। ভারতবর্ষ। তার উপর সবচেয়ে নরম, সবচেয়ে মধুক্ষরা দেশ বাংলাদেশ। এদেশের মেয়ে পতি পরম গুরু, পতি সতীর গুরু শুনতে শুনতে বড় হয়। স্বামীর সংসারে থাকতে পেরে, মা হতে পেরে এখানে মেয়েরা যত সুখী হয়, আর কিছু পেয়ে তেমন সুখ পায় কি না সিদ্ধেশ্বরবাবু জানেন না (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু', ২০১৫ক : ৬৬৮)।

ব্যক্তিগত জীবনে শান্ত সুকোমল প্রবৃত্তির মানুষ সিদ্ধেশ্বরবাবু তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান সত্ত্বেও সংস্কারের বাঁধন আলগা করতে পারেননি। সেই সময়ের জীবনাচরণে এমন ভাবনা অমূলকও ছিল না। তার পরিণামে তাঁকে পতিতাপল্লির রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে মরতে হলো। কেননা তাঁর সংস্কারাচ্ছন্ন মন কখনোই মেনে নিতে পারেনি যে, তাঁর পুত্রবধূ সাজানো সংসার ফেলে এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারে। নিজের মনকে প্রবোধ দিতে তিনি অন্য কারণ খুঁজেছেন। বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে বেড়িয়েছেন পুত্রবধূকে। এই যাত্রাপথে – তিনি নিজে অনুভব করতে না পারলেও পাঠক ঠিকই বুঝতে পারে – যুদ্ধ-ভারাক্রান্ত অভাবী বাংলায় পারিবারিক বিশ্বাসবোধ ও সংস্কারের বলয় দ্রুত ভাঙতে শুরু করেছে। একে মেনে নিতে না পারলে সিদ্ধেশ্বরবাবুর মতো হারিয়ে যাওয়া, মুছে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আবার সিদ্ধেশ্বরের এতদিনের জীবনযাপন তাঁর সম্পর্কে অন্যদের ভাবনায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই মুখে মদের গন্ধ নিয়ে অভদ্র পল্লিতে তাঁর মারা যাওয়ার সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ায়। কেউ সত্যমিথ্যা যাচাই করার প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং মুখরোচক এই সংবাদটুকু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্যের সামনে উপস্থাপন করে অন্যের গায়ে কালি মাখাবার আনন্দটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করেছে সবাই। কথকের বয়ানে :

> ভবিষ্যতে সিদ্ধেশ্বরের গল্পটা বাড়তে বাড়তে আরও কত বড় হবে তখন, সেদিনই তার কিছুটা আভাস পাওয়া গেছে। চিৎপুরের সেই গলি থেকে সিদ্ধেশ্বরকে যখন অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়, তখন তাঁর মুখে মদের গন্ধ পাওয়া গেছে। অর্থাৎ গোপনে গোপনে সিদ্ধেশ্বর মদ খেতেন। খবরটা এ পাড়ায় কে কার আগে বয়ে এনেছিল বলা শক্ত। অবশ্য তার খোঁজ করার দরকারও ছিল না। এখানে খবরটাই প্রধান। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু', ২০১৫ক : ৬৬৩-৬৬৪)।

সংস্কারের জালে বন্দিত্ব বরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কেউ কেউ তা ছিন্ন করে বের হতে গিয়ে পিছুটান অনুভব করেছে। সংস্কার ও ক্ষুধা – এই দুইয়ের মধ্যে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে। 'দৃষ্টি' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পটি তারই দৃষ্টান্ত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই গল্পটিতে অনুর বাবা নয় মাস ধরে বেকার। সংসারের সবকিছু তলানিতে ঠেকেছে, স্ত্রীর গয়না সরেছে গা থেকে, প্রতিবেশীরাও আর কিছুদিনের মধ্যে চাল-ডাল ধার দেওয়া বন্ধ করবে। অথচ এই প্রতিবেশীদের থেকে নিজেদের কিছুটা উঁচুতলার ভেবে অনুরা একসময় আত্মপ্রসাদ লাভ করত। সেজন্যই হয়তো ধার-দেনার জন্য অনুর মা-বাবা নিজেরা তাদের শরণাপন্ন হননি। তরুণী হলেও মেয়েকেই ঠেলে দিয়েছেন দ্বারে দ্বারে। গয়না খুইয়ে মায়ের অঙ্গ আভরণহীন হলেও অনুর গলায় একটা লকেট ঝুলছিল অতীতের লুপ্ত আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে; কিন্তু মায়ের অজান্তে সেটিও বাবার হাতে তুলে দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। সংসারের নিত্য অনটন, মায়ের শানিত বাক্যবাণ, বাবার বিষাদ-ব্যাকুল দৃষ্টি, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছোট ভাই-বোনের কান্না অনুকে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত করে তোলে। এ অতলান্ত অভাবের শেষ কোথায়? লকেট বিক্রির টাকা শেষ হলে আবার রান্না বন্ধ হবে। অন্য উপায় খুঁজতে থাকে অনু। বাবার জন্য, মায়ের জন্য, ডলি-টাটুর জন্য এই টুটাফাটা সংসারকে স্থায়ীভাবে মেরামত করতে মরিয়া হয়ে ওঠে – 'আমি যদি ছেলে হতাম। তাহলে কি এই বিপদে নিজেকে আরেকটু বাড়িয়ে দিতে পারতাম না। আমার জায়গায় একটি ছেলে এই সংসারে বেশি কাম্য ছিল যে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'দৃষ্টি', ২০১৫ক : ২৬১)। পুরো গল্প জুড়ে ব্যর্থ চরিত্র হিসেবে উপস্থাপিত অনুর বাবা শেষে এসে দারিদ্র্য মোচনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। দারিদ্র্যের কশাঘাত থেকে মুক্তির লড়াইয়ে তিনি এবার সরাসরি অংশগ্রহণ করেন না, তিনি বুঝেছেন এই সমাজে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই পুরোনো বন্ধুকে বাড়ি ডেকে এনেছেন মেয়েকে দেখাবেন বলে। বন্ধুকে বিদায় দিয়ে মেয়ের উদ্দেশে বলেন – 'তোর খুব প্রশংসা করল।. . . তোর নাক-চোখ, হাত-পা, কোমর-বুক সব সুন্দর। বললে খুব ভালো হবে।. . . তিনটে সিনেমায় টাকা ঢালছে রাজশেখর রায়' ('দৃষ্টি', ২০১৫ক : ২৬৩)। গল্পের শুরু থেকেই সংসারের বেহাল অবস্থা আর বাবার কাতর দৃষ্টির কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে অনু। কেবল ভেবেছে কী করে ক্ষুন্নিবৃত্তির স্থায়ী সমাধান করা যায়, অকস্মাৎ এমন নিশ্চিত সমাধান পেয়ে আজীবন লালিত সংস্কারের কারণে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে সে :

> 'তোর ইচ্ছে নেই অনু?' বাবা আমার হাত ধরল। 'তোর মা'র কথা ছেড়ে দে, এই অবস্থায় তুই যদি এখন –'
>
> না, বাবা আমার হাত ধরেছে বলে কি! আমি পারি না। আমি পারিনি আমার শরীরের ওপর সেই কাতর বিষণ্ন স্থির দৃষ্টি বেশিক্ষণ ধরে রাখতে। ছুটে এলাম ঘরে। মা'র ঘরে।
>
> আশ্চর্য, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তখনও আমি ভাবছি মাকে বলব কি বলব না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'দৃষ্টি', ২০১৫ক : ২৬৩)

সিনেমা দেখা মধ্যবিত্তের জন্য বিনোদন, কিন্তু সিনেমায় নামা পদস্খলনের নামান্তর – বিশেষত তৎকালীন সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিতে, মধ্যবিত্তসুলভ সংস্কারে। কিন্তু দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে সকল সংস্কারের বাঁধ ভেঙে যায়। পিতাই কন্যাকে সিনেমায় নামাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত লেখক পাঠককে জানান না অনু কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু গল্প জুড়ে তাদের অনটনের তীব্রতা যেভাবে তিনি বাড়িয়ে তুলেছেন, তাতে সংস্কার ধরে রাখতে গেলে পুরো পরিবারটির আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 'দৃষ্টি' গল্পের চরিত্রদের এই অনন্যোপায় অবস্থা সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য – 'অর্থনৈতিক সংকটে যখন দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন মধ্যবিত্তের যাবতীয় সংস্কার আর পিছুটান পেছনেই পড়ে থাকে। একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যেনতেন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা' (শম্পা চৌধুরী ২০১৭ : ৯০)।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের বেশিরভাগ চরিত্রই যেন পরস্পরের নিকটাত্মীয়। একই রকম অন্তহীন সমস্যায় নিমজ্জিত, মুক্তির জন্য ছটফট করছে। তাদের যন্ত্রণাক্লেশ আর কাতরতার সাক্ষী লেখক। ভাষায়, বুননে কিংবা বয়ানে কোথাও উঁচু স্বরের আলাপ নেই, নেই কোনো অতিশায়ন; তবু প্রতিটি চরিত্রের প্রতিমুহূর্তের যাপনেই তাদের ক্রমশ তলিয়ে যাওয়াটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এমন নয় যে, অসচেতনতার ফলে তারা তলিয়ে যাচ্ছে, বরং উপায়ান্তর না থাকায় সজ্ঞানে নিজেদের সেখানে সঁপে দিয়েছে। সমস্ত আশা-স্বপ্ন খুইয়ে এসব চরিত্র শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্যই বেঁচে থাকছে, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে মানবেতর জীবনকে বেছে নিচ্ছে। কখনো অন্যকে আঁকড়ে ধরে, কোনোমতে নিশ্বাসটুকু নেওয়ার জন্যই কেবল তাদের এই বেঁচে থাকা।

'বন্ধুপত্নী' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পে সুধাংশুর বন্ধু সুবিনয় এই বাস্তবতার মোক্ষম উদাহরণ। মধ্যবিত্ত সামাজিক জীবনাচরণ তাকে শিখিয়েছে ঘরের বউকে সবসময় চাপে রাখতে হয়, এতেই সংসারের সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। পরিবারের নারীটি তার প্রভু-পুরুষটি দ্বারা নিগৃহীত হয়েও হাসিমুখে হেঁশেল ঠেলে যাবে, নিজের জীবনকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করে দেবে। আবহমান কাল ধরে বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে এমনটিই ঘটে আসছে। বিরল কিছু ব্যতিক্রম হয়তো আছে, কিন্তু তা কোনোভাবেই উদাহরণ নয়। সুবিনয়ের বদ্ধমূল ধারণা এমন না করলে সংসারের মাধুর্য রক্ষা হয় না। সে নিজ মুখেই বলে :

> লিভার সতেজ রাখতে নিত্য একটু তেতো খেতে হয়, জলে কোনও জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ফিটকিরি মেশাতে হয়। সংসারে ডিসিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার। বুঝলি? গিন্নিকে যে পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলোকে মেষ বলি। ওদের কপালে দুঃখ থাকে। হ্যাঁ, আদর করতে হবে বই কী, তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যখন গৃহস্থালিতে লাগেন তখন না। যখন তিনি

অবসর, যখন শয্যাসঙ্গিনী হন তখন। তুই ম্যারেড ম্যান, তোকে আর বোঝাব কী। কিন্তু বহু পুরুষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না – অর্থাৎ জানে না সংসার করতে হলে কীভাবে চলতে হয়। ফলে ভোগে। ('বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২৩০)

যদিও নুন আনতে প্রতিবেলায় পান্তা ফুরাচ্ছে, তবু তিনটি বাচ্চা নিয়ে বাড়বাড়ন্ত এই সংসারে সে দারুণ তৃপ্ত। আরেকটি আবার আসতে চলেছে সামনে। পদে পদে তাকে অপমান করা সত্ত্বেও এই নারী সংসারকে মায়ার বাঁধনে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, সংসারের জন্য রাতদিন খেটে খেটে বিলীন হয়ে যাচ্ছে নিরন্তর। এইটুকু সুখ তারিয়ে তারিয়ে আস্বাদনের জন্যই সুবিনয় স্ত্রী-শাসনের মশলা মেশায় প্রতি গ্রাসে। এই লোকটাই আবার সুধাংশুকে পেয়িং গেস্ট করে এনে তুলেছে তার স্ত্রীকে আগামী মাসে চশমা বানিয়ে দেওয়ার জন্য। তার এ ভাবনা থেকে বোঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি দায়িত্বটুকু তার স্মরণে আছে, ভালোবাসাটুকুও স্পষ্ট। কিন্তু সমাজ তাকে যেভাবে চলতে শিখিয়েছে তা থেকে সে সরবে না। এরা পরিবর্তনবিমুখ বাঙালি মধ্যবিত্তের প্রতীক। জ্যোতিরিন্দ্রের রচনায় মধ্যবিত্তের অবনমন ও অবক্ষয়ের এই চিত্র প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মধ্যবিত্ত জীবনের অবনমন ও অবক্ষয়ের চিত্ররূপ এঁকেছেন স্বভাববাদী শিল্পীর মতো। তাদের সার্বিক অসহায়তাকে নানা চিত্রকল্পে উপস্থাপিত করেছেন বাস্তববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তাদের বিপন্নতাকে ভাষারূপ দিয়েছেন এক অস্তিবাদী ভাবুকের মতো। শিল্পীর এই ত্রি-সত্তার এই নিকষেই জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্য নতুন করে বিচার্য। (অজন্তা সাহা ২০১০ : ৭৫)

বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্ত নিতান্ত ছাপোষা। কলম পিষে কোনোরকমে জীবন অতিবাহিত করাই তাদের স্বপ্ন। তারা প্রতিবাদী হতে পারে না; তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। সন্তানেরা পড়াশোনা করে শিক্ষিত হলে, ছেলেরা আরেকটু ভালো চাকরি পেলে, মেয়েদের অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পরিবারে বিয়ে দিতে পারলে তারা সৌভাগ্যবান ভাবে নিজেদের। আত্মরক্ষার জন্য তারা একটা দেয়াল গড়ে নিয়েছে নিজেদের চারদিকে। এই দেয়ালই তাদের সীমানা। তারপরও কারো কারো প্রাচীরে চিড় ধরে; সেই ফাটল দিয়ে গলে নেমে যেতে থাকে তারা পতনের পথে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এমন বিপদগ্রস্ত মধ্যবিত্তদের জীবনই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের উপজীব্য। চূড়ান্ত পতন পর্যন্ত তাদের অনুসরণ করে গেছেন তিনি। কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নিয়তি এই যে, সীমানারূপী এই লক্ষ্মণরেখাই বাঙালি মধ্যবিত্তের চক্রব্যূহে পরিণত হয় ধীরে ধীরে; নিজের জালে নিজেই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় তারা। মনে হয় যুগ যুগান্তরের এই প্রবহমান বাস্তবতা থেকে এদের আর কেউ মুক্তি দিতে পারবে না, কেউ কখনো ত্রাতা হয়ে দেখা দেবে না এদের জীবনে। ঠিক তখনই জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মধ্যবিত্ত নিজেদের ক্ষীণ স্বাস্থ্য আর পরিমিত পরমায়ু নিয়ে ম্যাজিক

দেখিয়ে দেয়। এমন কিছু একটা করে বসে তারা যা পাঠকের কল্পনারও বাইরে। যা আপাতদৃষ্টিতে হয়তো অ্যাবসার্ড, কিন্তু বেঁচে থাকার মোক্ষম দাওয়াই।

'ভিজিট' গল্পে যেমন দেখা যায় যক্ষ্মারোগী নিবারণ রক্ষিতকে। বেঁচে থাকার একটা উপায় বের করে নিয়েছে সে। সেই উপায় মরণাপন্ন স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নয়, দুটো মুখে গুঁজে কোনোমতে বেঁচে থাকার জন্য। তার মেয়ে, যাকে সে দেহ ব্যাবসায় নামিয়েছে, সেই মেয়ে দিব্যি মেনে নিয়েছে এই আত্মধ্বংসী পথটিকে; কারণ সে জানে, তাদের যে আর্থ-সামাজিক অবস্থান তাতে সব রাস্তা ধ্বংসের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। পরিস্থিতিই তাকে এই বাস্তব শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু রক্ষিতবাবুর স্ত্রী মানতে পারেননি এই সামাজিক অধঃপতন, তিনি অস্বীকার করেছেন এই রাস্তাটিকে, এমনকি নিজের পরিবারকেও। তিনি মরতে বসেছেন, স্যাঁতস্যাঁতে ঠান্ডা অন্ধকার খুপরিতে ধুঁকতে ধুঁকতে। একদিকে রক্ষিতবাবু ও তার কন্যা, অন্যদিকে তার স্ত্রী – বাস্তবতার নিরিখে সংস্কার ও সংস্কার ভাঙার দ্বন্দ্ব দেখাতে গিয়ে লেখক এখানে সচেতনভাবে সংস্কারের কোণঠাসা অবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মধ্যবিত্তের পতন বিশ্লেষণ করে তাঁর কথাসাহিত্য বিষয়ক গবেষক মধুমিতা সাহা মন্তব্য করেন :

> মধ্যবিত্ত যে তার নৈতিক সততাকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে যুদ্ধকালীন সময়ে প্রায় রাতারাতি তাদের জীবনে নেমে আসা প্রবল অর্থনৈতিক সংকট। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চাকরির সুযোগ যতটা ছিল ব্যাঙ্ক, আদালত, সওদাগরি অফিস, স্কুল-কলেজ প্রভৃতিতে; দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সেইসব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির অধিকাংশ বন্ধ হয়ে গেলে বেকার-সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরই পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্রবমূল্য বৃদ্ধির ফলে তৈরি চূড়ান্ত অচলাবস্থায় মধ্যবিত্তের নৈতিক ভিতটা সম্পূর্ণ টলে যায়। (মধুমিতা সাহা ২০১৫ : ৮৫)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যবিত্তরা নিয়তি দ্বারা চালিত হয়, উপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজে পায় না কখনো। তারা ক্রমাগত নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হতে থাকে। তাদের সামনে কোনো আশা নেই। তাঁর গল্পে দেখতে পাওয়া যায় মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্তের সীমারেখা একাকার হয়ে গেছে, তারা দ্রুত পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, যেন আর কখনোই তাদের আলাদা করা যাবে না।

মধ্যবিত্তের সংকীর্ণতা

মধ্যবিত্তের আরেক সংকট সংকীর্ণতা। অপরিচিতের প্রতি প্রখর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পেতে রাখে তারা। 'সিংহরাশি' গল্পের কথককে যেভাবে ভূতপূর্ব রাজবন্দি সুধীর অন্তত চারবার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে,

সেভাবেই তারা আগাগোড়া মেপে নিতে চায় অপরিচিত জনকে। তারা শিশুস্নেহকে শিশুকাম ভেবে অহেতুক ভয় পায়, তারা স্বাধীনচেতা নারীকে বারবণিতা ভেবে নেয়। তারা অন্যের উপর নিজের দোষ চাপিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত, তা সে প্রয়োজনে হোক বা অপ্রয়োজনে :

> 'হ্যাঁ, হ্যাঁ দেখলাম তো পটলা আপনার পিছনে পিছনে ছিল।' ভদ্রলোক আমার হাত দুটো প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিলে। বললাম, 'যদি স্টিমারে থেকে যায় –'
>
> 'স্টিমারে থাকবে কি, – বলেন কী মশাই?' সহযাত্রীর আস্ফালনে সমস্ত ট্রেন সচকিত হয়ে উঠল। – 'স্বচক্ষে দেখলাম আপনার সঙ্গে আসছে ছেলেটা, – এখন না বললেই বিশ্বাস করব নাকি, কোথায় ফেলে এসেছেন বলুন, –' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সন্ততি', ২০১৫ক : ২০)

'সন্ততি' (প্রথম প্রকাশ : *পূর্বাশা* ১৯৪৬, *খেলনা* ১৯৪৬) গল্পের এই পিতাটি, যিনি জাহাজে সন্তানদের আবদার মেটাবার ভয়ে তটস্থ হয়ে প্রায় পুরোটা সময় ডেকে এসে লুকিয়ে ছিলেন এবং অধিক সন্তান প্রতিপালনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'এক মুখ সোনা দিয়ে ভরানো যায়, পাঁচ মুখ ছাই দিয়ে কুলোয় না –' ('সন্ততি', ২০১৫ক : ১৭), সেই লোকই আবার জাহাজে ধৈর্যশীল শ্রোতা হওয়া সত্ত্বেও নিজের সন্তান হারিয়ে যাওয়ার দোষ গল্পের কথকের উপর চাপিয়ে দিতে চান। সন্তান খুঁজে পাওয়ার চাইতে পিতা হয়ে সন্তানকে হারিয়ে ফেলার যে অমার্জনীয় ত্রুটি তা অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অথচ তার আগেই কথক গল্পের ছলে জানিয়ে রাখে :

> শিশুগুলো চুপ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। শীর্ণ, শঙ্কিত চাউনি সব ক'টির। গায়ে কাপড় নেই, শরীরে নেই স্বাস্থ্যের চিহ্ন। লিকলিকে হাত-পা, মাথাগুলো বড় বড়। পোকায় খাওয়া মৃতপ্রায় চারাগাছের মতো ওরা ওখানেই এসে থেমে গেছে, এই বয়সেই ফুরিয়ে এসেছে ওদের আশা আর ভবিষ্যৎ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সন্ততি', ২০১৫ক : ১৯)

কথকের এ উক্তি থেকে পিতাটির স্বরূপ প্রকাশ পায়। পাঠক বুঝে যায়, ইনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ একজন পিতা ও পরিবারপ্রধান। সিদ্ধান্তহীন আচরণ আর পরিকল্পনাহীন জীবনযাপন আজ দুর্ভোগ হয়ে তাঁর মাথায় চেপেছে। কথক বরং তাঁর প্রতি একটু সদয় হয়ে ওঠে। অভাব আর দারিদ্র্যের মাঝে কষ্টেসৃষ্টে জীবন টেনে নিয়ে যাওয়া এসব মানুষ চারপাশে প্রায়শ দেখতে পাওয়া যায় বলেই কথক একটা সরল সমীকরণে পৌঁছাতে চায় – 'তীব্র অভাব, দারিদ্র্যের দুর্নিবার নিষ্পেষণে স্নেহ-মমতা শুকিয়ে যায়' ('সন্ততি', ২০১৫ক : ২০)। কিন্তু ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার পর কথক যখন অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার

আনন্দে হাসছিল তখন সন্তান হারানো পিতাটির ধমক শুনে বুঝতে পারে বিবেচনাহীন জীবনকে তারা পাথেয় করে নিয়েছে – 'অত হাসবেন না মশাই, বিয়ে করেননি তো, সন্তানের মর্ম আপনি বোঝেন কী!' ('সন্ততি', ২০১৫ক : ২১)। অথচ একটু আগেই সেই পিতাটি কথককে বলছিলেন :

> 'বেশ বেশ – কখনো ও-পথে পা বাড়াবেন না।... ও-পথে গিয়েছেন কি মারা পড়েছেন। কাঁচা বয়েস, দম খিঁচে দু'হাতে রোজগার করুন এখন। তারপর ওসবের ঢের ঢের সময় আছে। পায়ের উপর পা তুলে তখন, – বুঝলেন না?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সন্ততি', ২০১৫ক : ১৫)

কথা আর কাজের বৈপরীত্য এবং মুখোশে মুখ ঢাকার প্রবণতার কারণেই এই পিতাটির প্রতি সকল সহানুভূতি মুহূর্তে লুপ্ত হয়ে যায়। এই শ্রেণির মানুষ নিজের সন্তানের কাছেই পিতা হিসেবে আবির্ভূত হতে পারে না, অপরিচিতের সামনে শালীন হয়ে প্রকাশিত হওয়ার শক্তি হারায়। আর তাই 'সিংহরাশি' গল্পে এগারো বছরের মালবিকার সঙ্গে বন্ধুত্বের বুনিয়াদ পাকা করার উদ্দেশ্যে উপঢৌকন হিসেবে আঙুর দিতে চাইলে তার পিতা ভূতপূর্ব রাজবন্দি সুধীর কথকের নাকের কাছে হাত ঘুরিয়ে হুংকার দেন :

> "হবে না, চলবে না এসব এখানে – . . . আবার কিনা আঙুর দিয়ে খাতির জমানোর চেষ্টা। ওসব প্ল্যান এককালে আমাদেরও জানা ছিল। . . . কাল সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ই আমার মনে স্ট্রাইক করেছিল।" (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সিংহরাশি', ২০১৫ক : ৩৫)

আগের দিন প্রথম সাক্ষাতে উনি কথককে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছিলেন, তা যে অকারণ ছিল না আজ তা প্রমাণিত হয়ে গেল যেন। অথচ পরদিন সকালে উপযাচক হয়ে কথকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় এবং বীরত্বপূর্ণ অতীতের ঠিকুজি পেতে দেওয়ার সময় সেই সন্দেহ প্রভাব ফেলেনি। এই মানুষটিই আবার পার্টিশান-সংলগ্ন দরজাটা মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়ার আগে বলছেন, এসব প্ল্যান এককালে তাঁদেরও জানা ছিল। এ বাক্যের মাধ্যমে নিজের ভাবনার পরিধি তিনি কথককে জানিয়ে দিয়ে গেলেন।

সংকীর্ণতা, সন্দেহ, পরশ্রীকাতরতা আর কুৎসা রটনার প্রবণতার জন্য মধ্যবিত্তকেই এককভাবে দায়ী করা সমীচীন হবে না। কিন্তু এও সত্য যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি মানুষের উপর সবচেয়ে বেশি অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে, তার মানসিকতাকে কলুষিত করে দিতে পারে – বিশেষ করে তাদের, যারা নিজেদের শিক্ষা, রুচি, সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এসব কুপ্রবৃত্তিরও চর্চা করে। একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে থাকার

কারণে এ ধরনের কুটিল ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার প্রবণতা মধ্যবিত্তেরই সবচেয়ে বেশি। আর এই মধ্যবিত্তকেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চিত্রিত করেছেন সহজাত দক্ষতায়।

মধ্যবিত্তের পতন ও পলায়নপরতা

> আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
> কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে?
> কোথায় লুকোবে? ধু-ধু করে মরুভূমি
> ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।
> (সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ২০১৭ : ৯৫)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্যায়ের গল্পগুলো একত্রসত্তায় মধ্যবিত্তের মহাকাব্য হয়ে উঠলেও সেই আখ্যানের মূল সুর মূলত পতনের, অবক্ষয়ের। এ কারণে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর লেখায় 'মর্বিডিটি'র সন্ধান পেয়েছেন। তবে এই বাস্তবতা সময়ই নির্ধারণ করে দিয়েছে, লেখক নির্মোহভাবে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন মাত্র। যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগে বিধ্বস্ত কলকাতা শহর ব্যবসায়ীদের জন্য স্বর্গ হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তদের জন্য পরিণত হয়েছিল নরকে। যারা নিজেদের মধ্যবিত্ত মানসিকতা বিসর্জন দিয়ে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পেরেছে তারাই কেবল রক্ষা পেয়েছে এই মহাপ্লাবন থেকে, বাকিরা তলিয়ে গেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণিটির নাম মধ্যবিত্ত – যারা নিজেদের শিক্ষা, রুচি, সংস্কারের কারণে স্রোতে গা ভাসাতে চায়নি, পারেনি। তারা তাদের মূল্যবোধ রক্ষা করতে চাইলেও সমাজের বিরামহীন পরিবর্তনের ধারা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদের একটি বড় অংশ বাস্তুচ্যুত পূর্ববঙ্গের মানুষ, যাদের বেশিরভাগই প্রায় শূন্য হাতে কলকাতা শহরে এসে ঠাঁই নিয়েছিল শরণার্থী শিবিরে। অন্যদিকে যারা কলকাতার মূল বাসিন্দা সামগ্রিক বিপর্যয়ের আঘাত থেকে তারাও রক্ষা পায়নি। পরিবর্তনের এই ব্যাপক ডামাডোলে মধ্যবিত্তরা সমাজের পেষণযন্ত্রে সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত হয়েছে। লেখকের 'চার ইয়ার' গল্পটি যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বহুদিন পর এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসের আশেপাশে দেখা হয়ে যায় চার বন্ধুর। চাকরি নেই এদের একজনেরও। কারো ছয় মাস, কারো তিন মাস, কারো তিন দিন আগে চাকরি গেছে। চাকরির বাজারে হাহাকার চলছে কলকাতায়। সবচেয়ে আগে যার চাকরি গেছে সেই হাবুল বলছে – 'লোহা লক্কড় গলে ধুয়ে এ বাজারে একাকার, আমরা কোন ছার' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চার ইয়ার', ২০১৫ক : ১৭০)। 'আমরা' মানে নিম্নবেতনভুক কেরানির দল, যারা ছাঁটাই না হলে আমৃত্যু একই পদে কলম পিষে কষ্টেসৃষ্টে দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে কলকাতার উপান্তে কোনোরকমে একটা টিনশেড বস্তিতে জীবন কাটিয়ে দেবে।

এটুকুই তাদের চাওয়া জীবনের কাছে। আর স্বপ্ন হচ্ছে এক্সিকিউটিভ পদে প্রমোশন। একটু চালাক-চতুর কেরানিদের জন্যই সেসব বরাদ্দ। কথকের বয়ানে :

> আমাদের চেয়ে জোনাকি মাথায় যেমন লম্বা বেশি তেমনি চালাকও বেশি। আমরা ছাঁটাই কথাটা প্রয়োগ করলাম, হাবুল ও আমি। জোনাকি তার অবস্থার কথা ঘুরিয়ে অন্যভাবে ব্যক্ত করল। এবার ও ঠিক এক্সিকিউটিভ হয়ে যেত, তা ফার্ম যদি কুপোকাত হয় তো সে করবে কী, কার দোষ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চার ইয়ার', ২০১৫ক : ১৬৮)

জোনাকিও এক্সিকিউটিভ হতে পারেনি। তার ফার্ম দেউলিয়া হয়ে গেছে। অন্যদের বুঝতে বাকি নেই যে, এ জোনাকির মনগড়া গল্প, নিজের দুরবস্থাকে আড়াল করার চেষ্টা মাত্র; জোনাকিকেও তাদেরই মতো চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। চাকরি গেছে মলয়েরও। তাদের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে মেধাবী, সুদর্শন; বয়সেও ছোট। চাকরিটা জুটেছিল বড়লোক মামাশ্বশুরের জোরে। সেই মামাশ্বশুরেরও পতন ঘটেছে। বস্তুত কলকাতার পুরো মধ্যবিত্ত শ্রেণিই যেন পতনোন্মুখ।

বাকিরা মানিয়ে নিলেও অন্যদের তুলনায় অবস্থাপন্ন মলয় কোনোভাবেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না পরিস্থিতির সঙ্গে। চাকরি হারিয়ে যেন নিজের পৌরুষই হারিয়ে ফেলেছে সে। তার স্ত্রী প্রতিনিয়ত পৌরুষের খোঁটা দিয়ে চলেছে তাকে, বন্ধুদের কাছে স্ত্রীর নামে এমন অভিযোগ দায়ের করে সে। মলয়ের মতো উচ্চপদে চাকরি করে না বলেই বোধহয় পৌরুষের ব্যাপারে অতটা সচেতন নয় অন্যরা। বন্ধুপত্নীর অবিবেচক আচরণের প্রতিবাদ করতে মলয়ের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সবাই। বন্ধুর পক্ষে ওকালতি করতে মলয়ের বাসায় গিয়ে তার স্ত্রীর সহজ স্বাভাবিক ব্যবহারে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে। ঘটনাচক্রে মলয়ের বাসাতেই সবাই খুঁটি গেড়ে বসে। কথকের ভাষ্য অনুযায়ী, এদের কারো জীবনেই কোনো নির্দিষ্ট ছক নেই, তাই নিজ নিজ বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। বরং প্রত্যেকের ঘরে ছোট ছোট অসংখ্য সমস্যার ঢিবি জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছিল, যা থেকে হয়তো নিজেদের অবচেতনেই তারা মুক্তি চেয়েছিল। মলয়ের স্ত্রী মঞ্জু তাদের কাছে মুক্তির প্রতীক হয়ে এসেছে। তারা নিজেরাও যেন এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিল যেখানে লুকিয়ে পড়ে সব সমস্যার কথা তারা ভুলে যেতে পারবে। মলয়ের বাসায় থেকে যাওয়া তাদের দৃষ্টিতে মুক্তির স্মারক হলেও পাঠকের দৃষ্টিতে তা পলায়নপরতা, যা মধ্যবিত্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশই পরিস্থিতির তীব্র চাপে ভেঙে পড়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চায়। বারবার বালিতে মুখ গুঁজে রেহাই পেতে চাওয়া এই শ্রেণি জানে না যে, অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না। তবে এ প্রসঙ্গে সমালোচক রঞ্জনা দত্তের ভিন্ন পর্যবেক্ষণটিও প্রণিধানযোগ্য :

> তাঁর গল্প উপন্যাসের নায়ক মধ্যবিত্ত সমাজ, মধ্যবিত্ত মানুষ। গভীর অবসাদ এবং প্রত্যয়হীন অন্ধকার থেকে উঠে আসা মানুষ। কিন্তু এই সার্বিক ভাঙন দিয়েই বড় কৌশলে অনায়াস দক্ষতায় বিপন্ন এক আত্মজিজ্ঞাসায় উপনীত করেন তিনি। আত্মজিজ্ঞাসা বনাম আত্মবিশ্লেষণ। আত্মশুদ্ধিও বটে। (রঞ্জনা দত্ত ২০০২ : ১৮)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যবিত্তরা অবিবেচক। বাস্তবতাকে না দেখার বা একে উপেক্ষা করার অক্ষম আক্রোশ নিয়ে এরা সমস্যার মুখোমুখি হতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তাদের মেরুদণ্ড বিপর্যস্ত বাস্তবতার আকস্মিক চাপে আগেই ভেঙে গেছে। এতে অবশ্যই তাদের দায় আছে। বছর বছর সন্তান জন্ম দিয়ে, লালনপালন করে, বাস্তবতাকে এরা উপেক্ষা করেছে – এ কথা সত্যি। 'তারিণীর বাড়ি-বদল' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পে তারই দৃশ্যমান রূপ দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ি-বদলের নামে তারিণীর পালিয়ে যাওয়ার সময় পাওনাদারদের সমবেত আক্রমণের ধারাবাহিকতায় ঘাড় ভেঙে রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে হয় তাকে। কিন্তু এর জন্য তারা যতটা দায়ী তার চেয়ে কম নয় সময়ের দায়। যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই সময়টাতে চাকরি চলে যাওয়া, জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী হয়ে ওঠা এবং সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ হওয়াই তারিণীদের পরিণতির জন্য দায়ী। তারিণী তার সন্তানদের এতদিন দুধ পান করিয়ে এসেছে, জামাকাপড় কিনে দিয়েছে, বাসায় কয়লার অভাব হয়নি। হঠাৎ চাকরি চলে যাওয়ার ফলে তার এই পরিণতি। যে-কোনো কলম-পেষা কেরানির এই একই পরিণতি হতে পারত। যারা তারিণীর এই অবস্থায় হুটহাট জানালা বন্ধ করে দিয়েছে, যারা তারিণীকে দেখিয়ে বলছে – 'ওই যে একলা ঠেলতে পারছে না, বউ ছেলেমেয়েগুলোকে রাস্তায় নামাল তার সংসার-তরণীর হাল ঠেলতে' ('তারিণীর বাড়ি-বদল', ২০১৫ক : ২৭১), তারাও মুখ থুবড়ে পড়তে পারে, তারিণীরই মতো। তবু অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, সব দায় যেন তারিণীর একার। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ :

> মধ্যবিত্তের সাধ্য না থাকলেও সাধ পূরণের চেষ্টা থাকে। তারিণীর মধ্যেও তা লক্ষণীয়। সে একটা ভদ্রপাড়ায় সচ্ছল পরিবেশে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। আবার সাধ করে একটি গড়গড়া কিনেছে। তার মধ্যে রয়েছে আত্মসম্মানবোধ। সে ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। সে মধ্যবিত্তের আত্মসম্মানবোধ ও অভিমান বুকে নিয়ে নিম্নবিত্তের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। (দেবশ্রী মণ্ডল ২০১৭ : ১৮৩)

তারিণীর মতো এই অসহায়, অনিকেত ও নিরালম্ব চরিত্রগুলোকে লেখক খর দৃষ্টিতে অবলোকন করেই ক্ষান্ত হননি; তাদের প্রত্যেকের জীবন তিনি নিজেও যেন যাপন করে এসেছেন। এ কারণেই হয়তো তারিণীর বিপদের মুহূর্তে এলাকাবাসীর কদর্য চেহারা ফুটিয়ে তুলতে বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। গল্পের

চরিত্রদের সঙ্গে লেখকের শ্রেণিগত অবস্থানের সাযুজ্যের কথা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেও বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন :

> এটা তো সত্যি কথাই। আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ, কাজেই এই জীবনের সঙ্গে যতটা পরিচয় অন্য জীবনের সঙ্গে আমার অতটা পরিচয় নেই। কাজেই এখানে আমি যতটা দেখতে পাই শুনতে পাই ততটা অন্য জীবনে নয়। সুতরাং এখানে আমার কলম বেশি করে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর এটা তো ডেকাডেন্স, অবক্ষয়েরই যুগ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০০৪ : ৩৩)

নারীর প্রতি মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নারীদের ব্যাপারে মধ্যবিত্তের বিচিত্র সংস্কার প্রায়শই সক্রিয়। ঔপনিবেশিক শাসন ও সমাজ-সংস্কারের প্রভাবে প্রতিবন্ধকতার অজস্র অর্গল ছিন্ন করে নারীরা বেরিয়ে আসতে চাইলেও সমাজ ও সংস্কারের অন্ধকার অচলায়তন থেকে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে পারেনি; এমনকি এখনো সেই সর্বাঙ্গীণ মুক্তি দূরপরাহত। সংস্কারাচ্ছন্ন ক্ষমতাশালী পুরুষদের বৃহদংশ নারীকে বরাবর ঘেরাটোপের অন্তরালে আটকে রাখতে চেয়েছে। আবার আবহমান কাল ধরে ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, সর্বোপরি পিতৃতান্ত্রিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে থাকতে নারীদের মধ্যে ভয় ও জড়তা তৈরি হয়েছিল। যেসব ক্ষেত্রে পুরুষেরা সরাসরি সংঘাতে যেতে ব্যর্থ হয়েছে সেখানে তারা নারীকেই নারীর প্রতিপক্ষ ভূমিকায় ঠেলে দিয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ নারীরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়া নারীর পথ আটকে পুরুষদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছে। এমনকি এগিয়ে যেতে চাওয়ার অন্ধ তাড়নায় অনভিজ্ঞ নারীরাও ভুল পথে ধাবিত হয়ে বারবার নিজেদের পতন ডেকে এনেছে, নিজেরাই নিজেদের উত্তরণকে বাধাগ্রস্ত করেছে। পুরুষেরা সেসব ভুলের সুযোগ নিয়েছে, উপহাস করেছে, অবজ্ঞা করেছে, এসব উদাহরণ তুলে ধরে ক্রমাগত ভয় দেখিয়ে গেছে নিজেদের অধীনে থাকা নারীদের।

তবে নারীর অগ্রযাত্রায় সময় একটা বড় নিয়ামক হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন যুদ্ধ ও মন্বন্তরে বিপর্যস্ত সমাজে কল-কারখানায় কাজের সুযোগ নারীকে প্ররোচিত করেছে অন্দরের অন্তরাল থেকে রাস্তায় নেমে আসতে, তেমনি অপরদিকে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমাজের জড়তাকে দূর করেছে কখনো কখনো। অভাব ত্রাতার বেশে দোরগোড়ায় হাজির হয়ে রাস্তায় টেনে নামিয়েছে নারীকে। পুরুষেরাও আর সমাজ-সংস্কার-ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। এত বছরের অচলায়তনের অবকাঠামো হঠাৎ ভেঙে পড়ায় নারীকে বহুমুখী সংঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে একদিকে যেমন আলো-আঁধারির সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকা এই নারীদের জটিল মনোজগতের আভাস পাওয়া যায়, অন্যদিকে তাদের উপর সমাজব্যবস্থার নানা মাত্রার চাপ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সময়ের দাবির কাছে কোণঠাসা সমাজপতিরা নারীদের এই উত্তরণ মেনে নিতে বাধ্য হলেও নারীর ক্রমশ স্বাধীন হয়ে ওঠাকে তারা মন থেকে স্বীকৃতি জানাতে পারেনি। তাই নারীর মুক্তিকে তারা প্রকারান্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা হিসেবেই সাব্যস্ত করে এসেছে। 'নদী ও নারী' (প্রথম প্রকাশ : *পরিচয়* ১৯৩৬, *খেলনা* ১৯৪৬) গল্পে *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর পাতা উল্টে যাওয়া সুরপতি বড়শি ফেলে মাছ ধরতে থাকা নারীটির বেশভূষা দেখে তাই অম্লানবদনে বলে বসে :

> '– দেখো ওসব ঢের দেখেছি, যাকে বলে ফাঁপা বেলুন। . . . সত্যি বলছি ওদের কেবল ঠাট আর ঠমক। . . . অত বড় ধিঙ্গি মেয়ের আবার বব্ড কাট চুল, যেন কচি খুকি।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'নদী ও নারী', ২০১৫ক : ৫)

নিজেদের অলঙ্ঘ্য প্রাচীরে ঘিরে রেখে সমকালীন পৃথিবীর দিক থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে রেখেছে সুরপতিরা। পুরুষ সঙ্গীবিহীন একাকী নারীটিকে নদীর চরে একা পাখি শিকার করতে দেখে স্ত্রী নির্মলার 'বাবু কে, বলে যে গেল ও?' প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিতময় গূঢ় হাসি দিয়ে তাই কুণ্ঠাহীন বলতে পারে, 'হবে আর কী কেউ, – দুয়েক জন ওঁরা সঙ্গে নিয়ে ঘোরাফেরা করেন' ('নদী ও নারী', ২০১৫ক : ১০)। বস্তুত 'পরিচয়ের সীমিত গণ্ডির বাইরে এই নদী যেমন অস্বস্তি জাগায়, তেমনি এই খাপছাড়া নারীও মধ্যবিত্ত পরিধিতে অস্বস্তির কারণ' (তপোধীর ভট্টাচার্য ২০১৭ : ৩৩২)।

নারীর স্বতন্ত্র সত্তা এদের পুথিপড়া চিন্তার জগতে নতুন কোনো অভিঘাত তৈরি করে না। নারীকে তারা নির্মলার ভূমিকাতেই দেখতে চায় – আজ্ঞাবহ দাসের মতো স্বামীর ধুতির খুঁট ধরে পেছন পেছন চলবে। অপরদিকে তার স্ত্রী নির্মলাও একই জগতেরই আরেকটি অশিক্ষিত প্রতিনিধি। আলো যেন এখানে আঁধারিতে রূপ নিয়েছে। তাই নির্মলা অজানা অপরিচিত জায়গায় রাতে নৌকায় বসে গান গাইতে থাকা নারীর জাত নিয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠে। ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত হলেও তা না হয় মেনে নেওয়া যেত, কিন্তু তাদের চোখে এ যে একেবারে সস্তা থিয়েটারি গলা। অথচ গল্পের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে তারা যখন উচ্ছলা নারীটির প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে তখন তারা আবেগে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সংস্কারের অন্ধকূপের বাইরের তীব্র সম্ভাবনা ও জীবনবাদ তাদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে দেয়।

অপেক্ষাকৃত সুবিধাভোগী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হয়ে সুরপতি যেখানে নারী সম্পর্কে নিজের মানসিকতা বদলাতে পারে না, সেখানে অল্পশিক্ষিত ছাপোষা মধ্যবিত্ত বাঙালি যে আরো রক্ষণশীল, আরো সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হবে, তা বলা বাহুল্য। 'সমতল' গল্পের নায়িকা ছবি টিউশনের বিজ্ঞাপন দেখে খোঁজ

নিতে গেলে গৃহকর্তা জানায় তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ুয়া শিশুকন্যাকে চরম দুর্ভাবনাবশত স্কুল ছাড়িয়ে এনেছে, কারণ তার সন্দেহ মাস্টারনিরা ঠিক অনুকরণযোগ্য নন। কন্যার জন্য তরুণী গৃহশিক্ষিকা রেখে তার চরিত্র নষ্ট করতে তিনি নারাজ :

> 'ঘরে বাইরে দু'জায়গায়ই গতিবিধি তো? . . . না, মাফ করবেন, আমি খুঁজছি যিনি পাঁচ সন্তানের মা, চুল পেকে গেছে, রিকশ-য় করে মেয়েকে পড়াতে আসবেন ফের রিকশ-য় করে বাড়ি চলে যান।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সমতল', ২০১৫ক : ৩৯)

চার দেয়ালে অবরুদ্ধ শিশুকন্যাকে নিয়ে গৃহকর্তাটির এই দুশ্চিন্তা মূলত তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের সামগ্রিক ভাবনা-জগতেরই একটি খণ্ডাংশ, গহিন সুড়ঙ্গের দৃশ্যমান অংশ মাত্র। 'বনানীর প্রেম' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কথকের মুখ দিয়ে শ্লেষের সুরে সরাসরি বলিয়ে নেন :

> হিতৈষী আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, মেয়েরা ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই পয়সা আনতে পারছে সুন্দর। ওদের টাকা খুঁজতে হয় নাকি, টাকা ওদের খুঁজছে। এটা মেয়ের যুগ। একটু সাহস থাকলেই হল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বনানীর প্রেম', ২০১৫ক : ৪৮১)

শত শত বছর ধরে ভারতবর্ষে নারী ভোগ্য উপকরণ, পুরুষের অধীনে থেকে পুরুষের কামনা-বাসনাকে পরিতৃপ্ত করাই যেন তার প্রধান দায়িত্ব। তার নিজের কোনো সত্তা নেই, আত্মা নেই; তার রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা-পাঁজর সব পুরুষের; পুরুষের পাঁজর থেকেই তো তার উৎপত্তি। সে পুরুষের শোভা। ধর্ম পুরুষকে এই অধিকার দিয়েছে। প্রচলিত কিছু আচার-অনুষ্ঠানের উৎসবমুখরতা দিয়ে সমাজ পুরুষের এই অধিকারকে সিদ্ধ করেছে। এত প্রলোভন, সম্মোহন, ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও ধর্মের বাঁধন যখন রুখতে পারল না তাদের, নৈতিকতার কৃপাণ হাতে পুরুষ নিজেই দাঁড়িয়ে গেল ধর্মের সারথি হয়ে। তবুও নারীকে আটকাতে না পেরে শেষে শ্লেষ-বিদ্রুপ-উপেক্ষার বাণে তাকে শতচ্ছিন্ন করতে চাইল, বশ করতে না পেরে বারবণিতা বানাবার চেষ্টা করল। ক্ষয়িষ্ণু পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার এই অনাচারকে একজন সৃষ্টিশীল লেখক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী উপেক্ষা করতে পারেননি। এমন নয় যে, তিনি তাঁর গল্পে নারীমুক্তির কোনো বার্তা দিতে চেয়েছেন। সমকালীন বাস্তবতাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে তাঁর লেখায় সমাজের অংশ হিসেবে নারীর উত্তাল অগ্রযাত্রার বিভিন্ন অভিঘাত এভাবে ফুটে উঠেছে। 'গিন্নিকে যে পুরুষ শাসন করে না আমি সেগুলোকে মেষ বলি' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২৩০) – 'বন্ধুপত্নী' গল্পের ছাপোষা কেরানি সুবিনয় নিজের স্ত্রী সম্পর্কে দম্ভের সঙ্গে বন্ধুকে এ কথা বলতে পারে; কারণ সমাজ

তাকে এই স্বীকৃতি দিয়েছে। পতি শব্দটির সঙ্গে দেবতা যোগ করে দিয়ে সমাজই এদের নিয়ন্ত্রকের আসনে বসিয়ে রেখেছে যুগ যুগ ধরে। স্ত্রী নামক যানটিকে তারা যেভাবে চালাবে সে সেভাবেই চলতে বাধ্য। কারণ সে তার দাসী, তার বিনোদনের পুতুল। দর্জিপাড়ার ঘিঞ্জি গলি আর ফার্ন রোডের মতো ভদ্রপাড়াতে এটা সমান সত্য। কেবল ভাষার প্রয়োগটি সেখানে মার্জিত, শাসনের সুরটি কিঞ্চিৎ কোমল :

> 'তুমি চাকরি করবে কোন দুঃখে! এখনই চাকরি করতে তোমায় আমি দেব কেন!'
>
> নিজের পৌরুষের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে অসিত কুন্তলাকে নিবৃত্ত করেছিল।
>
> কুন্তলাও দ্বিতীয়বার এ কথা উত্থাপন করেনি।
>
> কেননা, বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার ইচ্ছাটা স্ত্রীরা যত বেশি গোপন ও সংক্ষিপ্ত রাখে, এ দেশে তত বেশি ভাল। কুন্তলাও চুপ রইল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ইস্ত্রি', ২০১৫ক : ৪৩১)

'ইস্ত্রি' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে অসিতের নিজের চাকরি নেই। কুন্তলা তার এক আত্মীয়ের মারফত একটা চাকরির সুযোগ পেলে অসিত পৌরুষের বলে বলীয়ান হয়ে কুন্তলাকে এ কথা বলে। এর কারণ সহজেই অনুমেয়। কুন্তলার চাকরি মানে সমাজের কাছে অসিতের অসমর্থ পুরুষ হিসেবে প্রতিভাত হওয়া। কুন্তলার চাকরি মানে কুন্তলার স্বাধীনতা, যা এই সমাজের চোখে স্বেচ্ছাচারিতা; পুরুষতান্ত্রিক এই সমাজের দৃষ্টিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারা। চাকরির সুযোগে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা নিয়ে সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা। অসিতও তা জানে, নিজে কুন্তলার চাকরির ব্যাপারটিকে প্রশ্রয় দিলেও এই সমাজের বাঁকা দৃষ্টির সামনে তার টিকে থাকা দুষ্কর হবে। সবাই যেন এই বদ্ধ বাতাসে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। তাই গল্পের শেষে কাপড় ইস্ত্রি করাতে নিয়ে আসা যুবক তার স্ত্রীর বরাত দিয়ে বলে – "বলছিল, 'কে দেখে তোমার ধোয়া পাঞ্জাবি, জামার ইস্ত্রি? যদি দেখতোই তো বড় সাহেব এই দু'মাসে আমার মাইনে দু'বার না বাড়িয়ে তোমার মাইনেই বাড়াত –" ('ইস্ত্রি', ২০১৫ক : ৪৩৯)। বড় সাহেবও একই সমাজব্যবস্থার মানুষ। কিন্তু নিজের স্ত্রী-কন্যাকে ঘরে আগলে রেখে চাকরি করতে আসা পরনারীর দিকে সে তার লোভাতুর দৃষ্টি মেলে তাকাবে। এই হলো নারী প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গি যাকে তৎকালীন সমাজের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিও বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেন :

> পেশা-রুচির রূপান্তর ব্যাপক হারে মহিলাদের চাকরিতে যোগদান ঔপনিবেশিক কলকাতায়, শুধু কলকাতাই বা কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে অনভ্যস্ত সমাজ সেভাবে মেনে নেয়নি। পেশা ও রুচির রূপান্তরের দিনে আমাদের সমাজে মেয়েদের এই

> চাকরি গ্রহণের মধ্য দিয়ে জীবনের রূপান্তর ছিলো বহুধাবিভক্ত। (বরেন্দু মণ্ডল ২০০৪ : ১৩৪)

শুধু বাইরেই নয়, অন্দরেও নারী সমান বিপন্ন। ঘরের ভেতর তার ভূমিকা দাসীর। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যাওয়ার বিনিময়ে ন্যূনতম সম্মানটুকু তার বরাতে জোটে না। 'কমরেড' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে লেখক শ্লেষের স্বরে কথকের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন :

> যুদ্ধে না গিয়ে তোমার উপায় আছে বাঙালিতনয়া? পাঁচটি অপোগণ্ডের মুখে দুধ জুগিয়ে, স্বামীর অফিসের রান্না নামিয়ে, ননদ-জার সঙ্গে ঝগড়া করতে কত কুরুক্ষেত্র জীবনের উপর দিয়ে যাবে-আসবে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কমরেড', ২০১৫ক : ৪৬৩)

এভাবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নারী প্রসঙ্গে বিষাক্ত হয়ে ওঠা মানুষের কথা লিপিবদ্ধ করেন, যাদের সন্দেহ হীনতম পর্যায়ে পৌঁছেছে, যারা সম্পর্কের সৌন্দর্য পরিমাপ করতে পারে না। সন্দেহ, হিংসা আর অনিষ্টের ভয় যাদের ক্লান্ত করে ফেলেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর কথাসাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিকে বরাবরই নির্দয়ভাবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু লেখকের ভাষার গভীরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে এর পেছনের গূঢ় উদ্দেশ্যটি ক্রমশ পরিষ্কার হয়। যে মধ্যবিত্ত নিজেদের ঘা-গুলো ঢেকে রেখে নিজেকে সুস্থ প্রমাণে মরিয়া, অথচ চিকিৎসার কোনো সুরাহা করতে পারছে না, তার সেই ঘা-গুলোর কদর্যতাকে তুলে ধরে সমাজ তথা পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন তিনি। এই ঘা সমাজের সামগ্রিক অবক্ষয়েরই ফলাফল, যা মধ্যবিত্তকে সবচেয়ে বেশি হতচকিত করে তুলেছে। তিনি নিজেও জানেন, সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো এর চিকিৎসা হবে না, তবে সমস্যা চিহ্নিত হয়ে থাকলে সমাধান আজ না হোক ভবিষ্যতে একদিন হবে, একদিন সব ক্ষত ঠিকই সেরে উঠবে। এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই হয়তো তিনি মধ্যবিত্তের সমস্ত উৎকট রূপ দেখিয়ে দিতে চান।

পূর্বেই বলা হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যবিত্ত বহুধাবিভক্ত। বহু তার শাখা-শ্রেণি, অনিয়মিতভাবে যে যার মতো বেড়ে উঠেছে। বেড়ে ওঠার এই অমার্জিত আকাঙ্ক্ষাকে পরিপুষ্ট করতে গিয়ে বেসামাল হয়ে কদর্য করে তুলেছে নিজেদের। ভেতরের ক্ষরণ বৃদ্ধি পেতে পেতে মরণের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তারা – যার প্রতিকার প্রয়োজন। আর প্রতিকারের জন্য প্রথমে দরকার সমস্যাকে চিহ্নিত করা। সে যুগে লেখকদের হাতেই ন্যস্ত ছিল এসব সমস্যাকে চিহ্নিত করার ভার। এখন সমাজের নানা অসংগতিকে নির্দেশ করতে জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা সক্রিয়। তারপরও লেখকদের গুরুত্ব বিন্দুমাত্র

কমেনি, বিশেষ করে তাঁদের যাঁরা নিছক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সাহিত্যচর্চা করেন না। তাঁরা দায় নিজের ঘাড়ে নিয়ে উন্মোচিত করেন ঘুণে-ধরা সমাজের চিত্র। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বাংলা সাহিত্যের তেমনই একজন লেখক। তাঁর সম্পর্কে আর এক সমাজঘনিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক সমরেশ বসুর পর্যবেক্ষণটি যথাযথ : 'অনেক ছোট গল্পেই তাঁকে আমরা দেখেছি স্রষ্টা হিসাবে তিনি আমাদের সমস্ত বানানো সৌকর্য সৌন্দর্যকে কীভাবে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন, অত্যন্ত নিরাসক্ত নির্বিকার দৃষ্টি নিয়ে' (সমরেশ বসু ১৪১৬ ব. : ৩৫০)।

দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যবিত্তরা প্রায়শই পারিপার্শ্বিক বিরূপতার সামনে অসহায় ও দিশেহারা। মধ্যবিত্ত বলা হলেও এরা মূলত নিম্নমধ্যবিত্ত। এরা দারিদ্র্যের সামান্য দূরত্বে আজীবন পরিত্রাণহীন থাকে। নিজেদের সংকটের মধ্যে হাঁসফাঁস করতে করতে এদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এরা উত্তরণ পেতে চায় প্রায়শই, কিন্তু সে রাস্তাও সংস্কারের কণ্টকাকীর্ণ। কেউ কেউ সেই সংস্কার মানতে না চাইলেও তাকে অস্বীকার করার উপায় তাদের অজানা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ নারীকে সংস্কারের অজুহাতে ঘেরাটোপে আটকে রাখতে চেয়েছে। তবে অভাব-অনটন যেন রক্ষাকর্তা হয়েই নারীকে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়েছে কখনো কখনো। জ্যোতিরিন্দ্রের এই মধ্যবিত্তরা অন্যের অধিকতর সংকট দেখে প্রশান্তি লাভ করে; আরো অনেকে যে তাদের চেয়ে নিচু অবস্থানে আছে তা তাদের বেদনার খানিকটা উপশম ঘটায়। এটাও সত্য, সময়টাই ছিল এমন। যুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ – সব মিলিয়ে কঠিন সময় ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে মধ্যবিত্তকে, ধ্বসিয়ে দিয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে। সমস্যার এই অন্তহীন আবর্তে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যবিত্তরা কোনো প্রকারে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে বলে এর থেকে উত্তরণেও অনেকের আলস্য। আবার কখনো কখনো এদের রুচি, শিক্ষা ও সংস্কার পরস্পরবিরোধী হয়ে ওঠে। প্রচলিত অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার বন্ধন ছিন্ন করে কেউ পরিত্রাণ খুঁজেছে। সংস্কার ও ক্ষুধার মধ্যে ক্ষুধার জয় ঘোষিত হয়েছে, যদিও তাতেও বীরত্ব প্রকাশের কোনো অবকাশ রাখেননি জ্যোতিরিন্দ্র। তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত প্রায় প্রতিটি চরিত্রের প্রতিমুহূর্তের যাপনেই তাদের ক্রমশ তলিয়ে যাওয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবসময় এদের চূড়ান্ত পতনকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ না করলেও লেখক তার ইঙ্গিতটুকু রেখে গেছেন পাঠকের জন্য। নিজের সহজাত সাবলীল লেখনভঙ্গিতে তাদের হতবিহ্বল বিপর্যয়কে, প্রাণপণে টিকে থাকার চেষ্টাকে, এমনকি অসহায় আত্মসমর্পণকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন অনুপুঙ্খসমেত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারী মনস্তত্ত্ব

বাংলা ছোটগল্পে নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে একটা বিবর্তনের ধারা লক্ষ করা যায়। এই বিবর্তনের নেপথ্যে ক্রীড়নক ছিল সময়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে জগদীশ গুপ্ত, পরবর্তী পর্যায়ে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৎপরবর্তী সময়ে অর্থাৎ তিরিশের দশকে *কল্লোল*, *কালি-কলম*, *প্রগতি* প্রভৃতি গোষ্ঠীর নারী চরিত্রের সঙ্গে পূর্বতন লেখকদের নারী চরিত্রের ব্যবধান স্পষ্টভাবে দৃশ্যগোচর হয়। এই নব্য লেখকদের কলমে যেসব নারী চরিত্র নির্মিত হচ্ছিল তারা সংস্কারের দিক থেকে পূর্বসূরি লেখকদের নারী চরিত্রের চেয়ে বহুলাংশে স্বাধীন ও ব্যতিক্রম। পূর্ববর্তী লেখকদের কলমে নারী সংস্কারের বন্দিত্বে আবদ্ধ, সেখানে নারীর কোমল রূপ – অর্থাৎ মাতৃ কিংবা জায়ারূপ – যতটা প্রকটিত, প্রেমিকারূপ ঠিক ততটাই প্রচ্ছন্ন। এঁদের নারীরা পরমসহিষ্ণু, কখনো প্রচণ্ড অভিমানিনী হলেও সেই অভিমানের প্রকাশে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতেও তারা পিছপা হয় না। 'মরণ!' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শাস্তি', ১৪২৪ ব. : ১৭২)-এর মতো উচ্চারণ দিয়ে তাদের অভিমান ভালোবাসার খাতায় তুলে রেখে যায়, কিন্তু সহিষ্ণুতা তাদের ললাটলিখন। বঙ্কিমের কুন্দনন্দিনী (*বিষবৃক্ষ* ১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথের কাদম্বরী ('জীবিত ও মৃত' ১২৯৯ ব.), শরৎচন্দ্রের বিরাজ-বউ (*বিরাজ-বউ* ১৩২৩ ব.), তারাশঙ্করের পদ্মবউ ('পদ্মবউ'), বিভূতিভূষণের উমারাণী ('উমারাণী' ১৯৩১) – এরা কম-বেশি সকলেই সেই সংস্কারাবদ্ধ সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। মাঝেমধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৌরীফুল' (১৯৩২)-এর সুশীলা কিংবা জগদীশ গুপ্তের 'প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী'র (১৩৬৫ ব.) জসিমের বউয়ের দেখা মিললেও এদের উপস্থিতি নিতান্তই নগণ্য। তবে পরবর্তী পর্যায়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশলী লেখনীতে রচিত হয়েছে অতসী মামী, রমা ('ফাঁসি' ১৯৩৫), চারু ('সরীসৃপ' ১৯৩৩) প্রমুখের ব্যতিক্রমী আখ্যান। বাংলা গল্প ও উপন্যাসে – অর্থাৎ কথাসাহিত্যের উভয় শাখাতেই – নারী হৃদয়ের দিকে পাঠক দৃষ্টিপাত করতে বাধ্য হয় মূলত মানিকের বদৌলতে। এর পাশাপাশি গতানুগতিকতার বাইরে নারীর ভিন্ন স্বরকে চিহ্নিত করার প্রয়াস নেন তিরিশের লেখকগোষ্ঠীও।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের গোড়ার দিকে নারীর স্বতন্ত্র চিত্রায়ণে এ গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও নারীকে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের সূচনা হয়েছে মূলত বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে। পরবর্তীকালে চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে তা ব্যাপ্তি লাভ করে এবং ষাট ও সত্তরের দশকে পরিণতি লাভ করে নারীর একটি বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয় বাংলা সাহিত্যে। এর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল বিশ্বব্যাপী নারীর সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন, যার তরঙ্গ ভারতবর্ষকেও আলোড়িত করেছে।

ইতোমধ্যে ভারতবর্ষের সংবিধানে নাগরিক হিসেবে নারীদের পুরুষের সমানাধিকারের পাশাপাশি ভোটের অধিকারও নিশ্চিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নারী অধিকার রক্ষায় বিশেষ কিছু আইন – যেমন, নারী অধিকার সংরক্ষণে বিশেষ আইন (১৯৫৪, সংশোধিত ১৯৭০), বিশেষ বিবাহ আইন (১৯৫৪), হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (১৯৫৬), যৌতুক প্রতিষেধ আইন (১৯৬১), প্রসূতি কল্যাণ আইন (১৯৬১) প্রভৃতির কারণে এবং নারীশিক্ষার প্রসারের ফলে নারীর সামাজিক অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। শিক্ষার অধিকার রক্ষা এবং আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার ফলে তাদের মানসিকতায়ও প্রভূত পরিবর্তন আসে। সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙার প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলত পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে বাংলা সাহিত্যে নারীর এক ভিন্ন রূপ দৃশ্যগোচর হতে শুরু করে। এর একটি স্মরণীয় উদাহরণ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প 'অবতরণিকা' (১৯৪৯), যেটিকে পরবর্তীকালে *মহানগর* (১৯৬৩) নামে চলচ্চিত্রায়িত করেন সত্যজিৎ রায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র 'শবরী' (১৯৬৩) গল্পে লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়া সংগ্রামী সুমিতার কাহিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কনে দেখা আলোয়' (২০১৪) গল্পে রচনা করেছেন জীবনযুদ্ধে হার না-মানা মিনুর উপাখ্যান। সমাজে নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে সূচিত এসব পরিবর্তন প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> . . . নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে নতুন নতুন ক্ষেত্রে শিক্ষিত মেয়েদের কর্ম সংস্থানের সম্ভাবনা খুলে যায়। কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অধিকার ও সুযোগ স্বীকৃত হয়। সর্বোপরি অর্থনৈতিক চাপের মুখে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মেয়েদের বাইরে বেরিয়ে কাজ করার বিপক্ষে প্রচলিত সংস্কারের অবসান ঘটে। আইনী অধিকার যেমন মেয়েদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমনি মেয়েরা নিজেরাও মানসিকভাবে নিজেদের অনেকখানি বদলে ফেলেছে। সামাজিক স্বীকৃতি আদায়ের দাবি এবং অর্থহীন বাঁধন ছেঁড়ার প্রয়াস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। (শম্পা চৌধুরী ২০১৭ : ৮৪)

এদিকে ইতঃপূর্বেই ব্যতিক্রম জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্যের নারীরা। তারা দারিদ্র্যের কশাঘাত মানতে নারাজ, অধৈর্য ও অসহিষ্ণু এবং যে-কোনো প্রকারের মহিমাবর্জিত। মোটামুটিভাবে চল্লিশের দশক থেকে সাহিত্যিকদের মধ্যে নারীকে ভিন্নভাবে দেখার প্রয়াসের সূচনা হয়েছে এবং তাঁদের কলমে যে নারীদের কথা রচিত হচ্ছে তাদের অনেকেই পূর্বতন কিংবা পরবর্তী বহু নারীর মতো সংস্কারের নিগড় থেকে মুক্তি পেতে বদ্ধপরিকর নয়। এদের কেউ কেউ অর্থনৈতিক চাপে বাধ্য হয়ে জীবিকার অন্বেষণে ঘরের বাইরে পা ফেলে যেমন সমাজের বদ্ধমূল সংস্কারে প্রবল কশাঘাত করছে, তেমনি আবার সমাজও সেই নারীদের দিকে হানছে সমান প্রত্যাঘাত। তদানীন্তন সময়ের নারী জাগরণের সুলুক সন্ধানে

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সম্ভবত আগ্রহী ছিলেন না, তদুপরি শূন্যগর্ভ জীবনযাপন সম্পর্কে তাঁর নারী চরিত্রদের মধ্যে বিতৃষ্ণাও লক্ষ করা যায়। যদিও এদের অনেকেই অতিমাত্রায় ঘরণী, পরমসহিষ্ণুতা এদের মজ্জাগত ধর্ম। স্বীকৃত অধিকার আদায়ে এদের কণ্ঠ উচ্চকিত নয়, তথাপি এদের মানসিকতার গহিনে অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, এরা প্রকৃত স্বাধীনতাকামী – আত্মপ্রেমে, কামে। যার ফলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' (১৯৫৬) গল্পের মায়া নিজের তরুণ স্বামীর গৎবাঁধা প্রশংসা ও শারীরিক পেষণে – যদিও সেটি নির্মম নয় – একঘেয়ে বোধ করে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের সামনে অনাড়ষ্টভাবে নিজের সৌন্দর্য মেলে ধরে। 'ক্যামাক স্ট্রিটে' (১৯৫৫) গল্পের লাভলি পুরুষের হাসি পছন্দ না হলে ভালোবাসতে পারে না, এমনকি সেই কারণে বিবাহবিচ্ছেদের মতো সাহসী পদক্ষেপও নিতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। 'চড়ুইভাতি'র (১৯৫৪) মল্লিকা কেবল স্বামীকে লুকিয়ে প্রেম করেই ক্ষান্ত নয়, সে প্রেমিকের উপস্থিতিতেই অন্য পুরুষের সঙ্গ উপভোগ করতে পারে অবিচলিতভাবে। ইতঃপূর্বে রচিত সাহিত্যে নারীদের প্রকাশভঙ্গি থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী হয়তো এই পর্যবেক্ষণে উপনীত হয়ে থাকতে পারেন যে, নারীর অবদমন প্রশমনের প্রসঙ্গটি বাংলা গল্পে অনেকটাই অনালোচিত। এবং সেই বিশেষ প্রসঙ্গটির উপস্থাপনায় জ্যোতিরিন্দ্র যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে খুব একটা সুলভ নয়। অন্তর্গত বঞ্চনাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যেই সম্ভবত নারীর বহিরঙ্গের স্বাধীনতার রূপায়ণ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ স্বাধীনতার দিকে অভিনিবেশ দিয়েছেন তিনি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারী চরিত্রগুলো ভাবনা ও বৈচিত্র্যের অফুরন্ত ভান্ডার। সমূহ প্রাত্যহিকতা নিয়েই তাঁর নারীরা যেন হয়ে উঠেছে জীবন-রহস্যের অপার আধার। আটপৌরে চলন সত্ত্বেও গল্পজুড়ে তাদের প্রাণস্ফূর্তি লক্ষণীয়। সংসারের মৃদু আলোর বাইরে নিজেদের একান্ত আঁধারে এসে দাঁড়ালে তাদের অন্তর্গত বহুমাত্রিক রূপ আরো উদ্ভাসিত, আরো উন্মোচিত হয়ে ওঠে। মাতা-স্ত্রী-প্রেমিকা – এ সকল রূপ তুচ্ছ হয়ে যায় তাদের নারীরূপের কাছে। প্রকৃতির মৌল শক্তি নিয়েই নারীত্বের যে বিশ্বজনীন প্রকাশ তা জ্যোতিরিন্দ্রের নারী চরিত্রের মধ্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। সেখানে কোনো আরোপিত ব্যাপার নেই। প্রথমদিকের কয়েকটি গল্পগ্রন্থে সেই রূপটিকে প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখকের নিরীক্ষা-প্রয়াসকে মেনে নিলে তাঁর পরবর্তী গল্পগ্রন্থগুলোতে নারীর অধীশ্বরী রূপটির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। সেই রূপের একটা দিক চণ্ডালিনী হলে অন্যটি ভুবনমোহিনী, একপিঠ প্রেমিকা হলে উল্টোপিঠ স্বৈরিণী। 'বন্ধুপত্নী' (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পের কথক সুধাংশুর বয়ানে যেন তারই প্রকাশ দেখা যায় :

> আশ্চর্য! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেয়ার ন্যূনতম চেষ্টা না করে ধীর ঠান্ডা গলায় বলল, 'এ মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর

জামাকাপড় করাতে হবে, ছি ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, ওই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে! (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২৩৯)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারীদের কেউ কেউ সংসারের বাঁধনকে দৃঢ় করার জন্যই সংস্কারের আঁটুনি কখনো কিঞ্চিৎ আলগা করে দেয়। কিছুটা সামাজিক অভিজ্ঞতা আর কিছুটা নিজস্ব বাস্তবতা থেকে তারা এ বিদ্যা রপ্ত করেছে। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আভাস থাকলেও নারীর পরিপার্শ্বিকতা থেকে মনে হয়, ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় তাদের আগ্রহ নেই; সংসারের সচ্ছলতার জন্য এ ক্ষেত্রে তারা কিছুটা প্রশ্রয়প্রবণ। 'বন্ধুপত্নী' গল্পের অরুণা যেন তারই যথার্থ উদাহরণ। তাই সুধাংশুর জানালার বাইরে থেকে কনুই গলিয়ে দিয়ে সে বলতে পারে, টাকাপয়সা যা দেওয়ার তা যেন তার হাতেই দেওয়া হয়, তার স্বামীর হাতে নয়। না, তার স্বামী সুবিনয়ের কোনো বাজে নেশা নেই যে সে ভয় পাচ্ছে সুবিনয় টাকাটা উড়িয়ে দেবে, বরং অরুণাকে চশমা কিনে দেওয়ার জন্য টাকাটা খরচ করে ফেলবে বলেই সে শঙ্কিত। স্বামীকে অফিসে একটু ভদ্রস্থ বেশভূষায় পাঠানোর জন্য টাকাটা তাই তারই প্রয়োজন। পরিবারের সচ্ছলতার স্বার্থে উভয় দিকে ভারসাম্য রক্ষাকারী এই নারী চরিত্রটি বিচিত্র অথচ বাস্তব।

অপরদিকে একই গল্পেই সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী নারী চরিত্রও রয়েছে। সেটিও মধ্যবিত্ত বাঙালি নারীর আরেকটি রূপ। যারা জীবনের চতুর্মুখী চাপ সামলাতে না পেরে স্বার্থের কাদামাটিতে পা হড়কায় বারংবার, সুধাংশুর স্ত্রী রেবা এমনই একজন। নতুন সংসারকে পায়ে ঠেলতে সে অজুহাত খাড়া করে :

এতটা নীচ আমি হতে পারব না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাসা করেছি, কিন্তু তা বলে কাকুর পরিবারের ভাল-মন্দ-সুখ-দুঃখ জলে ভাসিয়ে দিয়ে আমি স্বামী সঙ্গ করতে আজই এখানে ছুটে আসব – মরে গেলেও তা পারব না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বন্ধুপত্নী', ২০১৫ক : ২২০)

বলা যায়, স্বাধীন নারীর এ আরেকটি রূপ, যে কারণে রেবার আর সংসার করা হয় না। সে তার পূর্বতন পরিবারের টানে বেনারসেই থেকে যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথমদিকের গল্পে আরেক ধরনের নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়, যারা কেরানি মধ্যবিত্তের স্ত্রীদের থেকে ধনে-মানে খানিকটা উঁচু, অপেক্ষাকৃত অভিজাত। সংসারধর্ম পালনের ক্ষেত্রে তারা সামাজিক বিধি-নিষেধ মান্য করতে বাধ্য হলেও গোপনে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে স্বস্তি পেতে চায়। পরিবারের পুরুষদের স্খলনের ঢেউ তাদের হৃদয়েও শিহরন জাগিয়ে তোলে। কখনো আক্ষেপ, কখনো-বা আক্রোশ থেকে তারাও ভেসে যেতে উদ্যোগী হয়ে ওঠে; নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গোপনে পুরুষের কাছে সমর্পিত হয়। তাদের কাছে সংসার তখন শুধুমাত্র একটা পারিবারিক

প্রতিষ্ঠান, যেখানে যে যার দায়িত্বটুকু পালন করে চলে, মায়ার টান কিংবা ভালোবাসার স্থান সেখানে নেই। তাই অফিসের টাইপিস্টের সঙ্গে বাবার বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক প্রসঙ্গে মায়ের বিরক্তির বর্ণনা করতে গিয়ে মেয়ে নির্লিপ্তভাবে বলে :

> উঃ, বড় একটা গ্রাহ্য করত কিনা মা অফিসের ওই শাকচুন্নি-পেতনিগুলোকে! মা জানত, হাজারটা ডলি এসেও বাবাকে মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। বাবা আবার মা'র কাছে ফিরে আসবেনই। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'স্ট্যাম্প', ২০১৫ক: ১৯০)

'স্ট্যাম্প' (*চার ইয়ার* ১৯৫৫) গল্পের রত্না নামের চরিত্রটির এই সংলাপে সত্যের সম্পূর্ণ আলাদা দুটো চেহারা দেখতে পাওয়া যায়। প্রেমহীনতা আর প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাজ ও এর শাখা হিসেবে পরিবারের বজ্রআঁটুনিও আঁচ করা যায় রত্নার এই কথায়। পরিবার বা সমাজ ডলির মতো হাজারটা টাইপিস্টের চাইতে অনেক শক্তিশালী। এদের নিয়ে সাময়িক আনন্দ করা যায়, কিন্তু এদের জন্য ঘরের স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায় না। সেখানেও প্রেম নেই কোনো, শুধুই কামনা। জ্যোতিরিন্দ্রের এই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণিটার মধ্যে প্রেম লোক-দেখানো এক অনুষঙ্গ মাত্র। তাই বলে প্রেমের প্রকৃত রূপ চেনার ইচ্ছার অবসান ঘটে না তাঁর গল্পের নারীদের মনে। রত্না নামের এই মেয়েটিও নিজের স্বামীর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগে ভালোবাসার অন্য পুরুষ বেছে নেয়। বিয়ের চাইতে প্রেম বড় কি না তা নিয়ে সংশয় কাটাতে গল্পের কথকের শরণাপন্ন হয়। সমাজে বসবাস করে এমন সমাজপরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে অন্যের সমর্থনের প্রয়োজন পড়ে তার মতো কারো কারো। সমাজের মতো বড় প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করতে হলে নিজের অবস্থানকে আরো দৃঢ় করে তুলতে হয়। নতুবা মানসিক যাতনা আষ্টেপৃষ্ঠে জাপটে ধরতে পারে। তা কাটাতে জোর গলায় জানাতে হয় :

> আর এও আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিয়ের লাল ক্রাউন ছাপ মারা একটা স্ট্যাম্পের চেয়ে ভালোবাসার সোনালি লতা আঁকা স্ট্যাম্পের দাম অনেক বেশি। মা মুখ কালো করে বাবার জন্য অপেক্ষা করত, কিন্তু আমি তা করছি না। কেন করব? (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'স্ট্যাম্প', ২০১৫ক : ১৯১)

কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত রত্নার আকস্মিক চোখের জল তাকে দ্বিধান্বিত করে তোলে। স্বামী কর্তৃক প্রতারিত রত্না স্বামী যা করেছে তার অজান্তে সেটিই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে, সম্ভবত প্রতিশোধপরায়ণ হয়েই এমন সিদ্ধান্ত নেয়। প্রতিশোধপরায়ণতার দিকটি বাদ দিয়ে এমন অসুখী দাম্পত্যের চিত্র রয়েছে

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘হয়তো’ (১৯৩২) গল্পে। এই গল্পের মহিম আর লাবণ্য চরিত্রের মধ্য দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মতোই ঘৃণা ও প্রেমের নিবিড় রসায়ন প্রত্যক্ষ করিয়েছেন গল্পকার।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারীরা সমাজসিদ্ধ প্রেমের সংজ্ঞাকে বারবার অগ্রাহ্য করেছে। সংস্কারের প্রাচীরের ভেতরে ঘরের পুরুষকে সযতনে রেখে প্রাচীরের বাইরে গিয়ে তারা মিলেছে অন্য পুরুষের সঙ্গে। কিন্তু নিশ্চিত আশ্রয়কে ত্যাগ করে কেউ সেই প্রেমিকের সঙ্গে অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ায়নি। যে দু-একজন নিজ নিজ স্বামী-সংসার, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে এসেছে, তারাও প্রেমিকের মাথা গোঁজার ঠাঁইটির ব্যাপারে আগেই নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে। বাকিরা দিনের আলোয় অভিসারে বেরিয়ে ফিরেছে অন্ধকার নামার পূর্বেই। প্রচলের শক্ত শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকেও তারা আত্মবিশ্বাসের চাবি বানিয়ে নিয়েছে প্রত্যেকে। সৌন্দর্য ও জাঁকজমকের চাকচিক্যে সেই চাবিটিকে তারা এতটাই সম্মোহক করে তুলেছে যে, সেটি তাদের আত্মবিশ্বাসকে দশগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

‘উত্তরায়ণ’ (*চার ইয়ার*, ১৯৫৫) গল্পে তাই দেখা যায়, চরিত্রের মা হতে না পারার ব্যর্থতার জন্য যে মানুষটি দায়ী, যার কারণে তার স্বামী পিতৃত্বের স্বাদ হতে বঞ্চিত হচ্ছে বলে প্রতিনিয়ত মেয়েটিকে সন্দেহ করে যাচ্ছে, তাকেই সাক্ষী হিসেবে হাজির করে সে স্বামীর সামনে। জীবনের সঙ্গে এটুকু ছলনা না করলে তাল সামলানো যায় না, এটি সে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছে। তাই প্রয়োজনের বেশি রাগ দেখিয়ে স্বামীর এমন সন্দেহকে নীচতা হিসেবে আখ্যায়িত করে মেয়েটি। তার প্রাক্তন প্রেমিকটিও সম্মতি দিয়ে বলে – ‘মিথ্যা সন্দেহ সত্যি ভাল নয়, স্বপনবাবু। জীবনে এতে অশান্তি বাড়ে ছাড়া কমে না’ (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘উত্তরায়ণ’, ২০১৫ক : ১৯৯)। যে সংযোগ তারা দুজনেই স্মৃতি থেকে মুছে ফেলেছে, ঘটনাপরম্পরায় তা সামনে এলেই তাকে স্বীকার করে নিতে হবে – এই অপ্রয়োজনীয় সততা পরবর্তী জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে জেনেই তারা তা অস্বীকার করেছে। এতে অপরাধ হয় কি না সে বিচার পাঠকের হাতে তুলে দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র গল্পের ইতি টেনেছেন – ‘খড়-কাটা কলটাও চুপ করে গেছে তখন। নিভন্ত আলো’ (‘উত্তরায়ণ’, ২০১৫ক : ১৯৯)। আবার ‘ক্যামাক স্ট্রিটে’ (*চার ইয়ার*, ১৯৫৫) গল্পে লেখক একই মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণির বিপরীত গল্প শোনান পাঠককে। এই গল্প স্মৃতিমেদুরতার কিংবা চির-অচেনা নারী প্রকৃতির। গল্পে নতুন স্বামী পরাশরকে লাভলি বোঝাতে চায়, তার স্বামী গরিব কেরানি ছিল বলে নয়, পুরুষেরা ভালো করে হাসতে না জানলে মেয়েরা নিঃশেষে ভালোবাসতে পারে না বলে আগের সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে সে। আর সন্তানকে সে ফেলে এসেছে, কারণ সেই সন্তানের গায়ে জননীর চেয়ে জনকের গন্ধ ছিল বেশি। কিন্তু সে নিজে পতিব্রতা স্ত্রী ছিল তখনও। স্বামী অফিস যাওয়ার সময় অ্যালুমিনিয়ামের কৌটা হাতে তখনও সে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াত দরজার চৌকাঠে। তার কিছু পরে পরিস্থিতি যেন লাভলি ওরফে লাবণ্যের পক্ষে নিয়ে পাঠককে জানানো হয় :

> কিন্তু পরাশর জানল না, লাবণ্যের মনের চোখে ক্যামাক স্ট্রিটের বনেদি পরিবেশ নয়, নারকেলডাঙার লাল টালি ছাওয়া সতেরো টাকা ভাড়া ঘরের সামনের বেগুন চারায় আকীর্ণ জীর্ণ ভূমিখণ্ডের ছবি ভাসছে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ক্যামাক স্ট্রিটে', ২০১৫ক : ২১২)

অথচ বাস্তবতা এই যে, লাভলি এখন পরাশরের ঘর করছে। নিজের জীবন সে নিজে বেছে নিয়েছে। যা ফেলে এসেছে তার জন্য তার মায়া অমূলক নয়। মায়ের জীবনে সন্তানের চেয়ে অধিক মূল্যবান আর কিছু হতে পারে না, তারপরও সে নিজের জীবনটাকে ভালোবাসতে চেয়েছে বলেই সমস্ত বন্ধনকে তুচ্ছ করেছে। কিন্তু যখন পরাশরও হেঁয়ালির বশে তার কাছে স্বাভাবিকতার বাইরে ভিন্ন কিছু দাবি করে তখন লাবণ্য হয়তো বিভ্রান্ত হয়, বলে – 'আমি কি নদীর ঢেউ, কূল ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই, আর কিছু না কিছু শামুক-বালি উপহার রেখে যাই?' ('ক্যামাক স্ট্রিটে', ২০১৫ক : ২১৪)। লাবণ্য মনের মতো পুরুষকে জীবনসঙ্গী করে স্থিত হতে চেয়েছে। গল্পের এ পর্যায় পর্যন্ত তা-ই অনুভূত হয়। অথচ তার কয়েক মুহূর্ত পরে লেখক নিজেই সেই স্থিতি ভেঙে দেন। জানিয়ে দেন, 'ডোরাকাটা প্রজাপতি'র প্রতি লাভলির আকর্ষণ রয়েছে, এ কথা যেমন মিথ্যে নয়, তেমনই 'গোলাপ বাগানে'র প্রতি তার তীব্র আকর্ষণটুকুও সমান সত্যি। পরম নির্ভাবনায় সে তার সবুজ রুমাল গোঁজা অনিন্দ্যসুন্দর হাতটি সামনের প্লটের গোলাপ বাগানের বেড়ার দিকে বাড়িয়ে দেয়। সামনের গোলাপ বাগান থেকে নতুন প্রেমের ইঙ্গিত এসেছে তার কাছে। সেও সাড়া দিতে প্রস্তুত।

পাঠকের ভাবনাকে ব্যাপকতা দিতেই হয়তো এই গল্পের ভেতরে অন্য গল্পের ইশারা জুড়ে দিয়েছেন লেখক। জ্যোতিরিন্দ্র অবশ্য এমন ইঙ্গিতময়তার আশ্রয় নিয়েছেন প্রায়শই। গল্প বলার ফাঁকফোকরে নিত্যনতুন গল্পের বীজ বুনে দিয়েছেন পাঠকের জন্য। পাঠকই হয়তো তাকে পরিচর্যা করে নিজের মতো করে সম্ভাব্য আকার দেবে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর রোম্যান্টিক নারী চরিত্রগুলোকে প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে কামের তাড়না দিয়ে তৈরি করতে চেয়েছেন কখনো কখনো। চরিত্রগুলোর নিষ্কলুষ প্রেমের মধ্যে কামের আকাঙ্ক্ষা প্রোথিত করে দিয়ে তিনি একদিকে যেমন জাগতিক প্রেমের বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন, আবার অন্যদিকে প্রণয়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের মধ্যে বিষয়জ্ঞান মিশিয়ে দিয়ে চরিত্রকে বহুমাত্রিক করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। 'রজনীগন্ধা গানে' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে যেমন :

> ফটোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম সব। বলব? বলতে কি, আমাদের নিঃশ্বাসের সাথে কামনার সাপ কিলবিল করে বেরিয়ে এসে সেই ফটোর উপর যেন ছোবল মারছিল। আমরা এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে

> বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুখনলাল একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমাদের কাণ্ড দেখছিল। যখন সেদিকে চোখ পড়ল, মনে হল, একটা কুকুর লুব্ধ চোখ মেলে আমাদের খাওয়া দেখছে। তা ছাড়া কি! ছবির সেই পুরুষকে আমরা (এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম) তিন কুমারী সেদিন রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে গিলতে চেয়েছিলাম। যুবক সুখন কি তা বোঝেনি? (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রজনীগন্ধা গানে', ২০১৫ক : ৩৯৬)

চরিত্র নিজেই এখানে তার কামাতুর মানসিকতার কথা স্বীকার করে নিচ্ছে। মেয়েটির আত্মকথনে শুধু তাদের তিনজনই নয়, আরো একজনের কথা রয়েছে – সে যুবক সুখনলাল। তারা যেমন রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ছবির মানুষটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেও তেমনি লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল পূর্ণযৌবনা তিনটি নারীকে। কিন্তু তার অর্থ-বিত্ত ও সম্মান নেই বলে ওই তিন তরুণীর কাছে সে পরিচয়হীন। তাদের চোখে সে সামান্য 'কুকুর' মাত্র। তার কামনার চাইতে তাদের কামনা সম্ভাবনাময়, সমাজসিদ্ধ এবং তাদের ভাবনায় যৌক্তিকও বটে। কারণ :

> আমরা কান খাড়া করলে যে যার ঘরের দেওয়ালে, সিঁড়িতে, মেঝেয়, এমনকী কড়িবরগার গায়ে বাড়ি খেয়ে খেয়ে কথাগুলি উড়ছে, ঝরছে ও আমাদের গায়ে পড়ছে, শুনতাম। 'বিয়ে করবে, বিয়ে করবে। আধুনিক ছেলে। এমন তৈরি জামাই পেলে আমরা যে হাতে চাঁদ পাব। সোনা দিয়ে গড়া পাত্র।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রজনীগন্ধা গানে', ২০১৫ক : ৩৯৫)

উদ্ভিন্নযৌবনা এই তিন নারীর পরিবারও বিরামহীন ফিসফিসানির মধ্য দিয়ে তাদের এই কামনাকে নিয়মিতভাবে পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছে। কিংবা আরেকটু খুলে বললে, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের এই বাক্যালাপই তাদের আকাঙ্ক্ষাকে তীব্রতর করেছে। গল্পে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিচ্ছে – 'আমাদের লক্ষ্য ছিল সাজানো ঘর, সাজানো বাগান, তৈরি মানুষ' ('রজনীগন্ধা গানে', ২০১৫ক : ৩৯২)। এই ভাবনা তাদের পরিবার ও পরিপার্শ্বই তাদের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। সমাজের নিশ্চিত গণ্ডির ভেতরে থেকে পরিবারের মৌন সম্মতির মধ্যে তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে তাই।

কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যায়, এই নিশ্চিত সামাজিক প্রথাটি পালনের পরেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারীরা সংস্কারের আড়ালে সূক্ষ্ম ফাটল খুঁজতে মনোযোগী হয়ে পড়ে সচরাচর। তখন তাদের আর 'সাজানো ঘর, সাজানো বাগান, তৈরি মানুষ'-এর কথা স্মরণে থাকে না। নিশ্চিত জীবনের ফাঁকে অন্য পুরুষের সঙ্গে কামবাসনাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে তারা এক নিষিদ্ধ ও রোমাঞ্চকর আনন্দের সন্ধান করতে থাকে। আবার কখনো কখনো পুরুষকে ক্রমাগত উস্কে দিয়ে নিজেদের বর্তমান অবস্থান জেনে নিতে উন্মুখ হয়ে ওঠে তারা। লেখক তাঁর 'সূর্যমুখী' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে নিজেই জানাচ্ছেন – 'লালসাক্ষরিত

কদর্য চাহনিও মেয়েদের অস্থির করে তোলে, ঈর্ষান্বিত' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সূর্যমুখী', ২০১৫ক : ৪২৬)। কিছু যে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, তবে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের যৌবনবতী নারীদের একটি বিশেষ অংশের স্বরূপ এমনই।

বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারী চরিত্ররা রহস্যময়, দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য। তাদের মনের উপরিতলের ভাবনাটুকু আঁচ করা যায় শুধু, এর গভীর তলের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। বেশির ভাগ গল্পেই তারা কোনো ছকে স্থির থাকতে চায় না। তারপরও লেখকের রচনাশৈলীর গুণে প্রায় প্রতিটি চরিত্রই সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে থাকে তাদের অপার প্রাণস্ফূর্তিতে; কদর্যতা তাদের ম্লান করে দিতে পারে না। কৃতকর্মের জন্য তাদের অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করতে অস্বস্তি জাগে, তাদের কর্মকাণ্ডকে অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। তাই 'মঙ্গলগ্রহ' গল্পে ইলিশের তাজা রক্ত লীলাময়ীর গালে ছিটকে পড়লে সে যখন মধ্যবয়সী কেরানিটির প্রেম ও কামবঞ্চিত জীবনের সুযোগ নিয়ে তাকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা জন্য কাতর কণ্ঠে 'দিন-না মুছে' বলে তার দিকে তাকায়, তখনও লীলাময়ীকে অভিযোগ্য বলে মনে হয় না।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারী চরিত্রগুলোর মধ্যে আরেক ধরনের নারীর দেখা পাওয়া যায় যাদের দারিদ্র্য কিংবা অনটনের সঙ্গে প্রতিদিনের বোঝাপড়া নেই। তাদের অন্য অসুখ – যার মূলে রয়েছে স্মৃতি ও ফেলে আসা যৌবন। তারা নিজের মেয়েদের মধ্য দিয়ে নিজের বিগত যৌবনের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করতে চায়। নিজের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব মেলাতে চায়। 'খুকি' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পের বসুধা এমনই একটি বহুমাত্রিক ও রহস্যময় চরিত্র। বসুধা তার মেয়ে খুকি অর্থাৎ মণিমালাকে তিলে তিলে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছে, মধ্যবিত্ত সমাজের পঙ্কিলতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাকে একটি মুক্ত জীবন দিতে চেয়েছে। কিন্তু ক্রমে আবিষ্কৃত হয়, বসুধা মূলত খুকির মধ্য দিয়ে নিজেকে পুনর্নির্মাণ করতে চাইছে। সে নিজেই বলে – 'সতের বছর ধরে এই ইচ্ছাই লালন করে এসেছে ও! মা'র মতো হোক মেয়ে। মা যা পছন্দ করবে মেয়েও তাই করুক' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খুকি', ২০১৫ক: ৮৬)। নিজেকে নিঃশেষ করে খুকিকে গড়ে তুলছে বসুধা, একদিকের খরচ দিয়ে অন্যদিকের সঞ্চয়।

খুকির পবিত্রতা-হানির আশঙ্কায় বসুধা ওকে কারো সঙ্গে মিশতে দেয়নি। সমস্ত কলুষতা থেকে সন্তানকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে যাবতীয় নিষ্ঠুরতা, অপবাদ আর নিন্দা এড়িয়ে বসুধা এগিয়ে গেছে সম্মুখে। যে ঘিঞ্জি বাড়িতে তারা থাকে সেখানকার সবাই বসুধার চোখে অতিসাধারণ, বৃদ্ধদের ভগ্ন শরীর তার মনে নিরাসক্তি তৈরি করে। সিনেমা দেখতে যাওয়া কিংবা ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে আড্ডারত মেয়েদের সঙ্গে নিজের মেয়ের তুলনায় তাকে শিশুজ্ঞানে তৃপ্ত থাকে সে।

গল্পটিতে বিরূপ পরিবেশের বিরুদ্ধে মেয়েকে নিয়ে একা লড়ে যাওয়া এক স্বাধীনচেতা নারী রূপে বসুধা চরিত্রের ক্রমবিকাশ ঘটলেও গল্পের শেষ ধাপে এসে লেখক এ চরিত্রটিকে ভেঙেচুরে অন্য আঙ্গিকে

নির্মাণ করেন। এই পর্যায়ে এসে প্রকাশ পায়, মেয়ের স্বাস্থ্য-সুরক্ষা, সুন্দর ও বিলাসী জীবনের অনুষঙ্গে বসুধাকে যতই কন্যাঅন্তপ্রাণ দেখানো হোক না কেন, এই অকালবিধবা মা খুকির মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ স্থিতিকে দৃঢ় করতে চাইছে। যেন-বা 'বসুধা নিজের শরীর ক্ষয় করে নিজেকে ভেঙে ভেঙে আরেকটি শরীর গড়ছে' (দেবশ্রী মণ্ডল ২০১৭ : ১১৩)। সন্তানের মাধ্যমে, সন্তানের উপার্জনে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাওয়া সাধারণ মধ্যবিত্তের একটি পরিচিত প্রবণতা। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত নারীর সঙ্গে বসুধার একটি মৌল পার্থক্য আছে; অন্যরা যেখানে সন্তানের একটা ভদ্রস্থ চাকরির মাধ্যমে নিজেদের জীবন নিশ্চিতকরণের আশায় তাদের বড় করে ও মোটামুটি শিক্ষিত করে তোলে, সেখানে বসুধা ততোধিক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মেয়েকে প্রথাগত লেখাপড়া শিখিয়ে ও তার সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করেই নিশ্চিন্ত থাকেনি সে, এমন এক বিচ্ছিন্ন পথে চলার জন্য খুকিকে তৈরি করতে চেয়েছে সে, যে পথে একসময় সে নিজেও হেঁটে এসেছে। সেই চোরাগোপ্তা পথে ক্লেদ থাকতে পারে, সেই ক্লেদ সমাজের চোখে কদর্য ঠেকতে পারে, কিন্তু সেই পথটিকে আড়াল করে রাখতে জানলে সেই ক্লেদটুকু জীবনকে পরিপাটি করে তোলে কখনো কখনো। এই পথে হেঁটেই বসুধা সামান্য নার্সের চাকরি করেও মেয়েকে ফ্ল্যাটবাড়িতে রাখার সক্ষমতা অর্জন করেছে। আজকের দিনে তার উপলব্ধিজাত সত্য এই – তার যৌবন ফুরিয়ে যাচ্ছে, জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে এবার পুঁজি করতে হবে আত্মজার যৌবনকে। আর সেভাবেই মেয়েকে প্রস্তুত করে সে। তাকে বিভিন্ন বড় মানুষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যাদের সঙ্গে একদা তারও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। যদিও এ প্রসঙ্গটি উঠে আসে গল্পের একেবারে শেষে আকস্মিক মোচড়ের মাধ্যমে, কিন্তু এতে গল্পটির শিল্পমান ক্ষুণ্ন হয় না। কিন্তু খুকি? সে কি প্রস্তুত এই পথের পথিক হতে? গল্পের রহস্য আরো ঘনীভূত হয়ে ওঠে যখন খুকি বলে বসে – 'বুড়োতে বুড়োতে কি তফাত নেই মা। এ বাড়ির কুশল রায়, হেম লাহা তো বুড়ো হয়েছে, দেখলে কি ঘিনঘিন করে না, গা বমি ধরে না!' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খুকি', ২০১৫ক : ১০০)। বসুধা মেয়ের কথায় সায় দিয়ে খুকির রুচিতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে আরো 'বড় সার্কেলে' পরিচয় করিয়ে দিলে খুকির অতর্কিত প্রশ্ন – 'ওরা কি সবাই এমন বুড়ো?' ('খুকি', ২০১৫ক : ১০০)। মেয়ের এই প্রশ্নকে শিশুসুলভ মনে করে এড়িয়ে যায় বলে, বসুধার জানা হয় না খুকি আর এখন খুকি নেই, খুকি এখন বোঝে বিত্তের পার্থক্য থাকলেও বৃদ্ধরা শেষ পর্যন্ত ম্রিয়মাণ। ভোগের সময়ে সতেজ তারুণ্যের ভাষা তারা হারিয়েছে। তারুণ্যের সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই খুকির মনে প্রেমহীন সম্ভোগ এখনো দ্বিধা তৈরি করে।

গল্পটির নাম 'খুকি' হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি খুকির খুকিত্ব হারানোর গল্প – তার বড় হয়ে ওঠা, পরিপূর্ণ এক মণিমালা হয়ে ওঠার আখ্যান। গল্পটির দীর্ঘ বর্ণনায় অভিনব বুনন-কৌশলে বসুধার মানসজগৎ প্রায় পুরোটা উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু খুকি চরিত্রটিকে গল্পের শেষে দু-একটি সংলাপের মাধ্যমে

স্পষ্ট করেছেন লেখক, যাতে মনে হয় খুকি তার মায়েরই অনুগামী। নারীর এক অভিন্ন কিন্তু ব্যতিক্রমী মানস-পট উন্মোচিত হয়েছে 'খুকি' গল্পে।

বসুধার পরিপূরক চরিত্র 'মেয়ে-শাসন' (*বঙ্কুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পের নীরজা। মেয়েকে সবসময় আগলে রেখে, মেয়ের বয়সে নিজের অতীত রোমন্থন করে নিজে যেভাবে গড়ে উঠেছিল মেয়েকে সেইভাবে পরিচালনা করতে চায়। পিঠে ভাজার সময় মেয়েকে সে বোঝাতে চায় :

> মেয়েদের জীবনটাও পিঠের মতন। ভাজা মিষ্টি রস রং। চারটে গুণেই ওকে অতুলনীয় হয়ে উঠতে হবে। তবেই হবে ওর সার্থক জীবন। ভিতরের স্বাদ গন্ধ রস রং ছাড়া বাইরের সজ্জাটা তার কিছুই না, কোনও মূল্য নেই। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মেয়ে-শাসন', ২০১৫ক : ২৮৫)

সন্তানবাৎসল্যের দিক থেকে 'খুকি' গল্পের বসুধা ও 'মেয়ে-শাসন' গল্পের নীরজা একই সমতলের বাসিন্দা হলেও মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দুজন পরস্পর হতে ভিন্ন, মুদ্রার দুই পিঠ। নীরজা চরিত্রটি আর দশটা মায়ের মতোই সাধারণ। তারা তাদের সন্তান, বিশেষত কন্যা সন্তানদের নিজের শরীরের অংশ মনে করার কারণে তাকে একান্ত নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চায়। এই চাপিয়ে দেওয়ার মনোভাবে মায়ের আরাম মিলতে পারে, কিন্তু মেয়ের নয়। আর তাই নিজের জীবনে মায়ের দখলদারিত্বে রুণির হাঁসফাঁস লাগে। রুণি খুকি নয়, মায়ের অনুগামী হওয়ার মতো মন নিয়ে লেখক তাকে তৈরি করেননি। আর তাই আয়নায় নিজেকে দেখার চাইতে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখতে তার বেশি ভালো লাগে; একটা দুপুরও মায়ের শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না বলে তার কান্না আসে। নিজের জীবনে মায়ের এমন অনাবশ্যক অনুপ্রবেশ থেকে মুক্তি পেতে ভিন্নপন্থা অবলম্বন করে সে – একসঙ্গে ভাতঘুম দেওয়ার নামে মাকেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। লেখকের ভাষায় – 'মা'র কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার এই প্রথম মন্ত্র রুণি আজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিখল' ('মেয়ে-শাসন', ২০১৫ক : ২৯২)। কিন্তু ক্রমে স্পষ্ট হয়, মায়ের শাসনে বন্দি থেকেও রুণি যেমন আকাশ দেখতে শিখেছে, তেমনি সহপাঠী রেখার হকার ভাইটি সাইকেল নিয়ে পাড়ায় এলে সে আনন্দে উত্তেজনায় কেঁপে উঠেছে। অবশ্য এখানে রুণির অস্থিরতার কারণটি খোলাসা করে দেননি লেখক। এই অস্থিরতা রেখার ভাইয়ের প্রতি অনুরাগবশত, নাকি মাসিক-ত্রৈমাসিক-সাপ্তাহিক কাগজগুলোকে স্পর্শ করতে পারার লোভে – এর মীমাংসার ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লেখক এই ইঙ্গিতটুকু দিয়ে রেখেছেন যে, দুপুরের আলস্য, আকাশের রং, ঘুড়ির উদ্বেলতা ও পত্রিকার গন্ধের পাশাপাশি শ্যামল নামে রেখার সেই হকার ভাইটিও তার হৃদয়ে চাঞ্চল্য তৈরি করেছে। শ্যামলের সঙ্গে আলাপচারিতায় রুণি বলে, 'বলছিলাম শার্ট পরেছেন, চুলগুলো কপালের ওপর লাফাচ্ছে।

হেলসিঙ্কি ফেরত অ্যাথলেটের মতো লাগছে' ('মেয়ে-শাসন', ২০১৫ক : ২৯৪)। রুণি যে ছেলেটির প্রতি অনুরক্ত তার অভিজ্ঞ মায়ের সেটি বুঝতে বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয় না। তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে তিনি বলেন :

> 'শেষ পর্যন্ত এই তোমার সিলেকশন, এই চয়েস, ছি-ছি . . . এবং আমি অন্ধের মতো বলতে পারি তুমি শ্যামলের সঙ্গে প্রেম করছ, শ্যামলকে চাইছ, ওর শরীরের মনের কাছ ঘেঁষে বেশিক্ষণ থাকার ইচ্ছের চেয়ে পৃথিবীতে এমন আর অন্য কোনও ইচ্ছে আছে তোমার? (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মেয়ে-শাসন', ২০১৫ক: ২৯৫)

শ্যামলকে নিয়ে রুণি খানিক রোম্যান্টিসিজমে ভুগলেও নীরজার কথাগুলো বাড়াবাড়ি শোনায় পাঠকের কানে। মনে হয়, মেয়ে-শাসনের নামে সম্ভবত নিজের অতীতকে ছুঁয়ে যাচ্ছে নীরজা। তার তীব্র সন্দেহের পেছনেও হয়তো সেই অতীত ক্রিয়াশীল থাকতে পারে, নিজের অতীতের কোনো ভুলকে সে চাপিয়ে দিতে চাইতে পারে মেয়ের কাঁধে। লেখক পুরোটা উন্মোচিত না করলেও তাঁর ইঙ্গিত থেকে এরকম মনে হওয়া হয়তো অস্বাভাবিক নয়।

'চামচ' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পের চিত্রাও মধ্যবিত্ত নারীর রহস্যজটিল মনস্তত্ত্বের আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চিত্রা, একজন কলেজ শিক্ষকের স্ত্রী, যিনি তাকে প্রতিদিন বই পড়তে অভ্যস্ত করে তোলেন, ঘর সাজাবার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ কিনে দেন; প্রচলিত সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে স্ত্রীকে পরিপূর্ণ করে তুলতে চান। কিন্তু ফুলের প্রতি স্বামীর কোনো মনোযোগ তৈরি হয় না বলে চিত্রা ব্যথিত হয়। তার অধ্যাপক স্বামীর কাছে ফুলের চাইতে নতুন কিনে আনা চাদরটার সমাদর বেশি। বোধহয় এর অন্যতম কারণ এটার ব্যবহার-উপযোগিতা; শুধু শোভা নয়, আরামও দিতে পারে তা। এতে চিত্রা আশাহত হলেও তার হতাশ জীবনে ত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভাব ঘটে ফুল বিক্রেতার। প্রতিদিন চিত্রা ফুলের নানা পাঠ নেয় দরিদ্র ফুল বিক্রেতার কাছে, সে মিষ্টভাষী ফুলওয়ালার জন্য অপেক্ষা করে মনে মনে। এবার ফুলওয়ালা সঙ্গে নিয়ে আসে নতুন ডিজাইনের চামচ। প্রতিদিন একটাই চামচ কেনে চিত্রা তার কাছ থেকে। বিক্রেতা তাকে একাধিক চামচ কিনতে বললে সে বলে – 'একদিনে যদি দুটো রেখে দিই তো কাল রাখবো কী?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চামচ', ২০১৫ক : ১৪৫)। চিত্রা ফুলওয়ালার কাছ থেকে প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু কেনাকাটার অভ্যাসটাকে টিকিয়ে রাখতে চায়, তার জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ফুলওয়ালাটি ধূমপান করে বলে বালিশের তলায় দেশলাই রেখে দিতে চায়। কারণ ফুলওয়ালা তার রুচি বোঝার চেষ্টা করে, তার প্রতি মনোযোগ দেয়। তার অধ্যাপক স্বামী এ ব্যাপারে উদাসীন। তাই গুরুত্বহীন হয়ে থাকা চিত্রাও চামচটা তার স্যুটকেসে সযত্নে তুলে রাখে। এই চামচের মাহাত্ম্য ভিন্ন। ফুলের মতো ক্ষণিকের বস্তু না হলেও প্রতিদিনের ব্যবহারে এর উজ্জ্বলতা কমিয়ে আনতে চায় না সে। উজ্জ্বলতার প্রতি চিত্রার অনুরাগ ফুলওয়ালার প্রতি তার আগ্রহ থেকেই অনুমান করা যায়। এই গল্পের চিত্রা স্বামীর সঙ্গে

রুচিবোধের ভিন্নতার পটভূমিতেই ফুলওয়ালার প্রতি রোম্যান্টিক ভাবালুতায় আক্রান্ত হয়েছে। এমনই আরেকটি চরিত্র 'মিষ্টি জ্বালা' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১৯৮১*) গল্পের রূপা। চরিত্র হিসেবে রূপা খানিকটা ভিন্ন মাত্রার। প্রেমিকের দরিদ্র বন্ধুর প্রতি তার আকর্ষণের অন্যতম কারণ সম্ভবত গতানুগতিক কেতাদুরস্ত প্রেমিকটির বিপরীতে প্রেমিকের কথক বন্ধুটির অতিসাধারণ ও নৈমিত্তিক উপস্থিতি। একে রুচি বদল হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আবার 'চড়ুইভাতি' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পের মল্লিকা চরিত্র হিসেবে আরো আলাদা। যে মল্লিকা হারিনের প্রেমে মত্ত থেকে স্বামী সিভিল সার্জন রঞ্জিতকে ছেড়ে প্রেমিকের কাছে চলে আসতে চায়, সেই মল্লিকাই আবার প্রেমিকের সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে হরিণের মাংস দিয়ে চড়ুইভাতি করতে গিয়ে স্বামীর বন্ধু নীরেন লাহিড়ীর জন্য হাঁস রান্না করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। নিজেদের নিয়ে যাওয়া হরিণের মাংস রান্না করার জন্য তাড়া দেওয়া হলে ঈষৎ কোপের সঙ্গে প্রেমিককে বলে – 'খাওয়া, – খাওয়াই কি সব। . . . একটু বাসি হোক না, – হরিণের মাংস বাসি খেতে ভালো' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চড়ুইভাতি', ২০১৫ক : ১০৮)। এ যেন প্রতিমা গড়ে নিজেই ভেঙে দেওয়া। কিন্তু ভাঙা প্রতিমা তার সকল সৌন্দর্য নিয়ে সেই ধ্বংসের ভেতরেও সগৌরবে মূর্ত হয়ে থাকে। 'স্বেচ্ছায় যে আসে তার সম্পর্কে কোনও কথা ওঠে না, কেউ আটকাতে পারে না তাকে, বুঝলে। এর মধ্যে ভাবাভাবির কিছু নেই' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চড়ুইভাতি', ২০১৫ক : ১০৬)। অত ভাবনা-চিন্তা করার মেয়ে নয় মল্লিকা – সে উপভোগকারী। সে হারিনকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে জীবন কাটাতে চায়, এটা যেমন সত্য, ঠিক তেমনই সত্য এটাও যে, সে তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে একমুহূর্তও থাকতে চায় না। মল্লিকার ব্যগ্র আলাপ থেকে তা স্পষ্টভাবে অনুমেয়। সে হারিনকে ভালোবাসে, কিন্তু বিত্তবান লাহিড়ীকেও তার পছন্দ। হয়তো সে ভাবে, হারিন যেহেতু তার চিরকালের, লাহিড়ীর সঙ্গে ক্ষণিকের আনন্দময় সময় উদ্‌যাপন তাতে প্রভাব ফেলবে না। কারণ, 'হরিণের মাংস বাসি খেতে ভালো'। মধ্যবিত্ত কেরানি হারিন মল্লিকার কাছে বাসি হরিণের মাংস, যার ঐতিহ্য আছে, জৌলুস নেই। যার স্বাদ গ্রহণের কল্পনা রোমাঞ্চকর; কিন্তু সদ্যমৃত বালিহাঁস তার চেয়ে উষ্ণ, মিহি ও সুস্বাদু। হারিনের ভেতর পর্যাপ্ত প্রেমময়তা থাকতে পারে, কিন্তু তার বেশভূষা আর আচরণে যে প্রতিপত্তি নেই, সিভিল সার্জন রঞ্জিতের স্ত্রী মল্লিকার তা অজানা নয়। অভ্যাসের কারণে হারিন যেন তা আরো মলিন করে তুলেছে; বাসি হয়ে গেছে হারিন। লাহিড়ী মল্লিকাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে আসার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, মল্লিকা নিজেই হারিনকে তা জানায়। মল্লিকার এই সত্যবচন গল্পটিতে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার সঞ্চার ঘটায়। এই অকপটতায় স্বেচ্ছাবিহারী মল্লিকার নির্ভীক ও বহুগামী মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারী মনস্তত্ত্বের আরেকটি স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পাওয়া যায় 'রেফ্রিজারেটার' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে। এই গল্পে স্বামী-সোহাগি বেবি তার সাজানো সংসার নিয়ে উচ্ছ্বসিত। ছোট সংসারটিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে আরো পরিপাটি, আরো জৌলুসে পরিপূর্ণ করে তুলতে চায় সে। তার সেই উচ্ছ্বাস অনূঢ়া বাল্যবান্ধবী সুকৃতিকেও স্পর্শ করে :

> আশ্চর্য, ভাবে সুকৃতি, বিয়ে সম্পর্কে বলতে গেলে একরকম উদাসীন অন্যমনস্ক যখন ও (সেদিনও বউদির কথা সে হেসে ঠেলে উড়িয়ে দিয়েছে), ঠিক তখনই কুমারীত্বের খোলস ছেড়ে ঝলমলে প্রজাপতিটি হয়ে উড়ে এল ওর সামনে ওর বয়সের এক মেয়ে। এসে রং ছড়াচ্ছে, গন্ধ বিলোচ্ছে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রেফ্রিজারেটার', ২০১৫ক : ৪১২)

দুটি নরনারীর প্রেম ও দাম্পত্য সুকৃতির মনের মণিকোঠায় আলোড়ন সৃষ্টি করলে অচেনা সেই সুখের স্বরূপ জানার জন্য সে বেবির ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। নিঃশব্দ সেই দাম্পত্য থেকে কিছু আঁচ করতে না পেরে ফিরে আসার মুহূর্তে মেঝের উপর বই-টই কিছু একটার ছিটকে পড়ার শব্দ শুনতে পায় হঠাৎ। বেবির পড়ালেখা করতে না চাওয়ার সূত্র ধরে নিজে নিজেই অঙ্ক মেলাতে বসে সুকৃতি। অধ্যাপক রজতবাবুর ইচ্ছা বিদ্যা দিয়ে নিজের স্ত্রীকে যোগ্য করে তোলা, আর বেবির ইচ্ছা রজত-বেবির সংসারকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা; এ-ই বুঝি বই ছিটকে পড়ার নেপথ্য কারণ। 'এর ও ওর ইচ্ছার মিলনই তো সংসার-রচনা!' ('রেফ্রিজারেটার', ২০১৫ক : ৪১৪) – ভেবে ভেবে সে রাতে ঘুমাতে পারে না সংসার-অনভিজ্ঞা অবিবাহিতা সুকৃতি। অথচ পরদিন থমথমে মুখে বেবি নিজেই জানায় লাইফ ইন্স্যুরেন্সের খরচ বাঁচানো টাকায় রজতবাবু সংসারে নতুন অতিথি আনতে চাইছেন, আর বেবি চাইছে নতুন রেফ্রিজারেটার কিনতে। প্রয়োজনে-বিলাসে সংসারের বহিরঙ্গের সাজসজ্জায় বেবি নিজেকে এমনভাবে ঢেলে দিয়েছে যে, গৃহের অন্দরটুকু পরিপূর্ণ করে তোলার চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে তার। সংসার করার চেয়ে নিজের সংসার অন্যকে দেখিয়ে তৃপ্ত হওয়ার নেশায় আসক্ত বেবি; তাই সংসারী হয়ে ওঠার সকল চেষ্টা সত্ত্বেও সংসারের সারটুকু থেকে সে বঞ্চিত রয়ে গেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারীদের মধ্যে বেবি একটু ভিন্নতর।

'রেফ্রিজারেটার' গল্পে বেবির অপক্ব-অপরিণত মনোজগৎকে উপস্থাপন করতে গিয়ে সুকৃতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করার সুযোগ ছিল না বলেই হয়তো 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা' (*পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা* ১৯৬২) গল্পে লেখক সুকৃতিকে কুন্দ রূপে ফিরিয়ে এনেছেন। কুন্দ স্বামী-পরিত্যক্তা। বাবার বাড়িতে থাকে আর প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রতিবেশী রেবার নতুন সংসারে উঁকি দিয়ে যায় লজ্জাহীনের মতো। রেবার দাম্পত্য জীবন নিয়ে কুন্দের বিভিন্ন কৌতুকে ও কৌতূহলে সে বিরক্ত। কুন্দ রেবার উদ্দেশে বলে :

হ্যাঁ ভাই, রাত্তিরে মানুষটাকে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিও। বাইরের রাস্তায় ঘাটে ও এমন বইয়ের ভেতর চোখ মুখ গুঁজে রাখলে কোনদিন না গাড়ি চাপা পড়বে। বলবে তুমি আমার দু'চোখের মণি, আমার মণি যদি গাড়ি চাপা পড়ে কেটে থেঁতলে যায় তো আমি চিরজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যাব। বলবে, বলতে পারবে না? (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', ২০১৫খ : ২৪৪)

এমনকি সে তাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় নিয়েও স্থূল রসিকতা করে। এমন অস্বাভাবিক মানসিকতার কারণেই সম্ভবত সে তার স্বামীর ঘরে থাকতে পারেনি, এমন ভাবনার উদ্রেক ঘটে। রেবা নিজেও তাকে ঘরে আসতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়, স্বামীকে কুন্দের কথা জানালে তিনি বলেন – 'ওর অবদমিত কামনা বাসনার বহিঃপ্রকাশ এগুলো। তোমার আমার গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চাইছে ও' ('পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', ২০১৫খ : ২৪৭)। সেদিন ভোররাতেই রেবার ঘরে উঁকি দিতে গিয়ে তার কাছে ধরা পড়ে যায় কুন্দ। তারপরও নির্লজ্জের মতো বিকেলে সে আবার আসে। রেবার তীব্র তাচ্ছিল্যকে উপেক্ষা করে বলে :

আমি না হয় চুরি করে দেখতে এসে অপরাধ করেছিলাম ভাই, তোমারও মস্ত ভুল হয়েছে, ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় স্বামী দেবতার পা ছুঁয়ে তবেই মাটিতে পা দিতে হয়। বৌ, তা কি তোমার জানা নেই! (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', ২০১৫খ : ২৪৮)

উপরিউক্ত উপদেশটি বর্তমানে হয়তো আধুনিক নারীর পক্ষে অবমাননাকর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সেই সময়ের কঠোর সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনব্যবস্থায় কুন্দের এই উক্তি সংসারমনস্কতার পরিচায়ক। ভাগ্যের পরিহাসে নিজের সংসারজীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ কুন্দ অন্যের সংসারের আলোয় নিজেকে রাঙাতে আসে; অন্যের দাম্পত্যের আনন্দ দিয়ে নিজের একাকিত্বের দুঃখকে ঢাকতে চায়। শেষের এই সামান্য নাটকীয়তার মাধ্যমে লেখক নিঃসঙ্গ কুন্দের মনের অতল থেকে পাঠককে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন। আলোর অভাবে পরিত্যক্ত সেই তলদেশকে কিছুটা বিপদজনক মনে হতে পারে, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কুশলী লেখনীর গুণে তার গভীরের নির্মলতার সন্ধান চরিত্রটিকে লেখকের অন্যান্য নারী চরিত্রের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আবহমান কালের বাঙালি নারীর মন ও মননের রহস্য উন্মোচন করে তাদের সূক্ষ্ম ও সমন্বিত রূপটি নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্প-বয়নের ক্ষেত্রে কোনো কষ্টকল্পনার আশ্রয় নেননি তিনি। নারী জীবনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-পারিবারিক-মানসিক সমস্যাপীড়িত অনড় বৃত্তগুলো

তাঁর সুলেখনীর স্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রসমূহের নানা সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর গল্পের নারীদের পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলেছেন তাদের মনোজগতের বিস্তার ঘটিয়ে। কখনো তির্যক, কখনো আবার নিতান্তই সরলভাবে তাদের সূক্ষ্ম ও সমন্বিত রূপটি একনিষ্ঠ শিল্পীর একাগ্রতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। 'বুটকি ছুটকি' (প্রথম প্রকাশ : *প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭, *দেশ* ১৯৭০) গল্পের বুটকি আর ছুটকি নামের দুই বোন সেই সরলতারই প্রতিমূর্তি। তারা মাতৃহীনা দুই বোন বাবার অনুপস্থিতিতে প্রায়ান্ধকার এক চিলতে ঘরে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখে। 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' – নিজেদের শরীরের প্রতি পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি দেখে সন্ত্রস্ত হরিণের মতোই তারা জেনে গেছে পূর্ণ বিকশিত এই শরীরই তাদের পক্ষে সমূহ বিপদের কারণ। কিন্তু শরীর বাধা মানতে চায় না। তাই তারা নিজেরাই নিজেদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। সচেতনভাবে নয়, অনেকটা অবচেতনভাবে। আশ্রয়ের অভিব্যক্তি হিসেবে পরস্পরকে প্রশ্রয় দেয় তারা। সমালোচকের ভাষায় :

> আর 'বুটকি ছুটকি'? পা কাটা কম্পোজিটরের দুই মেয়ে উদ্ভিন্নযৌবনা, রুদ্ধ তরঙ্গের মতো সে যৌবন দৈন্যে, শাসনে, টিনের চাল, গুহাগহ্বর, বস্তিঘরে অবরুদ্ধ, বেদনাভারাক্রান্ত। যৌবনজ্বালা নয়, একটা করুণ হাহাকার শোনা যায়, গল্প পড়া শেষ হলে, "ছিঃ কাঁদিসনে।" "আশা, আশা নিয়ে বেঁচে থাক ছুটকি, ওতে সুখ আছে, আমি তো –"
>
> কথা অসমাপ্ত থাকে। (অজ্ঞাত ১৪১৬ ব. : ২৯১)

বাংলাভাষায় যে কজন লেখক নারীর প্রেম ও কামনার জটিল সমীকরণকে যাপিত জীবনের সরল ছকে ফেলে তাদের আত্মার নির্যাসটুকু সফলভাবে ছকবন্দি করতে সমর্থ হয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। সকল অবদমন সত্ত্বেও তাঁর নারীরা সংস্কারের প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সেজন্য তাদের খুব কসরত করতে হয়নি। তারা গল্পের রহস্যটুকু সম্বল করে সাজানো সংসার ছেড়ে অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়েছে, কোনো পিছুটান রেখে যায়নি। 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু' (*মহীয়সী* ১৯৬১) গল্পে শোভনা যেমন, 'ক্যামাক স্ট্রিটে'র লাভলি, 'বধিরা' (*শালিক কি চড়ুই*, ১৯৫৪) গল্পের উত্তরা, 'ট্যাক্সিওয়ালা' (*ট্যাক্সিওয়ালা*, ১৯৫৬) গল্পের রমা তেমন। আর যারা 'পতঙ্গ' (*পতঙ্গ*, ১৯৬১) গল্পের রূপার মতো, 'গিরগিটি'র (১৯৫৭) মায়ার মতো নিরুদ্দেশকে ঘরে ডেকে এনেছে তারাও রহস্যের ঢালটুকু স্বাভাবিক ছন্দে বাগিয়ে ধরেছে আগে।

> অতটুকু চায়নি বালিকা!
> অত শোভা, অত স্বাধীনতা!
> চেয়েছিল আরো কিছু কম,

আয়নার দাঁড়ে দেহ মেলে দিয়ে
বসে থাকা সবটা দুপুর, চেয়েছিল
মা বকুক, বাবা তার বেদনা দেখুক!
অতটুকু চায়নি বালিকা!
অত হৈ রৈ লোক, অত ভীড়, অত সমাগম!
চেয়েছিল আরো কিছু কম!
একটি জলের খনি
তাকে দিক তৃষ্ণা এখনি, চেয়েছিল
একটি পুরুষ তাকে বলুক রমণী!
(আবুল হাসান ২০১২ : ৮২)

কবি আবুল হাসান 'নিঃসঙ্গতা' শীর্ষক এই কবিতা রচনার অনেক আগেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আলোড়ন-সৃষ্টিকারী গল্প 'গিরগিটি' (প্রথম প্রকাশ : *দেশ* ১৯৫৬, *প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭) প্রকাশিত হয়েছে। লেখা দুটির মূল সুর অভিন্ন হলেও লেখকদের প্রকাশভঙ্গি ও মাধ্যম আলাদা। তবে ভিন্ন সময়ের, ভিন্ন পরিবেশের, ভিন্ন চেতনার দুজন কবি ও কথাসাহিত্যিকের ভাবনার সাযুজ্য থেকে এটুকু প্রতিভাত হয় যে, বাঙালি নারীর এমন আত্মসচেতন অভিব্যক্তি দুর্লভ নয়, বরং সহজাত।

নির্জন প্রকৃতির অনুষঙ্গে ভুবন সরকারকে কাছে টেনে নিয়েছিল মায়া, নিজেকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল 'মরা-ডাল' সদৃশ বৃদ্ধটির সামনে। নারীর মনের গহনের এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রথাগত দৃষ্টিতে বিচার করতে গেলে অবারিত প্রকৃতির সঙ্গে নারী-হৃদয়ের মিথস্ক্রিয়াকে উপেক্ষা করা হবে। সর্বোপরি তার চেতনার অতীত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার অভিঘাত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠবে। গল্পের আকার-প্রকার একইরকম না হলেও 'পতঙ্গ' গল্পের রূপা আর মায়ার মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। রূপার ক্ষেত্রে অবশ্য প্রকৃতি অনুষঙ্গ হয়ে আসেনি; স্বামীর অবহেলা, নিজের প্রয়োজন এবং অধ্যাপক স্বামীর ছাত্রদের তারুণ্যদীপ্ত ও সহজলভ্য উপস্থিতি তাকে আপনিই তৃষ্ণার্ত করেছে। সেই তৃষ্ণার জন্ম আক্রোশ ও ঘৃণার যূথবদ্ধতায়, কিন্তু ইন্দ্রিয়গত সুখকে একান্ত আপন করে পাওয়ার লিপ্সায় :

'কাঁদছ।' ফিসফিসিয়ে উঠলাম। 'দুঃখ হয়েছে চক্রবর্তীর কথায়?'

রূপা মাথা নাড়ল।

'দুঃখে নয়, কাঁদছি আক্রোশে, ঘৃণায়।' পাখির মতো লাল টুকটুকে ঠোঁটদুটো মুহূর্তকাল আমার ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে ও পরে ঠোঁট সরিয়ে নিয়ে কেমন করে জানি হাসল, 'আর কাঁদছি অসহ্য সুখে।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পতঙ্গ', ২০১৫ক : ৭৯০)

রূপার এই কামপ্রবৃত্তি হয়তো স্বাভাবিক সামাজিক ন্যায়বোধে প্রশ্রয় পাওয়ার যোগ্য নয়, হয়তো প্রকৃতিপ্রদত্ত শারীরিক কামনা মেটাবার তাগিদ মাত্র; তবু এর মধ্যে এক পুরুষ থেকে উপেক্ষিত হয়ে অন্য পুরুষের কাছে সম্পূর্ণ রমণী হয়ে ওঠার পূর্ণ অভিপ্রায় রয়েছে। নইলে ঘৃণা আর আক্রোশের প্রসঙ্গ হয়তো এখানে উত্থাপিত হতো না।

গল্পের বুনন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, রূপার যৌবনে শিহরিত হওয়ার মতো তাড়না নেই তার অধ্যাপক স্বামীর। নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্যে রূপার জন্য আলাদা কোনো সময় নেই যা স্ত্রীর নিঃসঙ্গতাকে ভরিয়ে তুলতে পারে। রূপা তার একাকিত্বকে পূর্ণ করে নিতে চায় অধ্যাপকের ছাত্রদের সাহচর্যে। তাতেও অধ্যাপকের ঘোর আপত্তি। নিশীথ নামের ছাত্রটি যাতে বাসায় না আসে সেই নির্দেশ দিয়ে আবার তিনি বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে। এই অবহেলা রূপা সহ্য করে থাকতে চায়নি। নিজেকে রক্তমাংসের একজন মানুষ ভাবে বলেই তাড়না আর কামনাকে সে উপেক্ষা করে না, সে চায় একজন নিজস্ব পুরুষ, যে তাকে রমণী বলবে, রমণী করে তুলবে। সে কারণেই হয়তো রূপা স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পিত করে প্রতিশোধ নিতে চায়, অমৃতের আস্বাদ নিয়ে রমণীত্বের সুখ পূর্ণাঙ্গভাবে পেতে চায়। এদিক থেকে বিচার করলে রূপা 'স্ট্যাম্প' গল্পের রত্না চরিত্রটির সঙ্গে তুলনীয়। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারী প্রসঙ্গে সমালোচক অবশ্য মন্তব্য করেন :

> জ্যোতিদা, আপনার সৃষ্টিতে নারী প্রায়শই দ্বি-চারিণী, স্বৈরিণী। তারা পরপুরুষে আসক্ত হয়। বিবাহ বহির্ভূত extra marital সম্পর্ক লালন করে। কখনো স্বামীর অপদার্থতার কারণে। কখনও নিছক স্বভাবদোষে। প্রবৃত্তিজাত অদম্য স্পৃহায়। . . . আপনার বর্ণনায় নারীর শরীর সত্তা প্রকট। . . . নির্লজ্জ উন্মাদনায় মেতে ওঠে। আবার শালগ্রামশিলা সাক্ষী রেখে বিয়ে করা পুরুষের বুকে মুখ লুকিয়ে নিরাপত্তার ঘুমও ঘুমিয়ে নেয়। (রঞ্জনা দত্ত ২০০২ : ১৫১)

'পতঙ্গ' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে কাহিনি-কাঠামো গড়েছেন, কার্যকারণ বিশ্লেষণ না করে শুধুমাত্র ঘটনার বর্ণনা দিয়ে রূপাকে কামনাপ্রবণ করে নির্মাণ করেছেন, তাতে রূপার অন্তর্গত রূপ অর্ধসমাপ্ত ছিল বলেই হয়তো তিনি 'রূপালী মাছ' (*শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা* ১৩৭০ ব.) গল্পে মাধুরীকে এঁকেছেন চেতন-অবচেতন-অন্তরাত্মা-সহ। মাধুরীর মনের ভেতরের 'দেবতা' (স্বামী) আর 'অসুর' (শিবদাস)-এর মল্লযুদ্ধে দেবতার প্রতি মাধুরীর পক্ষপাত সত্ত্বেও অসুরের জয়ঢাক ভীমনিনাদে বেজে উঠেছে বারবার। দেবতার আরাধ্য হয়ে সে নিজেই নিজেকে অসুরের কাছে সমর্পণ করেছে। এবং তার কারণটিও 'রূপালী মাছ' গল্পে মাধুরী বর্ণনা করেছে পাঠকের কাছে :

> ঘাড় ফেরালে আলমারির তাকে পাকা পেঁপে কি লেবুটা আনারসটা দেখা যায়। এখানে মাংস পেঁয়াজের গন্ধ নেই। মাখনের টিন ওটসের শিশি টমেটো ও তেজী খাদ্যের মধ্যে বড়জোর দুটি মুরগির ডিম চোখে পড়ে। পরিমিত জীবন। দশটা পাঁচটার কর্মজীবন। তারপর পার্কে ঘুরে বিশুদ্ধ বায়ুসেবন। তারপর গৃহে প্রত্যাবর্তন। তারপর টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে গীতাঞ্জলি রঘুবংশ বা মেঘনাদ বধ কাব্যে নিমজ্জন। টেবিলের ওধারে রজনীগন্ধা, ধূপকাঠি পুড়ছে আর এক পাশে। অর্থোপার্জনের আসুরিক আকাঙ্ক্ষা অনুপস্থিত বা অপচয়ের উন্মাদনা। দেখতে দেখতে মাধুরীর একসময় হাঁপ ধরে, যেমন এখন, চেয়ারটা যদিও শূন্য; গীতাঞ্জলি রঘুবংশ টেবিলের একপাশে মুদিতনেত্র হয়ে শুয়ে আছে, রজনীগন্ধা ঝিমাচ্ছে। ধূপকাঠি? ইচ্ছা করে মাধুরী জ্বালেনি। . . . ফাইডেলিটি, ফাইডেলিটি, ফাইডেলিটি; সাত্ত্বিক মানুষের যোগ্য প্রহরী বটে। শব্দটা শুনতে শুনতে কান পচে যায় তবু শব্দের নিবৃত্তি নেই। এবেলা যন্ত্র, ওবেলা মানুষ। তাই ওর এত বেশি ক্লান্তি আসে হাঁপ ধরে যে ব্যালকনির একপাশে সরে গিয়ে নিচের দিকে গলা বাড়িয়ে দেয় মাথাটা ঝুলিয়ে রাখে। অথচ চেষ্টা করেছিল ও স্থাণুর মতন স্থির কঠিন হয়ে থাকতে। আর ঐ অবস্থায় নগ্ন নাভির কাছে চুপ করে বসে থাকা নীল মাছির স্বর্গীয় লাবণ্য দেখবে। কিন্তু প্রভুভক্ত ঘড়ির টিকটিক তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কোথাও নরক আছে নোংরামি আছে, সাবধান, সাবধান, সাবধান। তাই তার রক্ত চঞ্চল হয় কৌতূহল জাগে, রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে চোখ দুটো নিচে পাঠিয়ে দিয়ে ও মেহগনির খাটটা বা সবুজ দরজার বাথরুমটা দেখা যায় কিনা দেখতে চেষ্টা করে।
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘রূপালী মাছ’, ১৯৮২ : ২৩০)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতাংশটি মাধুরী-সহ জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের অন্তঃপুরের আরো কিছু নিঃসঙ্গ গৃহবধুর মনের চরম সত্য প্রকাশ করে দেয় যেন। শুদ্ধতার ব্যাপক ভার তাদের ক্লান্ত করে তোলে। উপরন্তু পবিত্রতার নিরন্তর নিঃশব্দ সাবধানবাণী এবং নরকের, নোংরামির ভয় তাদের মধ্যে তীব্র কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। তারা নিজেদের প্রবোধ দেয়, শাসন করে, চোখ ফিরিয়ে রাখতে চায়; তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। কেননা এই অধঃপতনে নিষেধ ভাঙার প্রলোভন আছে, উদ্‌যাপনের উন্মত্ততা আছে। তাছাড়া জীবনের ‘নীল মাছি’টিকে ‘স্বর্গে’ সুন্দর আর ‘নরকে’ নোংরা লাগে বটে, কিন্তু সে তো মানুষের ভাবনার বিহ্বলতা। মাছি তার নিজের মতোই থাকে, তাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করে নেওয়াটাই মুখ্য।

‘রূপালী মাছ’ গল্পে লেখক রহস্যময়তা তৈরি করার জন্য আরেকটি ইঙ্গিত দিয়ে ভাবনার গতিপথকে বিভক্ত করতে চেয়েছেন। তা হচ্ছে মাধুরীর সন্তান আকাঙ্ক্ষা। গল্পপাঠে একবার মনে হতে

পারে মাধুরীর পতনের পেছনে হয়তো রয়েছে সন্তান গর্ভে ধারণের প্রচ্ছন্ন বাসনা। যা সম্ভবত তার স্বামীর দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই হয়তো স্বপ্নে শিবদাসের নিচের ফ্ল্যাটে নেমে যায় সে। কিন্তু লেখক নিজেই গল্পের শেষে অন্য একটি সংকেত দিয়ে এই ইঙ্গিতের গতিপথ আটকে দেন। শিবদাসের ঘরে ঢুকতে না পারা মাধুরী সেখানে অন্য একজন নারীর উপস্থিতি আঁচ করে আহত হয়। উন্মত্ত রাগে নীল মাছিটিকে ধরতে গিয়ে সে রঙিন প্রজাপতিকে পিষে মারে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে ঘুমের ভেতর আবার স্বপ্ন দেখে – তার স্বামী পূর্ণেন্দু শিবদাসের বিয়ের ভোজ খেয়ে এসে সমালোচনা করছে, 'যদি এ্যাদ্দিনে বাউণ্ডুলেপনা কমে, কিন্তু যা জানোয়ারের মতন চেহারা একখানা, অথচ এমন নাইস ওয়ান্ডারফুল বৌ হয়েছে – শেষ পর্যন্ত কি ওটাকে ভালোবাসতে পারবে' ('রুপালী মাছ', ১৯৮২ : ২৩৭)। গল্পকার গল্পটিতে যতই দ্ব্যর্থবোধকতা তৈরি করার চেষ্টা করুন না কেন, শেষের অংশটুকুতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে অজীর্ণ রোগে ভোগা 'দেবতা'রূপী সাত্ত্বিক স্বামীর চেয়ে মাংসলোভী 'অসুর'রূপী শিবদাসই মাধুরীর কাছে আরাধ্য। গল্পটিকে আরেকটু রহস্যময় করে তোলার জন্য মাধুরীর সন্তানহীনতার দিকে ইঙ্গিত করলেও নিয়মের একঘেয়ে ক্লান্তি থেকে অনিয়মের বিশৃঙ্খলার আনন্দ ও আদিমতার দিকে ধাবমানতাই সম্ভবত এই গল্পের উপজীব্য। অন্য অংশটুকু হয়তো লেখকের বহুলব্যবহৃত কৌশল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারী মনস্তত্ত্বের প্রতিতুলনামূলক আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'টুকরো কাপড়' (*পতঙ্গ* ১৯৬১)। মা এবং মেয়ের দ্বন্দ্ব-সামঞ্জস্য নিয়ে ইতঃপূর্বে তাঁর 'খুকি' ও 'মেয়ে-শাসন' গল্পের আলোচনা করা হয়েছে। 'টুকরো কাপড়' একই ঘরানার গল্প হলেও এর আবেদন ভিন্নতর। গল্পটি মূলত দুটি উপগল্পের সমাহার। এর প্রথম ভাগে রয়েছে যৌবনের সিঁড়িতে সদ্য পা রাখা মেয়ের সঙ্গে যৌবনের শেষ প্রান্ত ছুঁইছুঁই মায়ের প্রতিযোগিতা। লেখকের বর্ণনায় :

> সেবা-র দিকে যদি পাঁচবার কেউ তাকায় তো অন্তত দু'বার তটিনীকেও দেখবে। তটিনী এটা ভাল করে জেনে ফেলেছে। এবং সেই দু'বারকে তিনবার করার লোভ তার যে কত প্রবল প্রখর সেবা বোঝে, দেখে, চুপ করে থাকে। কী, ছত্রিশ বছর বয়সে নারীর দ্বিতীয় যৌবন দেখা দেয়। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'টুকরো কাপড়', ২০১৫ক : ৭৩০)

পুরুষের চোখে দ্বিতীয় যৌবনের স্বীকৃতি পাওয়ার প্রবল তৃষ্ণা মায়ের (তটিনী) সঙ্গে মেয়ের (সেবা) দ্বন্দ্ব তৈরি করে। যৌবনের পড়ন্তবেলায় এসে নিজেকে প্রকাশের দুর্দমনীয় লোভ অন্যের উপেক্ষায় বাধা পেয়ে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। মায়ের আকুতি বুঝতে পেরে মেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চায়। তাতেও মায়ের অকারণ সন্দেহ থেকে মুক্ত হতে পারে না সে। তটিনীর ধারণা, সেবা চালাকি করেই মাকে সৌন্দর্যের সকল উপকরণ থেকে বঞ্চিত করতে চায়, মাকে হারিয়ে দিতে চায় এই

অসম প্রতিযোগিতায়। সম্ভবত যৌবনের শেষ গোধূলির আলোকে মেনে নিতে পারে না বলেই তটিনীর এমন মনে হয়, শেষ থেকে পুনরায় শুরু করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে সে।

গল্পের দ্বিতীয় ভাগে মেয়ের কাছে হার মেনে নিয়ে তটিনী যেন প্রথম যৌবনের স্মৃতিতে ডুব দিতে চায়, প্রথম প্রেমের সান্নিধ্যে এই ক্ষতের উপশম প্রত্যাশা করে। অথবা এমনও হতে পারে, সেখান থেকে শক্তি নিয়ে নতুন রূপে ফিরতে চায় আবার। কিংবা এসব কিছুই না হয়ে এমনও হতে পারে, যেই পুরুষ তাকে প্রথম নারীর স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই পুরুষকে দেখার মধ্য দিয়ে নিজের সেই সময়টাকে ফিরে দেখে নিতে চায় তটিনী – 'বাক্সে লুকিয়ে রাখা পুরনো কোনও জিনিস খুলে দেখার মতো' ('টুকরো কাপড়', ২০১৫ক : ৭৪০)। সেই সতীশের সামনে নিজেকে তরুণী করে রাখতেই মিথ্যে করে বলে তার মেয়ে এখনো ছোট। ফিরে আসার সময় সতীশ তার মেয়ের পুতুল খেলার জন্য টুকরো কাপড় দিলে তটিনীর দীর্ঘশ্বাস আরো জোরালো হয় :

> আঃ, সত্যি সেবা যদি আজ ছোট থাকত, সেবা যদি ছোট থাকত, – পুতুল খেলত, তটিনী কি আরও ক'টা বছর হাতে পেত না? না পেলেও অন্তত ওর সঙ্গে তো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হতো না তটিনীর। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'টুকরো কাপড়', ২০১৫ক : ৭৪৫)

পূর্বেই বলা হয়েছে, বহুবিচিত্রতায় অনন্য জ্যোতিরিন্দ্রের নারীরা। শিক্ষায়, রুচিতে, সংস্কারে, প্রেমে, কামে, প্রতিহিংসায়, বিচক্ষণতায়, অহংকারে তারা সকলেই একে অন্যের চেয়ে পৃথক এবং স্বমহিমায় ভাস্বর। সবকিছুতে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য তাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ ও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর তা হলো তাদের সতেজতা, তাদের সপ্রতিভতা। এই সৌন্দর্য দিয়ে তারা সবকিছুকে তুচ্ছ করতে পারে। যেখানে তারা নিজেরাই উপেক্ষিত সেখানেও তারা তাদের শৃঙ্খলিত সত্তা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে এই সপ্রতিভ সৌন্দর্যকে অবলম্বন করে। তারই সফল দৃষ্টান্ত 'দুর্বোধ' (*পার্বতীপুরের বিকেল* ১৯৫৯) গল্পের রুবি। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথাবদ্ধ, লক্ষ্মী গৃহিণী, পতিব্রতা স্ত্রী।

আপাতদৃষ্টে হোস্টেলের একগুচ্ছ আইবুড়ো মেয়ের মধ্যে রুবি ভাগ্যবতী, কারণ সঠিক সময়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে তার বিয়ে হয়েছে। রুবিও প্রথমদিকে তা-ই ভেবেছিল। তার স্বামী সমীর দিল্লির বড় চাকুরে; শ্বশুর-শ্বাশুড়ি-ভাসুর-জা-ননদ নিয়ে হইচই-হাসি-গানের সংসার। এত সুখের মধ্যেও দুঃখভারাক্রান্ত থাকে রুবি। তার বড় চাকুরে স্বামী রাতের অন্ধকারে মদ্যপ, মাতাল হয়ে ওঠে। হোটেলের নীহারদিকে সে চিঠি লিখে জানায় :

> ‘লোকে মদ খায়, নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। আমি কীসের নেশায় বুঁদ হয়ে আছি তোমরা জানো নীহারদি? ভদ্রতার নেশা, পালিশের নেশা, প্রেস্টিজের গোলাপি মদের মধ্যে আমি ডুব দিয়ে আছি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘দুর্বোধ’, ২০১৫ক : ৬১০)

কিন্তু সেই চিঠি রুবি ডাকে ফেলতে পারেনি। ‘ভদ্রতা-পালিশ-প্রেস্টিজ’ তাকে থমকে দিয়েছে। নিজের বিপর্যয়ের কথা, ব্যর্থতার কথা, সর্বোপরি নিজের নেশাগ্রস্ত স্বামীর এই দুর্বলতার কথা জানিয়ে সমবেদনা পেতে তার রুচি হয়নি। কেবল নীহারদিই নয়, স্বামীকে সে স্বামীর নিজের পরিবারের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, রেখেছেও। সমীরের পরিবারে কেউ যদি জেনে যায় তাতে সমীরের চেয়ে অপমানের আঘাত তাকেই বিঁধবে বেশি। সে যে সমীরের স্ত্রী, অর্ধাঙ্গিনী। এমনটা করাই প্রথাগত বাঙালি নারীর পক্ষে স্বাভাবিক। সেই সংস্কারকেই শ্রদ্ধা দেখাতে গিয়ে নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধাবোধকে হত্যা করেছে রুবি। যদিও তার পুরস্কারও সে পেয়েছে। পরদিন নীল পাথর বসানো আংটি উপহার এনেছে সমীর তার জন্য। এদিকে উভয় কূল রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়া রুবিকে চোখের জলের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে স্বামীর প্রশ্নের জবাবে সে জানায় :

> ‘দুঃখ না সুখ, – নতুন আংটি পরার সুখ পেয়ে কাঁদছি।’
>
> থমথমে গলা রুবির। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে।
>
> হাসতে গিয়ে সমীর মুখ বিকৃত করে।
>
> ‘কী জানি বাবা! তোমাদের মেয়েদের মন বোঝা শক্ত – আমি তো বুঝি নে।’
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘দুর্বোধ’, ২০১৫ক : ৬১১)

সমীর বুঝতে না পারলেও, রুবির যন্ত্রণা আঁচ করতে বেগ পেতে হয় না পাঠকদের। তার কান্নার হেতু, অপমানের জ্বালা অনুধাবন করতে পারা যায় সহজেই। গল্পের সমাপ্তি অংশে এসে রুবির মতোই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, বিলাস-বৈভব সত্ত্বেও সংসারহীনতার হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে সে। সেখান থেকে তার আশু নিস্তার নেই। এই রুবি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পরমসহিষ্ণু নারী চরিত্রগুলোর অন্যতম। এমনই কয়েকটি নারী চরিত্র ‘বধিরা’ (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পের পদ্মিনী, ‘দৃষ্টি’ (*বন্ধুপত্নী* ১৯৫৫) গল্পের অনু, ‘সোনার স্মৃতি’ (*পার্বতীপুরের বিকেল* ১৯৫৯) গল্পের রেবা।

সংসারের রূঢ় সত্যটা জেনে ফেলায় রুবির হতাশার বিপরীতে ‘সোনার স্মৃতি’ গল্পে মিথ্যার জালে আটকে পড়া রেবার আত্মত্যাগটুকুও সমান করুণার উদ্রেক করে। এই গল্পে রেবার চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত ও মৌন হলেও স্বামীর প্রতি তার অনুরাগ, স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিয়েতে অনাগ্রহ, বিয়ের চাপাচাপিতে

পালিয়ে আসা, সবকিছুতে তার স্বামী অসিতের প্রতি তার তীব্র ভালোবাসা প্রকাশ পায়। অথচ, রেবার স্বামী অসিত জীবদ্দশায় মদ্যপ ও লম্পট ছিল। শহরতলিতে থাকা অসিতের স্ত্রী ও মা কেউই জানত না তার বেপরোয়া জীবনের কথা, কলকাতার উল্টোডাঙার বস্তির কোনো এক দেহপসারিণীকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করার কথা। এমনকি তারা এও জানতে পারেনি যে, অতিরিক্ত মদ্যপান করেই অসিত লিভার নষ্ট করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তাদের মনে অসিতের একটা ভিন্ন প্রতিরূপ স্থাপিত হয়ে ছিল। তাই তার স্ত্রী রেবার যখন এক সচ্ছল ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবারে আবার বিয়ে ঠিক হয়, বর্তমানের আর্থিক দুরবস্থা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চিতি সবকিছুকে উপেক্ষা করে সে অসিতের স্মৃতিকে অবলম্বন করে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে অসিতের ছবি বুকে নিয়ে পালিয়ে কথকের কাছে কলকাতায় চলে আসে; কথক যেন তার শ্বাশুড়িকে বুঝিয়ে বলেন তার মনের অবস্থার কথা। কথক অসিত সম্পর্কে সব তথ্য জেনেও স্থানীয় অভিভাবক হিসেবে তার কোনো প্রতিকার তো করতেই পারেননি, উপরন্তু লজ্জায় অসিতের মা ও স্ত্রীর কাছে সব সত্য গোপন করেছেন। সত্য জেনে 'দুর্বোধ' গল্পে রুবির যে পরিণতি, সত্য না জেনে রেবার পরিণতি তার চেয়েও ভয়াবহ। রুবির তবু শুধরে নেওয়ার সুযোগ আছে, চোখের জল আর অসিতের স্মৃতি ছাড়া রেবার কিছুই নেই।

নারীর বিচিত্র মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি রচনা 'বনানীর প্রেম' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭)। এই গল্পে একক নারী নয়, বরং একই দুর্ভাগ্য ও সমস্যার জালে জড়ানো একাধিক নারীর সমন্বিত মনস্তত্ত্বকে লেখক একজন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। নিজ নিজ পরিবারকে বাঁচানোর তাগিদে গ্রাম থেকে শহরে চাকরি করতে আসা এই নারীরা শহরতলিতে এসে ঠাঁই গেড়েছে। কথকের ভাষায় – 'শহরের খিড়কির দরজায় আছি আমরা। পুরোপুরি সাহস হল না বলে শহরের ভিতরে ঢুকবার অধিকার রইল না' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বনানীর প্রেম', ২০১৫ক : ৪৮১)। গ্রাম থেকে আসা এই নারীদের শহুরে জীবনে প্রবেশে সংকোচ আর দ্বিধার মধ্যে লেখক তাদের অনভ্যাসজনিত ভীরু মানসিকতার ইঙ্গিত রেখে যান। তাই বলে শহুরে জীবনযাপনের প্রতি তাদের তীব্র কৌতূহল, আকাঙ্ক্ষা কিংবা লোভ নেই, এমন নয়। তা পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, তবে তারা জানে অপ্রস্তুত অবস্থায় শহরে ঢুকলে শহরের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারার ব্যর্থতায় তারা তলিয়ে যেতে পারে, কিন্তু প্রস্তুতির পথনির্দেশও ছিল তাদের অজানা।

তারা শহরের ভেতর ঢুকতে না পারলেও কাঙ্ক্ষিত কলকাতা শহর যেন নিজেই তাদের কাছে এসে হাজির হয়। শহরতলিতে তাদের টিনের বেড়া ও টালির ছাদ দেওয়া শিক্ষয়িত্রী নিবাসে এসে যোগ দেয় বনানী নামের আরেকজন তরুণী। তার প্রেম, আবেগ, সরল মানসিকতা দেখে অন্যরা অবাক হয়; শহর সম্পর্কে তাদের অনর্থক ভয় অমূলক প্রমাণিত হয় আপাতভাবে। শহুরে তরুণীটির আচরণ দিয়ে শহরকে একটু একটু করে চিনতে শুরু করছিল তারা, আশান্বিত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। কিন্তু ঘটনাক্রমে

তাদের আশাভঙ্গ করে তরুণীটি আবার শহরে ফিরে গেলে তাদের মুক্তির দরজাটি পুনর্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। শহরের প্রতীক হিসেবে আগত বনানীর সাময়িক উপস্থিতি তাদের নগর-পিপাসাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কথকের দীর্ঘশ্বাসে তা-ই যেন ফুটে উঠে – 'যেন কতকাল পর, কতদিন বাদে, মাঠের এই টালির ঘরে একটি পাখি উড়ে এসেছিল – একটি প্রাণ' ('বনানীর প্রেম', ২০১৫ক : ৪৮৭)। অন্যদিকে এ গল্পে বনানী নামের শহুরে মেয়েটির অস্থির অসহিষ্ণু ভিন্ন মনস্তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বনানীর বাস্তবতা উপস্থিত অন্য পাঁচজন নারীর চেয়ে আলাদা। তার সংগ্রাম মনোজাগতিক, অবাধ আবেগপ্রসূত। বাকিদের মতো গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা, পরিবার রক্ষার ভাবনা থেকে মুক্ত সে। সেই স্থান দখল করে আছে তার সরল প্রেমের আকুতি। বনানী শহুরে সম্ভ্রান্ত ঘরের সম্ভাবনাময় তরুণী। পরিবারের অমতে ভালোবেসেছে সংগ্রামী এক তরুণকে। অসুস্থ প্রেমিককে বাঁচাতে আশায় বুক বেঁধে শহরতলিতে ছুটে এসেছে স্কুল শিক্ষয়িত্রীর চাকরি নিয়ে, যদিও তার প্রেমিকের তা পছন্দ নয়। নিজে যুদ্ধ করে নিয়তির জালে আটকে গেলেও প্রেমিকাকে জীবনের জঞ্জালে ঠেলে দিতে নারাজ বনানীর প্রেমিক। তার মধ্যবিত্তসুলভ ভীতি – বনানীর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এতে। ভালোবাসার টান ও বাস্তবতা বুঝতে যে হৃদয়, বিচক্ষণতা ও উদারতার দরকার হয় বনানীর প্রেমিকের মধ্যে তা ছিল না বলেই বনানীর চোখে প্রেমিকের অবস্থান নিচে নেমে যায়। পার্থিব দারিদ্র্যকে পরিশ্রম দিয়ে জয় করতে এসে প্রেমিকের মনের দারিদ্র্যের পরিচয় পেয়ে সবকিছু অর্থহীন হয়ে ওঠে তার কাছে। সে আবার ফিরে যায় সচ্ছল জীবনের নিরাপদ আশ্রয়ে।

নারীর বহুকৌণিক মনস্তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি গল্প 'কালো বউদি' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১)। গল্পটির নাম 'কালো বউদি' হলেও গল্পটি মূলত হিমি আর নিমি নামে প্রায় সমবয়সী দুই বোনের প্রেম ও যৌনাকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। দুই বোনের মধ্যে হিমি বড়, শারীরিক গঠনেও নিমির চাইতে আকর্ষণীয় এবং পুরুষের প্রতি সম্ভোগলিপ্সা প্রকাশেও সে নির্লজ্জ। গল্পের দুই পুরুষ চরিত্র শশী ও শিবানন্দের প্রতি তার প্রেম নেই, শুধুমাত্র যৌনবাসনায় তাড়িত হয়ে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে। এ নিয়ে তার মধ্যে প্রথাগত কোনো পাপবোধ কাজ করে না। তাই নিমির জেরার মুখে তার কাছে সে অকপটে স্বীকার করে ফেলে – 'ওই একটু ভালবাসাবাসি আর কি, তা না হলে যদি তুই মনে করিস আমি ঐ দেড় আঙুলে রোগা ডিগডিগে শশীকে বিয়ে করব! কক্‌খনো না!' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কালো বউদি', ১৯৯১ : ২৮)। অন্যদিকে বয়সের স্বাভাবিকতায় তারুণ্যের তাড়নায় ছোট বোন নিমিরও পুরুষের প্রতি আকর্ষণবোধ আছে। কিন্তু হিমির তুলনায় যৌবনোদ্ধত শরীর না হওয়ায় এবং হিমির মতো বেপরোয়া না হতে পারায় সে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে যায়। সংস্কারের বাঁধন তার চরিত্রকে ম্লান করে দিয়েছে, এ কথা যেমন সত্য, আবার একইসঙ্গে এও সত্য যে, হিমির তুলনায় আকর্ষণ করার ক্ষমতার ঘাটতিতে এবং নিষ্প্রভ ভঙ্গির কারণে আকাঙ্ক্ষাকে

মাত্রা দিতে না পারার ব্যর্থতাকে অগ্রাহ্য করার জন্য সে সংস্কার ও লোকলজ্জাকে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। নিমির শারীরিক তাড়না হিমির মতো প্রবল নয়, শুধু যৌনতৃষ্ণা চরিতার্থ করতে হ্যাংলা-পাতলা শশীর কাছে যাওয়া তার পোষাবে না, শিবানন্দের মতো সুপুরুষই কেবল তার আকাঙ্ক্ষাকে প্রজ্বলিত করতে পারে। কিন্তু তার আড়ষ্ট ভাব তাকে সেই পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সাহস জোগায় না।

কিন্তু হিমি তার চাহিদা সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে সে কোনো বাছবিচার করে না। আবার একইসঙ্গে নিজের পছন্দের মানুষকে অন্য কেউ কেড়ে নিলে মুহূর্তে সে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। যে অপরাধে সে নিজে অপরাধী, একই অপরাধে অন্যকে শাস্তি দিতে তৎপর হয়ে ওঠে হিমি। কথকের বর্ণনায় হিমির উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে এভাবে :

> 'এসব বদমাইশি চলবে না এ বাড়িতে।' হিমি আর একবার দাঁতে দাঁত ঘষল।
> 'ভাড়াটেকে নিয়ে বেলেল্লাপনা কালই আমি বাড়িওয়ালাকে বলে ওদের তুলে দেব।'
> 'আমার মনে হয় জলধরদা টের পেলে গলায় দড়ি দেবে।' নিমি বলল।
> হিমি শব্দ করল না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কালো বউদি', ১৯৯১ : ৪৪)

অথচ এর পূর্বে হিমির অপরাধের প্রতিক্রিয়ায় শশীর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিল। এ নিয়ে হিমির অনুশোচনা নেই। এবং পূর্ববর্তী ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, কালো বউদির স্বামী জলধরদাও এটা মানতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। তাতেও তার কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা নেই। পুরো গল্পে হিমি আর নিমি আপন বোন হলেও দুজনের চরিত্র নির্মাণের ভিন্নতায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর সূক্ষ্ম চরিত্র চিত্রণের দক্ষতায় হিমি ও নিমি দুটো চরিত্রই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে পাঠকের সামনে।

যদিও সেই অর্থে চরিত্রটি সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি, তবুও 'রূপকথার রাজপুত্র' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১) গল্পের হেম-কে হিমির সম্পূরক চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিধবা হেম শরীরী তাড়নায় প্রৌঢ় বয়সেও নিজের কন্যার প্রেমিকের উদ্দেশে ভ্রুভঙ্গি করতে অস্বস্তি বোধ করেনি। মেয়ের পছন্দের অপর মানুষটির বহুগামী স্বভাব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সে তার প্রতি অনুরক্ত হতে কুণ্ঠাবোধ করেনি, বরং কন্যার প্রশ্নের জবাবে তার দ্বিধাহীন উত্তর – 'এই বয়সে এর চেয়ে ভালো কোথায় পাব!' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রূপকথার রাজপুত্র', ১৯৯১ : ২৫৬)।

নারী চরিত্রকে মুখ্য করে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি গল্প 'ফুল ফোটার দিন' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প ১৯৯১) । গল্পে নয়না নামে সদ্যযৌবনা এক তরুণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় যাকে যাপিত জীবনের পঙ্কিলতা এখনো আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সে তার প্রেমিকের অকারণ সন্দেহে মুষড়ে

পড়ে। প্রেমিকের মিথ্যে সন্দেহ তার আত্মসম্মানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলেই শুধু নয়, একইসঙ্গে এতে তার স্বকীয়তা ও সারল্যও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। 'সিনেমায় নামবার মতো সুন্দরী' হওয়া সত্ত্বেও সে তার প্রেমিকের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল। বরং তার সৌন্দর্যকে তার প্রেমিক বিশ্বাস করতে পারেনি। যার কারণে তাকে নিজের জীবন দিয়ে অক্ষুণ্ন রাখতে হয়েছে তার সম্মান। প্রেমিকের প্রতারণার প্রতিশোধও নিয়েছে সে এই আত্মাহুতির মাধ্যমে।

গল্পটিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর রসোত্তীর্ণ গল্পের কাতারে ফেলা না গেলেও এতে নবযৌবনা নারীর সরলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই গল্পে সুন্দরের প্রতি, সুন্দরী নারীর প্রতি লেখক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রের এক ধরনের নিষ্ঠুরতাও হয়তো প্রকাশ পেয়েছে। যেন ধ্বংস হয়ে যাওয়াই সুন্দরের পক্ষে সর্বোত্তম। কিংবা বলা যায়, পরিণতিহীন ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তীব্র সৌন্দর্যের বিনাশ ঘটে।

এরকমই আরেকটি গল্প 'নিষ্ঠুর'। নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর হয়ে পড়েন, যা তাঁর 'নিষ্ঠুর' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পে কথকের বয়ানে প্রকারান্তরে তিনি স্বীকারও করেছেন :

> 'আমার কোন গল্প আপনার ভাল লেগেছে?' করবী মুখ তুলতে কমলেশ বলল।
>
> 'সব।' করবী একবার দীপককে দেখল, তারপর কমলেশের চোখে চোখ রাখল।
> 'গল্পগুলো কেমন?'
>
> 'নিষ্ঠুর।' স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সাহিত্যিকের প্রশ্নের জবাব দিল করবী। তারপর চোখ নামাল।
>
> শব্দ করে সাহিত্যিক হাসল।
>
> 'নিষ্ঠুর কে? আমি, না গল্প?'
>
> করবী এবার জবাব দিল না। দীপক মন্থর হাসল, 'তোমার চা জুড়োয়।'
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'নিষ্ঠুর', ২০১৫ক : ৪৫৩)

সেই মুহূর্তে করবী উত্তর না দিলেও একটু পরেই পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে নারীকে নিষ্ঠুর রূপ দেওয়ায় কথকের বিচার চেয়ে বসল যেন :

> 'এত নিষ্ঠুর করতে গেলেন কেন রেখাকে?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ও।
>
> 'বলুন, এত রূপ ছিল কেন মেয়ের?' কমলেশ ঘাড় ফিরিয়ে মুখের ধোঁয়াটা অন্য দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মন্থরভাবে হাসল। (জ্যোতিরিন্দ নন্দী, 'নিষ্ঠুর', ২০১৫ক : ৪৫৩)

এই গল্পে লেখক নিজেই কথকের মাধ্যমে জানাচ্ছেন, তার গল্পের নারী চরিত্রকে নিষ্ঠুর করে ফুটিয়ে তোলার জন্য লেখক নিজে নয়, বরং নারীটির রূপই দায়ী। অথচ এই রূপেরও স্রষ্টা লেখক নিজেই। জ্যোতিরিন্দ্রের 'নিষ্ঠুর' গল্পের সংলাপ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি তাঁর গল্পের চরিত্রদের আকার ও বৈশিষ্ট্য দিলেও মূলত সেই আকার ও বৈশিষ্ট্যই তাদের পরিণতি নির্ধারণ করে দেয়। এক্ষেত্রে লেখকের কোনো হাত নেই। এই বিশ্লেষণ থেকে কয়েকটি আলাদা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে। প্রথমত, জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর নারী চরিত্র নির্মাণে যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন সেই বিষয়ে তিনি জ্ঞাত। এসব ক্ষেত্রে তিনি চরিত্রের রূপ ও বৈশিষ্ট্যের উপর এর দায় চাপিয়ে দিয়ে নিজে নির্ভার থাকতে চান। তবে তিনি যতই দায় এড়াতে চান না কেন, অনেক গল্পে লেখক অপ্রয়োজনীয়ভাবে গল্পের নারী চরিত্রটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনো কখনো তা এত আকস্মিক ও লাগামছাড়াভাবে সংঘটিত হয়েছে যে, গল্পের বিন্যাস ও বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইসঙ্গে লেখকের নিরপেক্ষতা ও নির্মোহতাও প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। 'খুকি', 'ক্যামাক স্ট্রিটে' ইত্যাদি গল্পে নারী চরিত্র রূপায়ণে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী খাদগুলো সমানভাবে ভরাট করতে পারেননি। আবার এও সত্য, কোথাও কোথাও খাদ নিজেই শিল্প হয়ে উঠেছে। 'গিরগিটি', 'শ্বাপদ' ইত্যাদি গল্প তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'দুই অঙ্ক' (*উল্টোরথ* ১৯০৩ শকাব্দ) গল্পটি চরিত্রের প্রতি, বিশেষত নারী চরিত্রের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতার আরেকটি উদাহরণ। আকস্মিক পরিণতিতে এ গল্প পাঠককে বিচলিত করলেও নারীর মনস্তত্ত্বের সরল, সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভিন্ন দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এতে। চায়ের দোকানদার হারানের উপলব্ধি ও বর্ণনায় দুজন তরুণীকে লেখক রূপায়িত করেন, যারা পরস্পরের বান্ধবী ও সরকারি দুধের দোকানের সহকর্মী। হারান তাদের প্রতি বিরক্ত, কিছুটা রাগান্বিতও বটে। কারণ চা দিতে হারান তাদের দোকানে এলে তারা হারানকে দেখে হাসে। 'কালো'টি যত হাসে, 'ফরসা'টি তার চারগুণ হাসে, হাসতে হাসতে তারা এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে। তাদের হাসির কারণ খুঁজে পায় না বলে হারানের রাগ প্রতিদিন একটু একটু করে চড়তে থাকে।

ঘটনাক্রমে একদিন চা দিতে গিয়ে সে দেখে, কালো মেয়েটি সেদিন অনুপস্থিত আর ফরসা মেয়েটি চোখের কোণে জল নিয়ে মুখ কালো করে বসে আছে। মেয়েটির চোখের জল হারানকে কৌতূহলী ও আনন্দিত করে তোলে। অনুসন্ধানে জানতে পারা যায়, কালো মেয়েটির আকস্মিক বিবাহই এই কান্নার কারণ। হারানকে দেখে এ ওর গায়ে ঢলে পড়তে পারবে না বলে মেয়েটির বিয়ের সংবাদে সে আনন্দিত হয়ে ওঠে। কিন্তু পরদিন অপর বান্ধবীর অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে জানা যায় যে, সে আত্মহত্যা করেছে, কেননা তার বান্ধবী তার (অপর বান্ধবীর) প্রেমিককে বিয়ে করেছে। এটি এমন এক অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা যেখানে একজনের পক্ষ থেকে আসা আঘাতই সহ্য করা অসম্ভব, সেখানে মেয়েটি যখন তার দুজন প্রিয়

মানুষ (প্রেমিক ও বান্ধবী) দ্বারা একইসঙ্গে এমনভাবে প্রতারিত হয় তখন তার কাছে বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। নারীমনের এমন আকস্মিক পরিবর্তন হারানকে বিস্মিত করলেও এ যেন এক শ্রেণির নারীর চিরন্তন রূপ। প্রতারণার শিকার হলে যাদের কাছে বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আরেক শ্রেণি যারা স্বার্থের জন্য এতটাই বেপরোয়া হয়ে পড়ে যে, তাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। প্রিয় বান্ধবীকেও আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয় না। আলোচনার বিষয় যদিও নারী চরিত্র, কিন্তু এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারী চরিত্ররা প্রধানত যৌবনবতী তরুণী। জীবনের অন্যান্য বিপর্যয়ের সঙ্গে তাদের যৌবনের বাসনা-কামনা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তৃপ্তি-অতৃপ্তি ইত্যাদি সম্পৃক্ত। কোথাও তা প্রত্যক্ষভাবে তাদের জীবনে অভিঘাত সৃষ্টি করে, কোথাও পরোক্ষভাবে। তাঁর সৃষ্ট কিছু চরিত্র মধ্যযৌবনা হলেও তারাও একই মনস্তত্ত্বের জটিল জালে আবদ্ধ। নিজেকে নতুন করে পাওয়ার, দেখার ও দেখাবার ইচ্ছা, যৌবনকে উপভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তাদের জীবনে নিত্যনতুন কাহিনির জন্ম দিচ্ছে। লেখক সেই কাহিনিসূত্রকে নিরাসক্তভাবে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর গল্পে। সব গল্পে যে তাঁর অনুসরণ নিরপেক্ষ ছিল এমন নয়, অনেক গল্পে তা নিভাঁজ হয়ে স্পষ্ট হলেও কিছু গল্পে তা শ্রীহীন আকারও নিয়েছে। তবে একইসঙ্গে এও স্বীকার্য, জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর নারী চরিত্রদের মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র ভাঁজগুলো এত নিবিড় করে, এত অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন যে, তাঁর নারীরা জীবন্ত রূপে প্রকাশিত হয়েছে পাঠকের সামনে। এই লেখকের নারী চরিত্রগুলো তাদের বহুকৌণিক রূপবৈচিত্র্য ও নিখাদ প্রাণপ্রাচুর্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে রাখবে।

সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারীদের একটি বিশাল অংশ স্বাধীনচেতা। পূর্বেই বলা হয়েছে, নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সূচিত পরিবর্তনের অভিঘাতে বিশ শতকের কথাসাহিত্যের নারীদের মধ্যে স্বতন্ত্র স্বর ও জাগরণের সূচনা ঘটে। যার মূলে ছিল মূলত নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষায় নারীর সচেতন ভূমিকা। প্রায় ক্ষেত্রেই সেটি ছিল তাদের শিক্ষা, রুচি, চাকরি প্রভৃতির সুবাদে পরিবারের বিরুদ্ধে অবস্থান। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারীদের স্বাভাবিক প্রবণতা সেটি নয়। তাঁর নারীদের বড় একটি অংশ সেই স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ যা কেবল তাদের সচ্ছলতাই এনে দেবে না, তাদের দৈনন্দিন জীবনকে মসৃণই করবে না, তাদের শরীরী অবদমনের প্রশমনেও কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাঁর গল্পের নারীদের কেউ দারিদ্র্য ঘোচাতে তথাকথিত সতীত্বের বাঁধন কিছুটা আলগা করেছে, কেউ সচ্ছলতার আশায় পঙ্কিল পথে হেঁটেছে; কিন্তু তাদের অপ্রতিম রূপ প্রতিমা লাভ করেছে আরাধ্যকে অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের একাগ্র কৌশলে, অপ্রতিরোধ্যতায়। তাদের কেউ কেউ

এর জন্য সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি, আবার কেউ কেউ স্বামী কিংবা সংসারকে ঠিক রেখে আত্মপ্রেমে সাড়া দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনো কোনো নারী স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তা অথবা স্বামীকে পরিত্যাগ করেছে অথবা বিধবা, কেউ কেউ স্বামীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়ে এবং কেউ কেউ কেবল সামাজিক দৃষ্টিতে স্বভাবদোষেই স্বেচ্ছাচারী। কেউ আবার প্রেমের ব্যাপারে ফ্যান্টাসিতে ভুগেছে স্বামী কিংবা প্রেমিকের সঙ্গে তার রুচিবোধের ভিন্নতায়। কেউ কেউ স্বামী দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠেছে সেই প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থা অপরিবর্তনীয় রেখে, স্বামী যা করেছে তা-ই সে স্বামীর অজান্তে প্রত্যাঘাত হিসেবে ফিরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে কিছু পরমসহিষ্ণু নারীর দেখাও মেলে। তাঁর গল্পের নারীদের স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের আত্মপ্রেম, আত্মসচেতনতা ও জীবনবাদিতা। এদিক থেকে তারা রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালির* বিনোদিনী, গার্সিয়া মার্কেসের এরেন্দিরা (‘Innocent Eréndira and Her Heartless Grandmother’ ১৯৭২) চরিত্রের সমতুল্য হলেও আত্মপ্রেম তথা আত্মসচেতনার নিরিখে তাদের অবস্থান ভিন্ন। এই প্রেম কর্তৃত্ব খাটানোর তাগিদে নয়, পুরুষকে টেক্কা দেওয়ার প্রতিযোগিতায় নয়, তাদের অচরিতার্থ মনোবাসনা যা কিনা প্রায়শই প্রেম ও কামনা-বাসনা, সেটিকে নির্দিষ্ট মাত্রা দেওয়াই এর লক্ষ্য। তাই বলা চলে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নারীরা তাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর – স্বভাবে ও আত্মসচেতনতায়। নারী চরিত্রের এই স্বভাবসুলভ তির্যকতা, তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় রহস্যজটিল মনোজগতের এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে অনায়াস দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিসর্গচেতনা

জীবনের সব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার নিয়ে মানুষের মন ও মনন গড়ে ওঠে। যে মানুষ যে প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠে তার ছাপ সে বয়ে চলে জীবনভর। আবার মানুষের দীর্ঘ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন পর্বে আলাদা আলাদা প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের মধ্যে দূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মানুষ তার মনের গঠন অনুযায়ী নির্দিষ্ট নিসর্গে একদিকে যেমন সাময়িকভাবে আন্দোলিত হয়, তেমনি প্রকৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব মানব-মনের দীর্ঘকালীন বিকাশেও অমোচনীয় ছাপ রেখে যায়। আজীবন প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধে নিমগ্ন ছিলেন বলেই নিসর্গনির্ভর এমন সব গল্প রচনা করা সম্ভব হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পক্ষে। এ ক্ষেত্রে তাঁর ইন্দ্রিয়সচেতনতা তাঁকে প্রণোদনা জুগিয়েছে। শৈশবে ঠাকুরদার সঙ্গে বেড়াতে গেলে তাঁর নাকে লেগে থাকত জলে-ডোবানো পাটের পচা গন্ধ, পুঁটি-মৌরলা-খলসে মাছের আঁশটে গন্ধ। হেলিডি সাহেবের বাংলোয় সদ্য-ফোটা গোলাপের আভা ও সুবাস তাঁকে সেই বয়সেই রোমাঞ্চিত করত। নিতান্ত শৈশবে মামার বাড়ি বেড়াতে গেলে পাখির রঙিন পালক, বাসি বকুল ফুল, ছোট ছোট বালি-পাথর তাঁকে আপ্লুত করেছিল। এসব কিছুই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায় (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব.)। প্রকৃতি তাঁকে এমন মোহাবিষ্ট করে রাখতে পেরেছিল বলে তাঁর পক্ষে ‘সমুদ্র’ (১৯৬১) কিংবা ‘গিরগিটি’ (১৯৫৬)-এর মতো রসোত্তীর্ণ গল্প লেখা সম্ভব হয়েছিল।

এই উপমহাদেশের প্রাচীন সাহিত্যে মানবচেতনায় নিসর্গের সর্বময় উপস্থিতির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত কালিদাসের (আনুমানিক ৫ম শতক) রচনা। বিরহব্যাকুল যক্ষ তার দয়িতার নিকট বার্তা প্রেরণের জন্য নিসর্গের কাছে নিজেকে সমর্পিত করেছে। নিসর্গ তার মানসজগৎকে গভীরভাবে আবিষ্ট করেছে। বপ্রক্রীড়ারত মেঘ কিংবা আকাশে উড়ে চলা বলাকার সারি পর্যবেক্ষণের সময়ে বর্ষার উর্বরতা তার সংগুপ্ত কামনাকে জাগিয়ে তুলেছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও নিসর্গ কবি-হৃদয়ে সঞ্চারিত করেছে বিরহের অনুভূতি, ‘এ সখী হামারি দুখের নাহি ওর/ এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর’ (রায় শেখর ১৩৫৩ ব. : ৩২২)। এর পর দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পল্লি-প্রীতি ও নিসর্গমনস্কতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। শিলাইদহ পর্বের গল্প ‘মেঘ ও রৌদ্র’ (১৩০১ ব.), ‘অতিথি’ (১৩০২ ব.), ‘বোষ্টমী’ (১৩২১ ব.)-সহ পূর্ববঙ্গে রচিত প্রায় বারোটি গল্পে প্রকৃতির নিবিড় রহস্যময়তার মধ্যে মানব-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে নির্ণয় করেছেন তিনি, বারংবার পরখ করেছেন নিসর্গ কী করে সংক্রাম ঘটাচ্ছে চরিত্রগুলোর মননে। কথাসাহিত্যের বাইরে তাঁর পত্রসাহিত্যে নিসর্গের আদিমতায় আর মোহাবেষ্টনে খুঁজে পেয়েছেন

জীবনের গাঢ়তম রূপ; দেখেছেন মানুষের বিচিত্র প্রবণতা আর উপলব্ধির নব নব রূপায়ণ। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পরিচিত হয়েছি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের সঙ্গে। বিভূতিভূষণ পল্লি-প্রকৃতির নৈসর্গিক জীবন তুলে ধরেছেন, তাঁর ভাষামাধুর্যের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্তি পেয়েছে মানব জীবনের অন্তর্লীন সত্তা। প্রকৃতির আশ্রয়ে বেড়ে ওঠা *পথের পাঁচালী* (১৯২৯) উপন্যাসের অপু বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে পাঠকপ্রিয় চরিত্রগুলোর একটি। *আরণ্যক* (১৯৭৬) উপন্যাসের কথক সত্যচরণকে লেখক বিভূতিভূষণেররই মানসপুত্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সে নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে বন কেটে বসতি স্থাপন করার লক্ষ্যে লবটুলিয়ার নির্জনতম প্রকৃতির মধ্যে এসেছে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসকারী এই মানুষটিই ধীরে ধীরে লবটুলিয়ার প্রকৃতির প্রেমে পড়ে সেখানকার মানুষের ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে লালন করতে থাকে।

প্রকৃতির এই নিবিড় সান্নিধ্যে মানুষ একসময় নিজের অজান্তেই অতল-সমাহিত চেতনা দ্বারা প্রভাবিত ও পরিচালিত হয়ে নিজেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করতে চায়। এখানে অরণ্য মন-ভোলানো চিত্রকল্পে ধরা দেয় না। অরণ্য এখানে মানুষকে নির্মাণ করে, তার চরিত্রের বিকাশে, পরিবেশের সঙ্গে লড়াইয়ের উপাদানকে দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে। এদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'রূপসী বাংলার কবি' জীবনানন্দ দাশের উত্তরসাধক। জ্যোতিরিন্দ্রের নিসর্গকেন্দ্রিক গল্পগুলোতে নিসর্গ বিভিন্ন চরিত্রকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করেছে। তাঁর গল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক বলেন :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রকৃতির প্রেমিক। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় যেমন পঞ্চইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি অনুভূতি একাকার হয়ে মিশে থাকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও প্রত্যেকটি অনুভূতি মিলে মিশে একাকার হয়ে পাঠকের কাছে ধরা দেয়। (নীহার শুভ্র অধিকারী ২০১৮ : ২১৬)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বেশ কয়েকটি গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে মানব-মনের উপর নিসর্গের বহুমাত্রিক প্রভাব। এসব গল্পে এমন সব চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় যারা প্রকৃতির প্রভাবে নিজেদের অন্তর্গত সত্তাকে পুনরাবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির সান্নিধ্যেই এ সকল চরিত্রের অন্তর্জগতের উন্মোচন ঘটেছে। এই চরিত্রগুলো নিজেরাও হয়তো তাদের হৃদয়ের এই আকস্মিক আন্দোলনকে ব্যাখ্যা করতে পারেনি, কিন্তু তারা অনুভব করেছে যে, নিসর্গের সান্নিধ্যে তাদের অর্গল ক্রমশ খুলে যাচ্ছে। 'বৃষ্টির পরে' (১৯৬১) গল্পের কথককে আমরা বলতে শুনি – 'প্রকৃতি যাদের সায় দিয়েছে তাদের রুখবার ক্ষমতা কি কারও আছে?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বৃষ্টির পরে', ২০১৫খ : ৬৯)। কথকের এই উক্তির সমর্থন মেলে জ্যোতিরিন্দ্রের 'সমুদ্র' গল্পে। সাগরের কাছে এসে একজন শহুরে মানুষের উদ্বেল আবেগের অবারিত

বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় গল্পটিতে। একইসঙ্গে সাগরের তীব্র সম্মোহনে বিশ বছর ধরে আটকে থাকা আরেকটি মানুষের আত্মনিবেদনের ইতিহাস ধ্বনিত হয়ে ওঠে। গল্পের শুরুটাই যেন প্রকৃতির বিশালতার কাছে তুচ্ছ মানুষের সমর্পণের ইঙ্গিতকে স্পষ্ট করে তোলে :

> সেই রাত্রে আমি ঘুমাতে পারিনি। বা বলা যায় ঘুমাতে চাইনি। যেন দু-তিনবার আমার চোখের পাতা জড়িয়ে এসেছিল। জোর করে চোখ খুলে রেখেছি। তাতে ফল হয়েছে। আর ঘুম আসেনি। জেগে থেকে রাত্রির ভয়ংকর শব্দ শুনেছি, অন্ধকারের গর্জন। যেন অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে একটা মেঘ দূরে কোথাও মাটির কাছে নেমে এসে সারাক্ষণ গুরগুর করে ডাকছিল। কান পেতে গভীর গম্ভীর শব্দটা শুনেছি। বার বার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হয়তো সেই শব্দ শুনতে আমি জেগে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে কেউ নতুন করে তৈরি করছে; ঢালাই গড়াইয়ের কাজ চলছে; বা অদৃশ্য কোনো শক্তি এই সৃষ্টি ভেঙে দিচ্ছে – দূর থেকে ভাঙার কাজ আরম্ভ হয়েছে, ভাঙতে ভাঙতে ক্রমে এখানে চলে আসবে সেই শব্দ। এই ঘরের ভিত ভাঙবে, দেয়াল ভাঙবে। ভয়ে বুক কাঁপছিল। বুক কাঁপছিল; আবার আশ্চর্য এক সুখ, একটা নিশ্চিন্ততা নিয়ে আমি কান পেতে ছিলাম। নতুন সৃষ্টির শব্দ শুনতে, নতুন ধ্বংসের গর্জন শুনতে কার না ভালো লাগে! (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সমুদ্র', ২০১৫খ : ৪০)

ঢেউয়ের নিনাদে সম্মোহিত গল্পের কথক বেড়াতে আসার প্রথম রাতেই সমুদ্রের বিশালতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে; অথচ তখনও তার পূর্ণ সমুদ্র-দর্শন ঘটেনি – দিনের আলোয় সাগরকে চাক্ষুষ করা হয়ে ওঠেনি। তাতেই নিজের তেজস্বিনী স্ত্রীকে ঘুমন্ত খরগোশ বলে মনে হতে থাকে তার; স্ত্রীর নগ্ন শরীরকে দেহ-সমুদ্র ভেবে পূর্বে যে মূঢ় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল আজ সমুদ্রের হাতছোঁয়া দূরত্বে এসে সে নিজেকে এজন্য তিরস্কার করতে থাকে। সে ভাবতেও পারেনি তার সমস্ত অতীতকে সমুদ্র এমন তুচ্ছ করে দেবে। এ যেন প্রমত্ত প্রকৃতির প্রকাণ্ড মুখশ্রী; এক সহস্রমুখ দানব, যাকে বশ করা অসম্ভব। আর শাসন করা কল্পনারও বাইরে। বরং এই রুদ্রের কাছে নিজেকে কীটাণুকীট প্রায় একটা বুদ্‌বুদের মতো ক্ষীণায়ু রূপে কল্পনা করতে ভালো লাগে কথকের।

পরদিন দিনের আলোয় সাগর দেখতে গিয়ে স্ত্রীর ভাষায় বিচ্ছিরি এক বাজে লোকের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে তার। এই লোকটাই গতদিন তাদের হোটেল ঠিক করতে সাহায্য করেছিল। এখানে আসার পর থেকে অন্যরাও তাকে লোকটা সম্পর্কে সতর্ক করেছে বারবার। কিন্তু মানুষটির সংস্পর্শে এসে সে আবিষ্কার করে সমুদ্রের ব্যাপারে তার নিজের উচ্ছ্বাস ওই লোকটার সাধনার সামনে নিতান্ত তুচ্ছ। লোকটার কথায় কথক যেন সমুদ্রের প্রতি এক অভাবনীয় একাগ্রতা দেখতে পায়। কথকের মতে :

> কাছের সমুদ্র আর দূরের সমুদ্রের রহস্য ব্যাখ্যা করতে যার জুড়ি নেই, যার কথা শুনে সমুদ্রকে আরও নিবিড় করে নিতে চলেছি, ভালবাসতে আরম্ভ করেছি, সে মাতাল নেশাখোর জানতে পেরে আমি এতটুকু বিচলিত হইনি। বরং চিন্তা করলাম, মদ বা গাঁজা টেনেও যদি সে নেশা করে, মাতলামি করে, সেই নেশা তার কতক্ষণের। বরং বলা যায়, যে নেশার টানে আজ কুড়ি বছর মানুষটা সব ছেড়ে এখানে পড়ে আছে সেটাই তার আসল নেশা। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সমুদ্র', ২০১৫খ : ৫০)

লোকটার প্রতি কথকের শ্রদ্ধা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করে। অন্যদিকে প্রকৃতির উন্মুক্ত বিশালতার সামনে নিজের স্ত্রীকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে হয়, অপাঙ্‌ক্তেয় লাগতে থাকে তার; পরিবারের বন্ধন শক্ত শেকলের কোলাহল হয়ে কানে বাজে। সে এই ভেবে কষ্ট পায় যে, প্রাত্যহিকতার বর্ম খুলে তার স্ত্রী হেনার শহুরে শরীরে সমুদ্র-অবগাহন এখনো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বরং কৃপণের মতো ঝিনুক, শামুক, শাঁখের আদলে টাকায় কিনতে চাইছে সে সমুদ্রকে। বিস্ফারিত জলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শব্দের ঘায়ে স্ত্রীকে আঘাত করে কথক সেই ক্ষুদ্রতার প্রতিশোধ নিতে চায়; দুটো কটু কথা শুনিয়ে দিয়ে আরাম পায়। পরবর্তী সময়ে যখন সমুদ্রের ফেনা থেকে পা বাঁচানোর জন্য অহেতুক ছুটোছুটি করতে থাকা তার স্ত্রীকে দেখে বাজে লোকটা 'ফুলের গায়ে মাছি' বলে ভেংচি কাটে, লোকটার সেই উপমা অনুমোদন করতে বাধ্য হয় কথক। কেননা ইতোমধ্যেই সে স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছে যে, সমগ্র সৈকতে একমাত্র এই লোকটাই সমুদ্রের প্রকৃত প্রেমিক। এমনকি লোকটা যখন তার ভাগ্নে হোটেল-মালিক বীরেন সম্পর্কে জানায় যে, বীরেনের সন্দেহ তার দামি অ্যালসেশিয়ান কুকুরকে সমুদ্রের ঢেউয়ের নিচে ছুড়ে দিয়েছে এই মামাই, তখনও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে না পড়ে লোকটার বিরল ব্যক্তিত্বের কাছে আর একটু নতজানু হয়ে পড়ে কথক।

লোকটার প্রভাবে কি না বোঝা যায় না, তবে আগ্রাসী নিসর্গের পূর্ণ সমর্থনে স্ত্রীর প্রতি আগের প্রেম ধুয়ে গিয়ে বরং অদ্ভুত অনুকম্পা তৈরি হয় কথকের মনে। মুহূর্তের উদ্বেলতায় শোঁ শোঁ করে ছুটে আসতে থাকা ঢেউয়ের কাছে স্ত্রীকে সঁপে দিতে উদ্যত হয় সে। প্রায় শেষ মুহূর্তে স্ত্রীর বাধার মুখে সে নিজেকে কোনোমতে সামলে নেয়। স্ত্রীর অবিশ্বাসী আতঙ্কিত চোখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে পেছনে ফিরে দেখে রুগ্‌ণ অপরিচ্ছন্ন চেহারার সেই বাজে মানুষটা, বীরেনবাবুর মামা – তাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

ফিরে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে না জানালে কথক হয়তো জানতে পারত না যে, আজ থেকে বিশ বছর আগে ঠিক এভাবেই বীরেনবাবুর মামা তার নিজের স্ত্রীকে ঠেলে দিয়েছিল সমুদ্রে। বিশ বছর পর ঠিক একই কাজ সেও করতে যাচ্ছিল লোকটার পরোক্ষ প্ররোচনায়। সমুদ্রের যে সম্মোহনে বিশ বছর

আগে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছিল বীরেনবাবুর মামা, সেই একই সম্মোহনের জালে কথকও প্রায় বাঁধা পড়তে যাচ্ছিল সেদিন। প্রকৃতির এই আশ্চর্য আকর্ষণকে সে তার বাস্তব বুদ্ধি দিয়ে হটিয়ে দিতে পারলেও বীরেনবাবুর মামা পারেনি। কথক নিজের স্ত্রীকে নিয়ে ঝামাপুকুরের দোতলা ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেও প্রেমিকটিকে মুক্তি দেয়নি প্রকৃতি। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের পর্যবেক্ষণ :

> প্রকৃতি ও মনস্তত্ত্বের এক অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে আলোচ্য গল্পে। একদিকে প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবনের ব্যাপ্তি অনুভব, অন্যদিকে সুস্থ, স্বাভাবিক অনুভূতির মৃত্যু ঘটিয়ে মনোবিকলনের শিকারে পরিণত হওয়া। আদতে এ-গল্পের নায়ক নিঃসন্দেহে সমুদ্র। প্রকৃতি এখানে নিজেই একটি চরিত্র। এই সমুদ্র কেবল চেতনার বিস্তার ঘটায় না, চেতনাকে গ্রাসও করে। (রঞ্জনা দত্ত ২০০২ : ৪২)

প্রকৃতির প্রতি উন্মত্ত মোহগ্রস্ততা সবার না থাকলেও কেউ কেউ নিসর্গের প্রেমে আমৃত্যু বাঁধা পড়ে থাকে। বীরেনের মামা লোকটা সেই শ্রেণিরই একজন প্রতিনিধি; সমুদ্রের সম্মোহনে আটকা পড়ে যিনি নিয়মিত স্বাভাবিক জীবনকে অস্বীকার করে নিঃস্ব ভিক্ষুকসদৃশ জীবনযাপন করেন, ধ্বংসপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বস্তুগত পৃথিবীতে প্রকৃতির বিশালতা পরিমাপ করার মতো এমন ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য; তাদের আত্মবিধ্বংসী প্রবণতার মধ্য দিয়েই তারা নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে। প্রয়োজনের পৃথিবীতে এরা অপ্রয়োজনীয়, উন্মাদ; প্রকৃত পৃথিবীতে এরা প্রকৃতির যথার্থ প্রেমিক। গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেও কিছুটা এমন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক ঘরোয়া সাক্ষাৎকারে তিনি নিজের সমুদ্র-দর্শন সম্পর্কে তাই বলেন :

> একবার পুরী যাই। প্রথমদিন পুরী গিয়ে রাত্রে একা একা হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ি। সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসলুম। হঠাৎ কী বলব, বুঝলে, ইলেকট্রিকের শক খাওয়ার মতো সারা শরীরে স্পার্ক খেলে গেল। শরীরটা শিউরে উঠল। আমার মনে হল আমার সামনে এক অসীম শূন্যতা ধু ধু করছে। এর যে শেষ কোথায়, বুঝে উঠতে পারি নি। তারপর যে কদিন পুরীতে ছিলাম প্রায় ছটফট করে কাটিয়েছি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪২৩ ব. : ২৭)

প্রকৃতির বিশালতা ক্ষুদ্র মানুষের কাছে কতখানি বিপুল বিস্ময় নিয়ে হাজির হয় লেখকের এই বক্তব্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। নিজে অভিভূত না হলে নিসর্গনির্ভর এমন অসামান্য অন্তর্ভেদী গল্প রচনা মোটামুটি অসম্ভব।

নিসর্গকে উপজীব্য করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গল্প, যেখানে নিসর্গই প্রধান চরিত্র এবং একে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে ঘটনাপ্রবাহ। তেমনই আরেকটি

অনন্যসাধারণ গল্প ‘গিরগিটি’ (প্রথম প্রকাশ : *দেশ* শারদীয়া ১৯৫৬, *প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭)। প্রকৃতি আর মানুষের মন পরস্পরের সঙ্গে কতটা অবিচ্ছেদ্য, তারই পরিচয় বহন করে এই গল্প। গল্পটি মায়া নামের বাইশ বছরের একটি তন্বী তরুণী আর ভুবন সরকার নামে ডুমুরের মরা ডাল সদৃশ জরাগ্রস্ত এক বুড়োর মনোদৈহিক সম্পর্কের এক চমকপ্রদ আখ্যান।

প্রায় নির্জন এক জঙ্গল ঘেরা পরিবেশে সস্তা টিনের ভাড়া বাড়িতে থাকে মায়া। আর একঘর মাত্র প্রতিবেশী। এক বুড়ো – তাও পেঁপে আর ডুমুরের ঘন জঙ্গলের আড়ালে নিচু একচালার খুপরিতে সে থাকে। ওর থাকা না-থাকা সমান কথা। প্রাণের কোনো নিশ্চিত চিহ্ন মায়া দেখতে পায় না বৃদ্ধের শরীরে। তার চাইতে বরং পাকা নিমফলের লোভে আসা বুলবুলি, আগুনরঙা ফড়িং, খুদে কি ঢাউস প্রজাপতি, নির্লিপ্তপ্রায় গিরগিটি, অথবা আরো যারা প্রতিদিন তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে স্নানের সময়ে, তার রূপ দেখে, অর্ধনগ্ন শরীরের ত্রিভঙ্গ ভাঁজ দেখে, তারা অনেক বেশি সজীব, প্রাণবন্ত। এমনকি মখমলের মতো পুরু নরম সবুজ শ্যাওলা, চিকরি-কাটা ঝাঁকড়া পাতার নিমগাছটা, পেঁপে, ডালিম, পেয়ারা গাছগুলো পর্যন্ত মায়ার চোখে অনেক বেশি জীবন্ত। এরা তার নিটোল মসৃণ জোড়া ফুলের স্বপ্ন হয়ে অসীমের দিকে তাকিয়ে থাকা বুকদুটোর সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয়, উচ্ছল হয়ে ওঠে; কিচিরমিচির কণ্ঠে, পাতার ঝিরঝির শব্দে তারা নিজেদের মুগ্ধতা প্রকাশ করে, মায়ার অর্ধনগ্ন শরীরের স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে অভিবাদন জানায়।

ওই জীবন্মৃত বুড়োর সঙ্গে অনেকটা করুণাবশেই মায়ার সখ্য গড়ে ওঠে। লোকটা তাকে ডালিম চারার সঙ্গে তুলনা করে। চারা না, নতুন গাছ – যৌবন লেগেছে যার গায়ে। সে তার সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল দেখিয়ে আবার লুকিয়ে ফেলছে পাতার আড়ালে। মায়া চমকে ওঠে। যাকে সে মরা গাছের ডাল ভেবেছিল তার মধ্যে লুকানো প্রাণের নিবিড় সাড়া পেয়ে, তার মুখ থেকে ফলবতী ডালিম গাছের সঙ্গে নিজের তুলনা শুনে মায়া আলোড়িত হয়, আন্দোলিত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন :

> প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নর বা নারীর রূপ বর্ণনা করতে পারেন না। তাঁর শিল্পচেতনায় নারীর শরীর ভোগের উপাদান নয়, তা সৌন্দর্যের আধার ও চেতনা। . . . ‘গিরগিটি’ গল্পে বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌটির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। কুয়োর ঠান্ডা জলে নিরাবরণ হয়ে যুবতী বৌটি স্নান করছে। বুড়োর দৃষ্টিতে সমগ্র ব্যাপারটা একটা পরিপূর্ণ প্রকৃতিসংলগ্ন ছবি – নিরাবরণ যুবতীর একাকিত্ব ও তার রূপ, নির্জন কুয়োতলায় পরিপূর্ণতা পেয়েছে। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ২০০৪ : ৩৯৪)

গল্পের ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধটির চোখের নিভে যাওয়া দ্যুতি ধীরে ধীরে রূপতৃষ্ণায় পুনর্বার প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এও প্রকৃতির আরেক বিস্ময়কর রসায়ন। প্রকৃতি তার অপার লীলায় মৃতজনেও প্রাণ ফিরিয়ে দিতে পারে। এখানে ভুবন সরকার মূলত প্রকৃতির একটা নিস্পন্দ অংশ, একটা মৃত অনুষঙ্গ হয়ে এসেছিল মায়ার কাছে। তাই মায়া সহজে যেন তাকে একাত্ম করে নিতে পেরেছিল নিজের সঙ্গে। তাকে প্রকৃতিরই অংশ ভেবে অনাড়ষ্টভাবে নিজের সৌন্দর্যকে তার সামনে মেলে ধরতে পেরেছিল। তাই মায়া নয়, ভুবন সরকার নয়, প্রকৃতিই এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, যে তার জাদুর কাঠি বুলিয়ে দুটো হারিয়ে যাওয়া, ফুরিয়ে যাওয়া জীবন্মৃত প্রাণকে জাগিয়ে তুলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গিয়ে উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন :

> প্রকৃতি মানুষের মতোই দ্রষ্টা, ভোক্তা এবং সাধারণভাবে সংবেদনশীল। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যেমন নিজেকে উন্মুক্ত করে, প্রকৃতিও তেমনি মানুষকে দেখে – তার উন্মোচন দেখে – মুগ্ধ হয়, বিস্মিত হয়, বিমর্ষ বা দুঃখিত হয়। . . . কিন্তু সে প্রকৃতির বেশির ভাগটাই মানুষের দিক থেকে দেখা . . . মানুষ ও প্রকৃতি এক হয়ে উভয়েই উভয়ের কাছে আস্বাদ্য হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে। (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ২০০৫ : ৮৪)

পৃথিবীর সকল প্রাণ প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতি রূপ পাল্টালে পৃথিবীর প্রাণে তার ঢেউ লাগে, গোচরে বা অগোচরে প্রাণের ভেতর ভিন্ন স্পন্দন বেজে ওঠে। বিজ্ঞানকে করায়ত্ত করে মানুষ আজ তাকে অবহেলা করছে, শাসন করতে চাইছে বটে, তবু তাকে অস্বীকার করতে পারছে কই! জ্যোতিরিন্দ্রের 'সমুদ্র' গল্পে প্রকৃতির রুদ্র রূপের কাছে এসে স্বাভাবিক জীবন ভুলে কথক যেমন অশান্ত হয়ে ওঠে, আবার 'বৃষ্টির পরে' গল্পে প্রশান্ত প্রকৃতিতে আশ্রয় নিয়ে গল্পের চরিত্ররা নিজেদের ভঙ্গুর অসহিষ্ণুতাকে জোড়া দিতে চায়, প্রশমিত করতে চায় অন্তর্দহনকে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে 'বৃষ্টির পরে' যেন 'সমুদ্র' গল্পেরই এক বিপরীত রূপ, মুদ্রার অপর পিঠ।

'বৃষ্টির পরে' (*পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা* ১৯৬১) গল্পে জীবনের পড়ন্ত বেলায় দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ হয় বহু বছর পর। এই সাক্ষাৎ সৌজন্য বা সৌহার্দ্যের টানে নয়, উগ্র ক্ষোভ উগরে দেওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু বন্ধুর নিবিড় নিসর্গবেষ্টিত বাড়ির পরিবেশে এসে যেন অপর বন্ধুর রাগ তুঙ্গস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে না। নিসর্গের নিমগ্নতায় তাঁর তীব্র দহন নিভু নিভু হয়ে আসে বারবার। তাই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে চান, অসহায় হয়ে পড়েন।

তিনি এসেছেন বন্ধুর বিচার করতে, বন্ধুর কাছে বিচার চাইতে। তাঁর ছেলে, যাকে তিনি যত্ন-আদরে একটু একটু করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, সেই ছেলেটি বন্ধুর মেয়ের হাত ধরে উধাও হয়ে গেছে। বন্ধুর বাড়ির এই প্রকৃতিঘেরা পরিবেশেই দুটি পূর্ণ প্রাণের মধ্যে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তারা উদ্ভাসিত হয়েছিল, দুজন একত্রে মিলিত হয়ে সন্তানের জন্মও দিয়েছিল সবার অজান্তে। সেই গর্ভজাত সন্তান নষ্ট করে উভয়ে অজানা স্থানে আশ্রয় নিয়েছে। বন্ধুর প্রতি তাই তাঁর তীব্র ক্ষোভ – কেন কড়া শাসনে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখেনি বন্ধুটি, কেন এক হতে দিয়েছে দুজনকে। সর্বোপরি কেন নিজের বাড়িটিকে প্রকৃতির অপূর্ব শোভায় সাজিয়েছে তাঁর বন্ধু! দুটি প্রাণে প্রেম জেগে ওঠার জন্য যেন এই নিসর্গই দায়ী, যেন প্রকৃতিই প্ররোচিত করেছে তাদের। কিন্তু বন্ধুটি কী করবে! মানুষ নিজেই তো প্রকৃতির অংশ, প্রকৃতিই তার প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অধ্যাপক বন্ধুটি তাই বলেন :

> যখন টের পেলাম তখন আর বলার সময় ছিল না। শীত শেষ হয়ে বসন্ত এসে গেছে। তখন কৃষ্ণচূড়ার উদ্যত আভায় আকাশ লাল হয়ে গেছে, মধুলোভী ভোমরাদের আনাগোনায় বিরাম ছিল না; ওদিকে আম জাম কাঁঠাল জামরুলের গুটি দেখা দিয়েছে গাছে গাছে। ফলের সম্ভাবনায় ডাল পাতাগুলো কাঁপছিল। সেই উৎসবের দিনে ওদের দুজনকে কিছু বলতে আমি সাহস পাই নি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বৃষ্টির পরে', ২০১৫খ: ৬৭)

বন্ধুর অক্ষমতা অপর বন্ধুটি অনুধাবন করতে পারেন। 'ফুল ফোটার ব্যাপারে মানুষের হাত নেই' – এ কথা জানেন বলেই তাঁর এই অসহায় আক্রোশ। এমনকি এখানে এসে তাঁর রাগ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা সব মিশে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, উবে যাচ্ছে, তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে; এ সবই ঘটছে প্রকৃতিরই সাহচর্যে। কেন বন্ধুটি নিসর্গের স্বর্গ গড়ে তুলেছে নিজের বাড়ির চারদিকে; কেন বাতাস, বৃষ্টি, ঘ্রাণের এমন উতলা প্রকাশ বাড়িটিকে ঘিরে! বন্ধু প্রভাতের দৃষ্টির অর্থ পড়তে পেরে কথক বন্ধুটি যেন সচকিত হয়ে ওঠেন – 'বাড়ির সামনে সবুজ ঘাসে মোড়া এমন সুন্দর মাঠ, ফুলের বাগান রাখা আমার অপরাধ হয়েছে। আদালতে তাই প্রমাণ করবে প্রভাত' ('বৃষ্টির পরে', ২০১৫খ : ৬৪)। যে প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রভাতের এত অভিযোগ সেই প্রকৃতির আলিঙ্গনেই প্রভাত শান্ত হন একসময়, তাঁর সংবিৎ ফিরে আসে। তিনি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন যে, সত্যিই তাদের দুজনের কিছুই করার ছিল না প্রকৃতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র-গবেষক দেবশ্রী মণ্ডলের মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

> বৃষ্টি যেরূপ সমস্ত কলুষতা ধুয়ে মুছে শুভ দিনের সূচনা করে, আবার সে মানুষের দেহের ও মনের জ্বালাও মেটায়। বসন্ত জ্বালায়, গ্রীষ্ম জ্বালায়, বর্ষার কাজ নেভানো। এই গল্পে ব্যারিস্টার ও অধ্যাপকের সমস্ত আশা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে

> পালিয়ে গেছে তাদের ছেলে মেয়ে দুটিতে। ব্যারিস্টার তার বুকে যে জ্বালা নিয়ে এসেছিল তার অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে, সেই জ্বালা নিভে গেছে। সে বৃষ্টির জলে স্নান করে করে গাছের রঙ ফেরা দেখছে, উল্লাস দেখছে। সমস্ত উত্তেজনার অবসান ঘটেছে বৃষ্টির স্পর্শে। (দেবশ্রী মণ্ডল ২০১৭ : ১৬৭)

ঘটনাবিন্যাসে পরস্পরের বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও 'বৃষ্টির পরে' গল্পটি 'সমুদ্র'-এর অমীমাংসিত রহস্যের সমাধান যেন। 'সমুদ্র' গল্পে প্রকৃতির রুদ্র রূপ গল্পের চরিত্রকে সম্মোহিত করে ধ্বংসের খেলায় নামতে প্ররোচিত করে; 'বৃষ্টির পরে' গল্পে নিসর্গের নিবিড় স্পর্শ উন্মত্ত ধ্বংসোম্মুখ চরিত্রকে প্রশান্ত করে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতিমনস্ক সাহিত্য রচনা বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে নিতাই বসু বলেছেন – 'তাঁর সাহিত্যের অবয়বে আদ্যন্ত জড়ানো রয়েছে প্রকৃতির আবরণ আর সেই প্রকৃতিকে পটভূমিতে রেখে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন তিনি বারবার' (নিতাই বসু ১৪১৬ ব. : ৩২২)। সমালোচকের এই উক্তির সূত্র ধরে বলা যায়, লেখকের 'শ্বাপদ' (*শ্বাপদ, শয়তান ও রূপালী মাছেরা* ১৩৭০ ব.) গল্পেও প্রকৃতির পটভূমিতেই বিকশিত হয়েছে নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্ক। গল্পটিতে ভিন্ন এক আদিম প্রকৃতির সন্ধান পাওয়া যায় যা নরনারীর মধ্যে এক অতল অমীমাংসিত রহস্যের সূত্রপাত ঘটায়। এখানে প্রকৃতি চরিত্রের রূপকে উপস্থিত হয়ে নিঃশব্দে গ্রাস করে প্রতিপক্ষকে, শিকারিকে শিকারে পরিণত করে। এ কোনো ইচ্ছাকৃত প্রতিশোধ নয়, হরণের আকাঙ্ক্ষা নয় – কেবল নিসর্গের নিজস্ব নিয়মের অনুসরণ। প্রকৃতিতে যুক্তি খাটে না, তাকে হুকুমের শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না; বাঁধতে গেলে হিতে বিপরীত হয়। 'শ্বাপদ' গল্পটি যেন তারই প্রতিফলন।

গ্রাম থেকে গেঁয়ো ভাই নিরুপায় হয়ে শহরে মাসির বাসায় আশ্রয় নিতে এলে গায়ে সুগন্ধি-মাখা নাগরিক ভাইটি তাকে নিয়ে অদ্ভুত খেলায় মেতে ওঠে; জানোয়ার বানিয়ে তাকে দেখিয়ে আনতে যায় প্রেমিকাকে। উন্মুক্ত প্রকৃতির অবারিত পরিবেশে এসে দরদালানের গর্ভে বনসাইয়ের মতো বড় হওয়া হামবড়া ভাইটির এই নিষ্ঠুর খেলা একসময় নিদারুণভাবে পণ্ড হয়। গেঁয়ো ভাইটিকে দিয়ে প্রেমিকার জন্য দিঘি থেকে ফুল তোলা, গাছ থেকে পেয়ারা, কামরাঙা পাড়িয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে বান্ধবীর সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে সিগারেট ফোঁকার সময় ভাইটির খেয়াল থাকে না যে, এ তার ক্লাবের টুকরো মাঠ নয়, দেয়াল ঘেরা স্কুলের কম্পাউন্ড নয়, এটা সোঁদা ঘ্রাণে মাতাল-করা নিসর্গের নিজস্ব উদ্যান। ছায়া মাখা জংলা জঙ্গলে গেঁয়ো ভাইটি যেন তার সেই পুরোনো সৌষ্ঠব, হারানো ক্ষিপ্রতা ফিরে পায়। আর তেজই যার প্রধান সৌন্দর্য জঙ্গলে তার রূপই প্রখর হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। সেই রূপের গভীরে নিজেকে হারাতে বান্ধবীটি এতটুকু কালক্ষেপণ করে না। গল্পের শেষটুকু কথকের বয়ানে :

> কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম, গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শ্বাপদ', ২০১৫খ : ১৬০)

গল্পটি মূলত প্রকৃতি-পুত্রের বৃক্ষ হয়ে ওঠার কাহিনি, একাই সমগ্র অরণ্য হয়ে ওঠার রূপকথা। সেই অরণ্য সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিয়েছিল শহরের ঝকমকে কিশোরীকে। এই সম্মোহন উপেক্ষা করার সাধ্য তার ছিল না।

নিসর্গ শুধুমাত্র মানুষের দেহকাঠামোর বাইরের একটি দৃশ্যগত বিষয় নয়, মানুষের অন্তরাত্মার সঙ্গে, সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এর প্রত্যক্ষ সংযোগ। মানুষের মানস-গঠনকে সে তার ছাঁচে ফেলে প্রতিনিয়ত মন্থন করে, নিয়ন্ত্রণ করে; যার যার গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী গরল থেকে অমৃত বানায়, অমৃত থেকে গরল উৎপন্ন করে। ব্যক্তির রূপান্তর ঘটায় নিসর্গ, একের ভেতর বহু মানুষ তৈরি করে। আবার মানুষের বহুধাবিভক্ত সত্তাকে এক অখণ্ড সত্তায় পরিণত করে। জ্যোতিরিন্দ্রের 'নৈশ ভ্রমণ' (*পতঙ্গ* ১৯৬১) গল্পটিতে তারই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'নৈশ ভ্রমণ' গল্পের ভূদেববাবু একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ। বাড়বাড়ন্ত পরিবার ফেলে তিনি প্রতি সন্ধ্যায় শান্তির খোঁজে নীরব নির্জন গাছতলায় ছুটে যান। শহরের শেষ প্রান্তে ঠান্ডা পাথরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে রেললাইনের উঁচু পাড় দেখেন; ডিস্ট্যান্ট সিগনালের নীল আলোর হলদে হওয়া এবং হলুদ আলোর রক্তবর্ণ হওয়া দেখেন। সেখানে গিয়ে পরিবার আর সমাজের মান্যতার তকমা আড়াল করে নিসর্গের নির্জনতায় নিজেকে সঁপে দিয়ে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করেন তিনি। বহু বছর আগের এক মুহূর্তের একটি ত্রুটি মনের গভীরে যে শূন্যতা তৈরি করেছে নিসর্গের সান্নিধ্যে তা তিনি ভরাট করে নিতে চান। বিচ্ছিন্ন নির্জন নিসর্গের মধ্যেই সেই জগতের দরজা খুলে রাখা আছে, নির্বাণের গায়ত্রী মন্ত্রটি আছে। এ গল্পের সৃষ্টিমুহূর্ত প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন :

> সেই রেললাইনের পাশে একটা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল ছিল। আমি রোজই চেয়ে দেখতাম যে নীল সবুজ লাল এইসব আলোগুলো জ্বলত নিভত। আমার হঠাৎ মনে হল যেন একটা লোক বসে বসে এইসব জিনিস দেখছে, এবং দেখে সে এই সংসারের অন্য সব পরিবেশ থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ঐ আলোটাই ঐ সিগন্যালটাই যেন ওকে এমন একটা ইঙ্গিত দিয়েছে যার ফলে অন্য এক জগতে প্রবেশ করার তার ইচ্ছা জেগেছে এবং তখনই 'নৈশ ভ্রমণ' গল্পটা আমার মাথায় আসে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ২০০৪ : ৩০)

নিসর্গে নিমজ্জনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চমৎকার উদাহরণ ‘নৈশ ভ্রমণ’ গল্পটি। পার্থিব সকল মনোযন্ত্রণার উপশমে প্রকৃতির সান্নিধ্য মানুষকে শুদ্ধ ও শুভ্র করে তুলে কীভাবে ভিন্ন মানুষে পরিণত করে তা-ই গল্পটির অন্যতম উপজীব্য।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি অসাধারণ ব্যঞ্জনাময় গল্প ‘সামনে চামেলি’-তে (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প* ১৯৮৯) প্রাণশক্তি জাগানিয়া নিসর্গের সংস্পর্শে এসে গল্পের চরিত্রের মধ্যে যে সূক্ষ্ম উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় ও হৃত আত্মবিশ্বাসের পুনরুদ্ধার ঘটে, তার চিত্রকল্পময় প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। গল্পের পরতে পরতে কথকের সঙ্গে সেই রাস্তা ধরে ভ্রমণ করতে গিয়ে পাঠক বুঝতে পারে কীভাবে একটি দৃশ্য অন্য দৃশ্যকে ভেঙে নতুন দৃশ্যের জন্ম দেয়, একটি ঘ্রাণ অন্য গন্ধের সঙ্গে একাকার হয়ে গন্ধের এক রূপকল্পময় জগৎ নির্মাণ করে। একইসঙ্গে পাঠক এও অনুভব করতে পারে, পা হারিয়ে পাওয়া বঞ্চনার দুর্বহ ভার কাঁধে নিয়ে জীবনযুদ্ধে প্রায়-পরাজিত একজন মানুষ বিশুদ্ধ নিসর্গের সংস্পর্শে এসে কীভাবে ফের যুদ্ধজয়ের প্রেরণা নেয়।

প্রকৃতি সকলের জন্যই অবারিত, তার কোলে সবাই আশ্রয় নিতে পারে। সমাজের তলানিতে অবস্থানকারীকেও নিসর্গের স্নেহাশিস থেকে বঞ্চিত করার ক্ষমতা কারো নেই। এই বিশ্বাসটুকু এখনো অটুট আছে বলেই হয়তো নিসর্গের কাছে এসে গল্পের কথক আশ্রয় নিতে চায়, অন্যদের মতো নিজেও অনুপ্রাণিত হতে চায়। নিসর্গকে দেখার, উপভোগ করার আলাদা দৃষ্টি, আলাদা মানসিকতা থাকায় অন্য অনেকের চাইতে হয়তো একটু বেশিই আশীর্বাদপুষ্ট হয় সে প্রকৃতির।

তবে গল্পের পরিসমাপ্তি শেষ পর্যন্ত কথকের শান্ত হৃদয়ের প্রেমময়তার পক্ষে যায়নি। বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে লেখক কথকের স্নিগ্ধ চেতনার আয়নাটিকে আচমকা ভেঙে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছেন। কথকের নিসর্গ-নিমজ্জিত শুদ্ধ আত্মা পরিস্থিতির দমকে কিঞ্চিৎ চমকে উঠলেও শেষমেশ সামলে নিয়েছে নিজেকে, লেখকের প্রহসনে পা দেয়নি। দোতলা থেকে ছুড়ে দেওয়া দিদিমণির পয়সা তাকে প্রকৃতির আশ্রয় থেকে বস্তুজগতে নামিয়ে আনতে পারেনি। ক্রাচে ভর দেওয়া মানুষটা পরাজয় স্বীকার করতে না চাইলে পরিবেশ, পরিস্থিতির আক্রোশ যেন আরও বেড়ে যায় তার প্রতি। দারোয়ান এসে জানায়, পয়সা না নিলে পুরোনো কাপড় আছে, তা-ই নিতে পারে সে। না, তারপরও তাকে হারানো যায় না। প্রকৃতির ঐশ্বর্যে যে ধনবান তাকে জাগতিকতার তুচ্ছ আড়ম্বরে বশীভূত করার সাধ্য নেই কারো। শরীরটা ঘুরিয়ে নিয়ে যেন সামনে কোথাও চামেলি ফুটেছে, গন্ধ পাচ্ছে, ঠুকঠুক করে সেদিকে এগিয়ে যায় গল্পের কথক। পাঠক বুঝতে পারে, আচমকা আক্রমণে পরাস্ত করার জন্য লেখক তার গায়ে কাদা ছিটাতে চাননি, বরং এই গল্পে নিসর্গের উপহারপুষ্ট আত্মার নিষ্কলুষতাকে ফের প্রমাণ করাই লেখকের অভীষ্ট ছিল।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি নিসর্গ-প্রধান গল্প 'বনের রাজা' (প্রথম প্রকাশ : *দেশ* শারদীয়া ১৯৫৯, *মহীয়সী* ১৯৬১)। গ্রামে বেড়াতে আসা এক কিশোরের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়-পর্ব এই গল্পের উপজীব্য।

'সহজ মানুষ ভজে দেখ না রে মন দিব্যজ্ঞানে।/ পাবি রে অমূল্যনিধি বর্তমানে' (লালন সাঁই ২০০৮ : ৬৬৬) – ইট-পাথরের জঞ্জালের মধ্যে লালন সাঁইয়ের এই সহজিয়া দর্শন ধারণ করার সামর্থ্য খুব কম মানুষেরই আছে। হৃদয় সবুজ থাকতে সহজ প্রকৃতির মধ্যে এই চেতনা অন্তরে গেঁথে নিতে হয়; 'বনের রাজা' গল্পে লেখক তা-ই যেন স্মরণ করিয়ে দেন পাঠককে। শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে আসা কিশোরটি দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়ে দাদুর আচরণে প্রথমে অবাক হলেও ধীরে ধীরে তার কাঁচা মনে এর প্রভাব পড়তে থাকে। লেখকের ভাষায় :

> 'পায়ে যদি ধুলো না লাগল, নরম ঘাস না মাড়ালাম তো বেঁচে আছি বলে মনে হয় না।' কথা শেষ করে সারদা গোড়ালি দুটো জোরে জোরে ঘাসের উপর ঘষেন। তাই, মতি চিন্তা করল, দাদু সারাদিন খালি পায়ে থাকে, গাছের রাজা জুতো পরে না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বনের রাজা', ২০১৫ক : ৬৪৪)

নিসর্গের কোমল স্পর্শে মতির মন ধীরে ধীরে আর্দ্র হয়ে উঠতে শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় দাদুর প্ররোচনায় এক পর্যায়ে সে পরনের প্যান্ট খুলে মাথায় জড়িয়ে নেয়। প্রকৃতির ইন্দ্রজালের অন্ধিসন্ধি না জানলেও শহুরে মতি এটুকু বুঝতে পারে যে, দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য নিসর্গের সহজতার মধ্যে ডুব দিতে হয়, আর সংস্কার দিয়ে প্রকৃতিকে কাবু করতে চাওয়া একটা শহুরে বিভ্রান্তি মাত্র। মতি গন্ধের ভেতর গন্ধ খুঁজে পেতে শিখে ফেলে দ্রুত। আবার 'তাকে নিয়ে গল্প'-তে (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১) রয়েছে বৃষ্টির স্বাদ বা বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দের প্রসঙ্গ :

> কতক্ষণ মাঠে দাঁড়িয়ে ছিপছিপ বৃষ্টিতে ভিজলেন। তারপর গাছের কাছে ছুটলেন। গাছতলায় ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টির অন্য স্বাদ। তা-ও কি – কৃষ্ণচূড়ার নিচে দাঁড়িয়ে ভেজার এক স্বাদ, দেবদারু গাছের নিচে বৃষ্টির অন্য আস্বাদ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'তাকে নিয়ে গল্প', ১৯৮১ : ২৫)

বৃষ্টিরও স্বাদ আছে, সেই স্বাদের আবার তারতম্যও আছে – এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভবের বয়ান পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'তাকে নিয়ে গল্প' শীর্ষক গল্পটিতে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন মধ্যবয়স্ক লোক, সাধারণ হয়েও লোকটা কেমন যেন, ঠিক সাধারণ নন। নিসর্গমনস্কতা তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। নিসর্গই তাকে শিখিয়েছে, বৃষ্টির মতন বৃষ্টি দেখতে হলে, প্রাণ ভরে বৃষ্টিতে

ভিজতে হলে অবারিত সবুজ মাঠে ছুটে যেতে হবে। হয়তো তা তাঁর গন্তব্যের সম্পূর্ণ উল্টোদিকে, হয়তো ফেরার সময়ে বেশ ঝক্কি পোহাতে হবে; তবু এই দুর্লভ দৃশ্যটির আকর্ষণে সবুজ মাঠের উপরে আকাশে কালো গর্জনও তাঁকে প্রতিহত করতে পারে না। তিনি গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারেন প্রেমিকের উদ্দেশ্যে ডাকবাক্সে ফেলতে যাওয়া খামের ভিতর চিঠির ভাঁজে গোলাপ নয়তো গন্ধরাজ রেখে দিয়েছে মেয়েটি। এই আপাত-খাপছাড়া লোকটা আদতে হয়তো অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি প্রকৃতিস্থ। প্রকৃতিই তাঁকে এমন হয়ে ওঠার অধিকার দিয়েছে; সেই অধিকার সবাই পায় না। তাঁকে কটাক্ষ করার, এমনকি বিরক্ত করার এক্তিয়ারও যেন অন্যদের নেই। গল্পের শেষে কথক এই লোকটার পক্ষ নিয়ে বলে :

> ময়দানের কাছে বর্ষার গাছতলার এমন সুন্দর একটা বিকেল, বিশেষ করে তাঁর ছুটির দিন, মানুষটাকে চুপি চুপি উপভোগ করতে দিতে ক্ষতি কি! মনে মনে আমরাও কি এক বিকেলে এমন চমৎকার কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অফুরন্ত ভিজতে চাই না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'তাকে নিয়ে গল্প', ১৯৮১ : ২৭)

লোকটার সঙ্গে কথকের এই সংহতি পাঠককে জানিয়ে দেয়, এমন নিসর্গ-নিমগ্ন মানুষ সমাজে আদতে বিরল নয়, তারা অপ্রকৃতিস্থও নয়।

এমন নয় যে সংসারজীবনে সফল বলেই ডাকবিভাগের কর্মকর্তাটির নিসর্গ প্রেমের অবসর আছে; ব্যর্থ হলে তিনি এতটা নিশ্চিন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক হতে পারতেন না। পাঠকের মনে এই চিন্তার উদ্রেক হতে পারে ভেবেই হয়তো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরবর্তী সময়ে 'সুখী মানুষ' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ* **১ম খণ্ড ১৯৮১**) গল্পটি লিখেছেন। সেখানেও ডাকবিভাগের কর্মকর্তার মতো এক মধ্যবয়স্ক মানুষ ঝাউগাছের নিচে দাঁড়িয়ে আকাশ অন্ধকার করে নামা বৃষ্টিতে ভিজেছিলেন। মুরারী নামের এই মানুষটি ব্যক্তিজীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বড় ছেলে কুসঙ্গে পড়ে বিপথগামী হয়েছে আগেই, ছোট ছেলে বিকলাঙ্গ, মেয়েটি বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফেরত এসেছে, আর সেদিন সকালেই স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন তিনি। তারপরও ভদ্রলোক দুপুরের বৃষ্টিতে ভিজতে পারেন, বিকালের অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা উপভোগ করতে পারেন, হো হো করে হাসতে পারেন যখন তখন। প্রতিবেশী পরিচিতরা অবশ্য এই হাসির পেছনে নোংরা কারণ খুঁজে বের করেছে; সেই কারণটিকে 'কালো মাছি'র মতো মুরারীর সুখী চেহারায় আঠা দিয়ে তারা সেঁটে দিতে চেয়েছে। কিন্তু এতে করেও তাঁর নিসর্গনিমগ্নতায় এতটুকু ব্যাঘাত ঘটেনি; বরং তা আরো গভীর হয়েছে, অবাধ হয়েছে। জাগতিক বিষয়ে ভাবিত নন বলেই বৃষ্টিতে ভেজার সময়ে কুকুর কামড়ালে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েননি, বৃষ্টি উপভোগ করেছেন। তাঁর নিজের বয়ানে :

> না, কুকুরের কামড়ের কথা তখন একটুও ভাবিনি – রক্ত বেরোচ্ছে দাঁত বসিয়ে দিয়ে গেছে – সবই দেখলাম, কিন্তু এতটুকু দুশ্চিন্তা হল না। বরং তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হৃষ্টমনে হাওয়ার শোঁ শোঁ শুনতে লাগলাম, মেঘের ছুটোছুটি দেখলাম আর ভিজতে লাগলাম। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সুখী মানুষ', ১৯৮১ : ১৩৫)

অতিরিক্ত বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কিছু মানুষকে বিবেচনার বাইরে রাখলে অধিকাংশ মানুষই কমবেশি নিসর্গ-সমর্পিত। সুযোগ ও সাধ্য এক করতে পারলে নিসর্গের বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হতে চায় সবাই। তবে কিছু মানুষ আছে যারা প্রকৃতির প্রতি মোহাবিষ্ট ভালোবাসা নিয়েই জন্মায়, বেড়ে ওঠে। পরিবেশ যেমনই হোক না কেন, নিসর্গ তাদের উচাটন করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কোনো কোনো গল্পে নিসর্গের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি না থাকলেও তার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি আঁচ করে নেওয়া যায়। কোথাও কোথাও নিসর্গের সম্মোহন গল্পের চরিত্রকে দিশেহারা করে দিয়ে এমন সব অভাবনীয় কাণ্ড করিয়ে নেয় যা হয়তো প্রকৃতিস্থ হিসেবি মানুষের চিন্তারও বাইরে। প্রকৃতির মন-ভোলানো স্পর্শে চরিত্রগুলো বাস্তবতার নিরেট ভূমি থেকে চেতনার বায়বীয় স্তরে উন্নীত হতে দ্বিধা করে না। এমনকি একটি চড়ুই, একটি শালিকও তাদের দমবন্ধ জগতে মুক্তির দূত হয়ে হাজির হতে পারে। প্রকৃতির অবচেতন আশ্রয়টুকুকে সচেতন মননে ধারণ করতে না পারায় অনিবার্য পতনও ঘটে অনেকের।

লেখকের 'রজনীগন্ধা গানে' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭) গল্পটি অবারিত প্রকৃতির প্রশ্রয়ে তিনজন কিশোরীর উত্থান, পতন ও সর্বোপরি তরুণীতে রূপান্তরের ইতিবৃত্ত। তিন কিশোরীর যৌবনের কুঁড়ি পাপড়ি মেলে দেওয়ার আগেই তাদের অস্থির যৌবনাকাঙ্ক্ষার নিয়ামক এক অর্থে নিসর্গই। মুক্ত প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠা এই তিন কিশোরী পরিণয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় সদ্য বিপত্নীক এক মধ্যবয়স্ক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। লোকটার প্রতি প্রবল আকর্ষণে তারা তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠাকে অস্বীকার করে, অবজ্ঞা করে। লেখক নিসর্গের রূপকে তারই চমৎকার বর্ণনা দেন :

> পায়ের কাছে রাশিরাশি ভুঁইচাঁপা ছিল। সেগুলো দু'পায়ে মাড়িয়ে জানালার নীচের ও তারের বেড়ার গায়ে লতানো ফুলন্ত মাধবী জঙ্গলটাকে জায়গায় জায়গায় চিরে ফেলে আমরা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখতাম। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রজনীগন্ধা গানে', ২০১৫ক : ৩৮৯)

অদম্য কৌতূহল এক পর্যায়ে তাদের চরম বিপর্যস্ত করে দিয়ে যায়। ভদ্রলোকের ভেতর-বাড়িতে উঁকি দিয়ে তারা আশ্চর্য হয়ে উপলব্ধি করে সেখানে রজনীগন্ধার আরাধনা চলছে। প্রয়াত স্ত্রীর জন্মদিন

উপলক্ষ্যে চারপাশে রজনীগন্ধার ঝাড় বিছিয়ে তিনি তাঁকে স্মরণ করছেন ধ্যানস্থ হয়ে। টবে সাজানো রজনীগন্ধার কাছে পায়ে মাড়ানো ভুঁইচাঁপার পরাজয়ের চিত্র এভাবে এঁকে দেন লেখক।

এ যেন প্রকৃতির অন্যরকম প্রতিশোধ। নিসর্গের গর্ভে যারা সাবলীলভাবে বেড়ে উঠছিল, চাকচিক্যের বশে তারা তাদের সহজাত বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে নিজেদের গড়নকে বিকৃত করার খেলায় মেতে উঠেছিল। অনিয়মের পদভারে আছাড় খেয়ে তারা নিয়মের চক্রে ফিরে এসেছে। এই গল্পে নিসর্গ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে না থেকেও চরিত্রদের নিয়ন্ত্রণ করেছে তার স্বাভাবিক ছন্দে। প্রশ্রয় দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, ব্যথা দিয়েছে, উপশম দিয়েছে, সর্বোপরি গল্পের উপসংহারে তাদের প্রতীকী পরাভব সূচিত করেছে।

লেখকের আরেকটি প্রকৃতিপ্রবণ গল্প 'বনানীর প্রেম'। এখানে ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে নিসর্গের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়, কিন্তু চরিত্রগুলোর জীবনযাপন ও মানস গঠনে নিসর্গের প্রভাব সুস্পষ্ট :

> আমাদের একদিকে গঙ্গা, একদিকে আকাশ। আকাশের গায়ে দুটো চটকলের চিমনি। একটা তালগাছ ঘরের সামনে, আর উপর দিয়ে, আমার চালার ঠিক উপর দিয়ে চলে গেছে অনেকগুলো টেলিগ্রাফের তার। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বনানীর প্রেম', ২০১৫ক : ৪৮০)

উপরিউক্ত বর্ণনায় নিসর্গকে নাগরিক অনুষঙ্গ যেভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে, গল্পটির স্তরে স্তরে চরিত্রদের মনোজগৎ ও অন্তর্গত সত্তাকেও চাকচিক্যময় জীবনের অসংযত আগ্রাসন ঠিক একইভাবে গলাধঃকরণ করে নিচ্ছে ধীরে ধীরে। তারই বিষাদগাথা চরিত্রদের ব্যর্থতা ও অসহায়তার মোড়কে মুড়ে লেখক উপহার দিয়েছেন পাঠককে। গ্রাম থেকে শহরের উপান্তে আশ্রয়সন্ধানী পাঁচ নারী শহরের জাঁকজমকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাস করে শহরতলিতে। এখানে প্রকৃতিও তাদের মতো কোণঠাসা, অগোছালো, শ্রীহীন। নিসর্গের সবুজ আভা যেন ম্লান হয়ে গেছে এখানে। এমন সময় শহর থেকে এক সুন্দরী তরুণী চাকরিসূত্রে তাদের সঙ্গে থাকতে এলে তারা তার বিনয় দেখে আপ্লুত হয়। পরিপাটি সাজানো সৌন্দর্যের সঙ্গে পূর্বপরিচয় না থাকায় তার রূপে তারা মুগ্ধ হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে দু-এক দিন পরে তরুণীটি তাদের ছেড়ে গেলে তারা অসহায় ও একাকী বোধ করতে থাকে; পুরোনো ঠিকানা ছেড়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে আসা ওই পাঁচ তরুণী পুনরায় নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।

শিকড় ছেড়ে আসা শহুরে তরুণীটির তাও শিকড়ের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, ফিরেও গিয়েছে সে। কিন্তু তারা সে সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। ছিন্নমূল এই মানববৃক্ষগুলোর পরিত্যক্ত শ্রীহীন হয়ে নগরের উপান্তে থেকে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাদেরও রয়েছে সুন্দরের ও প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু নিজেদের অবস্থান থেকে নড়ার সামর্থ্য নেই তাদের, পরস্পরের নিকটে যাওয়ার শক্তিটুকুও নেই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি বিখ্যাত রূপকাশ্রয়ী গল্প 'গাছ' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১)। এই গল্পে গাছের দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের বৈপরীত্যের সুলুক সন্ধান করেছেন লেখক। নিসর্গের প্রতীক হয়ে বৃক্ষ এখানে মানুষের ভাবনার জটিল-কুটিল ভারকে হালকা করে প্রেমের দর্শনে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে; তাদের চিন্তার, চেতনার দূরত্বকে একই সরলরেখায় মিলিয়ে দিয়েছে।

মানব কল্যাণে বৃক্ষের ভূমিকা নিয়ে দুজন মানুষের বিপরীতমুখী ভাবনার দ্বৈরথে গাছটির জীবন বিনাশের আশঙ্কা তৈরি হয়। চলৎশক্তিরহিত বৃক্ষের তাতে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। সে শুধু উভয় পক্ষের সংগুপ্ত ভাবনা দিব্যজ্ঞানে জেনে নিতে পারে। যে তাকে নিধন করতে চায় তার যেমন যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, তেমনি যে তাকে রক্ষা করতে চায় তারও যুক্তির অভাব নেই। তারা দুজনই হাতে কুড়াল আর লাঠি নিয়ে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়। তর্কের এক পর্যায়ে তারা আবিষ্কার করে যে, আদতে তারা দুজন একই বৃত্তের বিপরীত প্রান্ত, যে প্রান্ত দুটি প্রেমের অভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করতে পারছে না।

এই গল্পে বৃক্ষের মধ্যস্থতায় মানব-মনের অহং ধুয়ে-মুছে এর নিটোল প্রেমময় রূপটিকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। বৃক্ষ এখানে চিন্তাশীল মানুষের মতো স্থিতধী; জ্ঞান তার সম্বল, শক্তি নয়। তবে জ্ঞানের সঠিক নম্র প্রয়োগ প্রেমের অমৃত সুধায় ভর করে পরাক্রান্ত দেহশক্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করতে পারে – এই দার্শনিক বার্তাটি হয়তো লেখক এই গল্পের মাধ্যমে পাঠককে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

উল্লিখিত গল্পগুলো ছাড়াও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরো কয়েকটি গল্পে নিসর্গ নির্ভার নিয়ামক হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে – কোথাও কাহিনির অংশ না হয়েও কাহিনিকে চালিত করেছে, কোথাও-বা কাহিনির সমান্তরালে থেকে গল্পের ভিন্ন ইঙ্গিত নির্দেশ করেছে। 'গন্ধ' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড* ১৯৮২) গল্পটিতে যেমন একটা মাছরাঙা গল্পের কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও সমগ্র গল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে; তার উপস্থিতি কিংবা ক্ষণে ক্ষণে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এই গল্পকে নৈসর্গিক বিমূর্ততা দিয়েছে। কেবল মাছরাঙাটিই নয়, নিসর্গের বর্ণনায় আসন্ন সন্ধ্যার আভাসটুকুও গল্পের পরিবেশ রচনায় প্রভূত ভূমিকা রেখেছে :

> মাছের আর আশা নেই দেখে বেড়ার গায়ে মাছরাঙাটা বুঝি উড়ে গেছে কোথাও। এখন গাছের ছায়া আরও লম্বা হয়েছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদের রেখাগুলি যেন একটা বেশ চোখা ধারালো চেহারা ধরেছে। যেন একটু পর আয়ু শেষ হবে বলে এখন টুকটুকে লাল রং ধরেছে রৌদ্রের। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গন্ধ', ১৯৮২ : ১৯২)

আবার 'জ্বালা' (*মহীয়সী* ১৯৬১) গল্পে নিসর্গ চরিত্রের মানসিক অবস্থার প্রতীকস্বরূপ। কেবল প্রতীক বললে ভুল বলা হবে, বরং নিস্তরঙ্গ গ্রীষ্মের দুপুরে চরিত্রের অস্থির-উচাটন-বিরক্ত-বিব্রত মনের উপর নিজের প্রভাব ছড়িয়ে দিতেই যেন এখানে নিসর্গের আবির্ভাব ঘটেছে :

> কোথায় একটা চিল ডাকছে। দীর্ঘ অনুচ্চ মন্থর একঘেয়ে শব্দ। আরও খারাপ লাগে। মনে হয় এই শব্দের সঙ্গে দীর্ঘ নিদাঘ মধ্যাহ্নের কোথায় যেন মিল আছে। মনে হয় চিলের ডাক এত রোদ নিয়ে এল, মনে হয় রৌদ্রদগ্ধ বিশাল আকাশ চিলটাকে ডেকে আনল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'জ্বালা', ২০১৫ক : ৭০৭)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বেশ কিছু গল্পে মানুষের মননে নিসর্গের অভিঘাতের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তিনি কথক ও অন্য চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মানুষের শরীর ও মনে নিসর্গের গভীর প্রভাবের প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। উদাহরণ হিসেবে লেখকের 'মাছধরার গল্প' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১) থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> বললাম 'হ্যাঁ'। একটু চুপ থেকে পরে বললাম 'আমার মনে হয় তোমার দোকানের সামনের সেই সুন্দর ছাতিম গাছটাই তোমার হাসিকে এখনও টাটকা সবুজ রেখেছে।'
>
> কাকু আবার সজোরে হাসল। 'যা বলেছিস। তবে ঠিক ছাতিম গাছ না, গাছে যে অফুরন্ত পাখি উড়ে এসে বসে তারাই আমাকে আমার হাসিকে শুকোতে দিচ্ছে না।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মাছধরার গল্প', ২০১৫ক : ৮২২)

মানুষের উপর নিসর্গ যেমন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে তেমনি প্রকৃতির সংস্পর্শ মানুষের মধ্যে মুহূর্তের বিচলনও তৈরি করে। মনের মুক্তির জন্য জাগতিক ভোগবিলাস ও ব্যস্ততা থেকে ছুটি নিতে তাই সে প্রকৃতির শরণাপন্ন হয়, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নেওয়ার অভিপ্রায়ে ছুটে যায় নিসর্গের কাছে। আবার কখনো নিসর্গ নিজেই এসে উঁকি দেয় প্রাণোচ্ছল মানুষের দুয়ারে। নিসর্গ জানে, পরস্পর মুখোমুখি হলে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মানুষ তাকে উপেক্ষা করতে পারবে না। 'নীল পেয়ালা' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১) গল্পের প্রারম্ভিক অংশে লেখক তা-ই বিবৃত করেন :

> আকাশের নীল পেয়ালা উপচে পড়ছে উষ্ণ মধুর রোদ। রোদ তো না, পেয়ালা উপচে জাফরান রঙের চা ঝরে পড়ছে, যত খুশি পান করে নাও, শরীর চাঙ্গা হবে, মন প্রফুল্ল হবে। আহা, শীতের সকালের রোদ। বৈদ্যনাথবাবু এমন দিনে কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারেন না। ওভারকোট, মঙ্কি ক্যাপ, ডার্বি শু, দস্তানা, মোজার

বর্ম এঁটে হাতির দাঁতের মাথাওয়ালা সুন্দর ছড়ি হাতে, যেন পৌষের পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে আকাশের পেয়ালা থেকে গড়িয়ে পড়া চা প্রাণভরে সকলের আগে খেয়ে নিতে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'নীল পেয়ালা', ২০১৫ক : ৮৩২)

অবশ্য এই গল্পে বৈদ্যনাথবাবুর তেমন ব্যস্ততা নেই, বরং শীতের সকালের রোদ গায়ে লাগাতে তিনি নিজেই ব্যগ্র। তাঁর এই আগ্রহ থেকেই বৈদ্যনাথবাবুর স্বভাবের একটা অস্পষ্ট আদল তৈরি হয় পাঠকের মনে, পরবর্তী পর্যায়ে লেখকের বর্ণনা সেটিকে পাঠকের কাছে স্পষ্টতর করেছে। পৌষের ঝকঝকে আকাশের রোদ তাঁকে তাঁর শৈশবে নিয়ে যায় যেন; ছেলেমানুষের মতো তিনি বাইরে ছুটে আসেন।

নিসর্গের অভিঘাত মানুষকে প্রশান্ত করে, তার মধ্যে এক ধরনের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির জন্ম দেয়। কেবল এটুকুই নয়, নিসর্গ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। কেউ স্মৃতিকাতরতায় ভোগে, কেউ-বা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়। 'মাছি' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১) গল্পে দেখা যায় :

তার বাগানে হেনা ফুটেছে, বকুল বেলী দুয়েকদিনের মধ্যে ফুটতে আরম্ভ করবে। ওদিকটায় অশোক কৃষ্ণচূড়ার লাল দেখা দিতে শুরু করেছে।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে ভূদেব মুগ্ধনেত্রে বাগান দেখছিলেন, ধড়াচূড়া ছাড়ছিলেন। হেনার গন্ধমিশ্রিত মলয়ানিল একটু সময়ের জন্য তাঁকে কেমন বিবশ বিমনা করে তুলছিল। বুঝি যৌবনের কথা মনে পড়ছিল তাঁর। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মাছি', ১৯৮১ : ৭৯)

কর্মব্যস্ত জীবনে মুহূর্তের প্রকৃতিমনস্কতা মানুষকে কীভাবে স্মৃতিতাড়িত করে তুলতে পারে, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অতীতের স্বর্ণ-সময়ে, তারই দৃষ্টান্ত রয়েছে উপরিউক্ত বর্ণনায়। প্রকৃতির এই বিবরণ গল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত না হয়েও এক পর্যায়ে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হয়ে ওঠে, কেননা গল্পের পরবর্তী অংশে জানা যায় ভূদেবের পাশের বাড়িতে এক দুরন্ত কিশোর নিজেকে যৌবনের রঙে রাঙিয়ে বহু বছর পর আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। ছেলেটির আবির্ভাবের পূর্বে ভূদেবের স্মৃতিকাতরতা প্রকৃতি ও ভূদেবের মধ্যে যেন সংযোগ সৃষ্টি করে। আবার চিরচেনা নিসর্গের অপরিচিত রূপ মানুষকে কীভাবে হতবিহ্বল করে দেয় তার বর্ণনা পাওয়া যায় 'বিষ' (*পার্বতীপুরের বিকেল* ১৯৫৯) গল্পে চরিত্রের স্মৃতিচারণে :

> 'হ্যাঁ, যাকগে কী বলছিলাম, সন্ধ্যার দৃশ্য – পিছনে আগুন ছড়ানো পলাশের জঙ্গল আর ওদিকে কুমকুম ছিটানো পশ্চিমের আকাশ – দৃশ্যটা দেখে সত্যি আমরা কতক্ষণ কোনও কথা বলতে পারিনি। এত রঙ পৃথিবীতে আছে।' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বিষ', ২০১৫ক : ৫৯৫)

'বিষ' গল্পে এই নিসর্গ-বর্ণনার অন্য একটি মাহাত্ম্যও রয়েছে। গল্পের এই চরিত্রটি অন্ধ। সে তার স্মৃতি থেকে সব রং তুলে এনে তা রোমন্থন করে নিজের অন্ধকার দৃষ্টির উপর তার প্রলেপ বুলিয়ে নিচ্ছে। রঙিন নিসর্গের সকল স্মৃতি যেন তার অন্ধ দশাকে হাহাকারে ভরিয়ে তুলছে। একইভাবে মানুষের ভঙ্গুর শরীর ও মনে নিসর্গের বিষাদময় প্রভাব বিস্তারের চিত্র বিধৃত হয়েছে 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ* **১ম খণ্ড ১৯৮১**) গল্পে :

> তখন বাইরেটা শুক্লা দশমীর দুধসাদা জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে। বেশ বোঝা যাচ্ছিল ফাগুন মাস। কোকিল ডাকছিল। যেন থরে থরে কোথাও গন্ধরাজ ফুটেছে। ফুলের গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। সেই সঙ্গে আমরাও। আমরা ভাগ্যবান, বলতে হবে। ভেবে নতুন করে হাসি পেল। হাসি না যদিও কেউ। এ যে কী করুণ দশা। চাঁদের আলো ঝরিয়ে কোকিলের ডাকে দশদিক আমোদিত করে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে রসিকতা করে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা', ১৯৮১ : ৯৩)

অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত হাসপাতালের রোগীরা, যারা জানে না সেখান থেকে তাদের আদৌ মুক্তি মিলবে কি না, তাদের কাছে নিসর্গের এই অপরূপ রূপ যেন প্রকৃতির এক নির্মম উপহাস। নিসর্গের হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য তাদের নিভে আসা প্রাণপ্রদীপকে ঝোড়ো বাতাসে হঠাৎ দুলিয়ে দিয়ে যায়। মায়াময় প্রকৃতির রাজ্যে তাদের অস্তিত্ব যে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী – এই সত্যটি যেন এমন চোখধাঁধানো প্রকৃতির অনুষঙ্গে আরো প্রকট হয়ে ওঠে। প্রকৃতির এই রূপ তাদের আনন্দিত করার সঙ্গে সঙ্গে মনে হাহাকারও জাগিয়ে দেয়।

প্রকৃতি ও মানুষের মনোজগতের ওতপ্রোত সম্পর্ককে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। সমালোচকের মতে :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কোনো অজ্ঞাত অরণ্যের বর্ণনা না দিলেও আমাদের শহুরে জীবনের আশেপাশে যে সামান্য প্রকৃতি – একটা ছোট জঙ্গল বা নিরালা পুকুর, কিংবা কুয়োতলার আগাছা – কি নিবিড় দৃষ্টি নিয়ে তিনি দেখেন তাদের, তাদের রং, গন্ধ ও স্পর্শ পর্যন্ত সজীব হয়ে ওঠে। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ১৪১৬ ব. : ৩০৬)

বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর লেখায় পাহাড়-নদী-অরণ্যের অতিরঞ্জিত বর্ণনা দেননি। তিনি তাঁর দেখা নিসর্গের অনুপুঙ্খময় খণ্ডচিত্র এঁকেছেন; তার সঙ্গে মানুষের মনের, অন্তরাত্মার সংযোগ সাধন করেছেন, মানুষ ও প্রকৃতিকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। সেখানে ফুল, পাখি, লতাপাতা, হাসি, ঘ্রাণ – সবকিছুর উপস্থিতি আছে। তাঁর গল্পে তিনি যত ধরনের ফুলের বর্ণনা দিয়েছেন, যত প্রকার ঘ্রাণের কথা বলেছেন, এমনকি যত রকম হাসির বিবরণ দিয়েছেন, তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

জ্যোতিরিন্দ্রের এই পর্বের গল্পগুলোতে নিসর্গ-নিমগ্ন সত্তার নান্দনিক উদ্ভাসন লক্ষণীয়। মানুষ ও প্রকৃতির সেতুবন্ধন রচনা করে তিনি পাঠকের মনে এই উপলব্ধির উন্মেষ ঘটান যে, মানব-মনের সামগ্রিক অভিব্যক্তির পেছনে নিসর্গের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতিকে কেন্দ্রে রেখে রচিত তাঁর এই গল্পগুলোয় মানুষ প্রকৃতির প্ররোচনায় উন্মোচিত হয়েছে, নিজেকে পুনরাবিষ্কারের সুযোগ পেয়েছে। এই আবিষ্কারের প্রভাবে তারা কখনো কখনো বিধ্বংসী হয়ে উঠলেও পরবর্তী পর্যায়ে পুনরায় শান্ত হয়েছে প্রকৃতিরই সংস্পর্শে এসে, তাদের রাগ-ক্ষোভ-ঘৃণা-উগ্রতার প্রশমনে প্রকৃতিই তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। রিপুর তাড়নার ফলে মানুষের যে বিকৃতি, সেই বিকৃতি থেকে তাকে উদ্ধার করে আত্মশুদ্ধির শুভ বার্তা শুনিয়েছে নিসর্গই। নিসর্গের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে তাদের পক্ষে শূন্যতা, ক্ষুদ্রতা, মানসিক দীনতা থেকে আরোগ্য লাভ সম্ভব হয়েছে। মানব-মনের চিরন্তন কিন্তু অচেনা-অজানা অনুভূতিগুলোর স্বতন্ত্র ও শিল্পসফল প্রকাশ হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই নিসর্গনির্ভর গল্পগুলো বিশেষ মর্যাদার দাবিদার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব

স্বাধীনতা মানুষের কাছে পরম আরাধ্য হলেও এটি সর্বজনবিদিত যে মানুষ স্বাধীন নয়। এমনকি পৃথিবীর স্বাধীনতম মানুষটিও নিজের সচেতন ইচ্ছাশক্তির অধীন নয়। মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডের নেপথ্য চালিকাশক্তি তার অবচেতন মন। মূলত অবচেতন মনের গভীরে সুপ্ত থাকা এক প্রবল জৈবিক তাড়নার মাধ্যমে মানুষের সকল কর্মপ্রণোদনা নিয়ন্ত্রিত হয়। মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েড মানুষের মনোজগৎকে সচেতন ও অবচেতন নামে দুটি স্তরে বিভক্ত করে জানান, মানব-মনের চার ভাগের তিনভাগেরও বেশি অংশ জুড়ে অবচেতনের আধিপত্য, যার উপর ব্যক্তির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ব্যক্তির সমুদয় আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও নিবৃত্তি ঘটে তার অবচেতনের অন্ধকারে সুপ্ত থাকা জৈবিক শক্তির মাধ্যমে।

জন্মগত গুণাবলি এবং পরিবেশ – এ দুটির সমন্বয়ে ও সংঘাতে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। এর মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি তা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পর্কে সিগমুন্ড ফ্রয়েড, আলফ্রেড অ্যাডলার, জর্জ মিলার প্রমুখ মনস্তাত্ত্বিকের একই মত – ব্যক্তিত্ব খুব অল্প বয়সেই পূর্ণ রূপে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েডের মতে, পাঁচ বছর বয়স থেকে মানুষের ব্যক্তিত্বের সূচনা ঘটে; পরবর্তীকালে যে পরিবর্তন লক্ষ করা যায় তা মৌল কোনো পরিবর্তন নয়। পাঁচ বছরের শিশুটি যখন ষাট বছরের প্রৌঢ়ে রূপান্তরিত হয় তখনও তার ব্যক্তিত্বে মূলগত কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ব্যক্তিত্ব মূলত স্থবির (সুনীলকুমার সরকার ১৯৯৯)। বংশগত যে ব্যাপারটি পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বের সূচনা করে, ফ্রয়েড তাকে libido বা কামপ্রবৃত্তি বলেছেন। ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্ব প্রসঙ্গে ড. ভেরোনিক মতিয়ের তাঁর *Sexuality : A Very Short Introduction* গ্রন্থে বলেন :

> He developed a theory of unconscious drive/libido that saw sexual desire not as something that could be controled and overcome, but as ever-present in men as well as women. . . . His influential *Three Essays on the theory of sexuality* (1905), conceptualized sexuality not as a pre-given, ready-made natural instinct from which subjects can then deviate, but rather as a drive that is constructed in the process of childhood psychological development. Freud argued that the channelling of the child's diffuse sexuality into socially acceptable forms is central to its development into adulthood. (Mottier 2008 : 46-47)

ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী মানুষের মন দুটি শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যার একটি আমাদের প্রজনন ও আত্মরক্ষায় সহায়তা করে, অন্যটি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। প্রথম প্রক্রিয়াকে প্রগতিপন্থী বা জীবনমুখী (eros) আর অন্যটিকে প্রগতিবিরোধী বা মৃত্যুমুখী (thanatos) প্রক্রিয়া বলা যেতে পারে। প্রগতিপন্থী প্রক্রিয়াটিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন কামশক্তি। কামকে তিনি ভালোবাসা আখ্যা দিয়ে তার ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, ভালোবাসা-সহ নানা প্রবৃত্তির একত্রিত রূপই কাম। ফ্রয়েডের ভাষায় তাই কাম বলতে কেবল যৌনাকাঙ্ক্ষা বোঝায় না, যৌনাকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু করে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি, বাবা-মায়ের প্রতি ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা, বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি ভালোবাসা, এমনকি জড়পদার্থ এবং কাল্পনিক ধারণার অন্তরালেও কাম নিহিত থাকে।

উত্তরসূরি মনঃসমীক্ষক কার্ল গুস্তাফ ইয়ুঙের মতে, লিবিডো শুধু যৌনাকাঙ্ক্ষা নয়, বরং তা ব্যক্তির সকল প্রকার কর্মপ্রচেষ্টার চালিকাশক্তি। ইয়ুঙের মতবাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে দার্শনিক অঁরি বের্গসন-এর প্রাণশক্তিবাদ এবং উইলিয়াম ম্যাকডুগাল-এর সজীবতাবাদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আলফ্রেড অ্যাডলার, কারেন হোরনে, এরিক ফ্রম, হ্যারি স্টাক সুলিভান, ওটো র‍্যাংক, লুডভিগ বিন্সওয়াঙ্গার প্রমুখ অস্তিত্ববাদী মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের লিবিডো-তত্ত্বের সমালোচনা করেন। লিবিডোর ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যাকে এঁরা কেউ পুরোপুরি স্বীকার করেননি। অপরদিকে এই তত্ত্বকে অসংখ্য মনোবিজ্ঞানী সাদরে গ্রহণ করেছেন। শিল্প-সাহিত্যেও এই লিবিডো-তত্ত্ব এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। যাঁরা এই তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহণ করেননি তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর মধ্যে যৌনাকাঙ্ক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী।

প্রথমদিকে ফ্রয়েড ভেবেছিলেন, অবচেতন মনের বিষয়াবলি আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এর মধ্যে মানুষের বংশগত উপাদানের অস্তিত্বকেও স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আদিম যৌন কামনা-বাসনা ও জিঘাংসাও অবচেতনে সুপ্ত থাকতে পারে। বংশগতির সূত্রে পাওয়া এই অবদমিত ইচ্ছেগুলো ব্যক্তির অবদমিত অভিজ্ঞতার চেয়েও অনেক শক্তিশালী হতে পারে (সুনীলকুমার সরকার ১৯৯৯)।

ফ্রয়েডের মতে, সচেতন মনের সঙ্গে লিবিডোকেন্দ্রিক ‘অদস’ (id) বা সহজাত আদিম প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব মানুষের যাবতীয় বিকারগ্রস্ততার আদি কারণ। আবার একইসঙ্গে লিবিডোই মানুষের সকল সক্রিয়তা ও উদ্যমের সংগোপন অংশ। লিবিডোর মূল শাখা প্রেম ও যৌনতা, যা সচেতন মনের সঙ্গে সঠিকভাবে বিক্রিয়া করলে তা থেকে ইতিবাচক আবহ সৃষ্টি হয়, আবার বিক্রিয়ার রসায়নে ত্রুটি থাকলে তা নেতিবাচকতার জন্ম দেয়। এই নেতিবাচকতা ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ভয়ংকর দুর্যোগ বয়ে আনতে পারে।

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞানী এইচ. সি. মিলার তাঁর *Psychoanalysis and Its Derivatives* (১৯৪৫) গ্রন্থে অদস-এর বৈশিষ্ট্যগুলোকে স্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করে আরো পরিষ্কার ধারণা দিতে সক্ষম হন। তাঁর মতে, অবদমিত বাসনা অবচেতনে সুপ্ত থাকে এবং এটি অনৈতিক, যুক্তিতে বিশ্বাসী নয়, জীবনমুখী এবং মৃত্যুমুখী সমস্ত প্রবৃত্তিই এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

মানুষের অবচেতন মনের দুই ধরনের উপাদান রয়েছে – একটি হলো মানব প্রবৃত্তি, অন্যটি তার অবদমিত কামনা-বাসনা। প্রবৃত্তি মূলত জৈবিক। ফ্রয়েডীয় প্রত্যয় অনুযায়ী, জীবনমুখী (eros) ও মৃত্যুমুখী (thanatos) এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তি মানুষের অবচেতনে একে অন্যের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। জীবনমুখী শক্তিকে ফ্রয়েড কামশক্তি ও ভালোবাসা বলেছেন। প্রগতিপন্থী ইরস-এর কারণেই মানুষের মাঝে প্রেম বা ভালোবাসার অনুভূতি জাগ্রত হয়। এই ইরসকে ফ্রয়েড বলেছেন লিবিডো, যার কারণে মানুষ একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মূলে এই লিবিডো ক্রিয়াশীল। এগুলো ছাড়াও মানুষের মন তার অযাচিত ও অসামাজিক ইচ্ছেগুলোকে অবদমন করে অবচেতনে পাঠিয়ে দেয়। এই অবদমিত ইচ্ছে বা কামনা-বাসনা নিয়ে অবচেতনের আরো একটি অংশ গঠিত হয়। এই অংশটিই ফ্রয়েড-কথিত অদস (id)। অদস কেবল প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত এবং তা অন্ধভাবে সুখের অনুসন্ধান করে। ভালো-মন্দ বিবেচনাবোধ অদস-এ অনুপস্থিত। কিন্তু কোনো সুখ যতটুকু পূরণ হওয়া সম্ভব বাস্তবতা ও নৈতিকতার নিরিখে ঠিক ততটুকুই পূর্ণ করে বাকিটা অবচেতনে সুপ্ত রাখা অহমের (ego) কাজ। আবার অহম যদি অদস-এর অনৈতিক ইচ্ছা পূরণের কোনো পথ আবিষ্কার করে ফেলে তখন তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে আগমন ঘটে অধিশাস্তার (super ego)। অধিশাস্তা সুখের অনুসন্ধানে অদস-এর এই অপ্রতিরোধ্যতাকে অভিভাবকের মতো নিয়ন্ত্রণ করে, ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ ও তার পরিণাম সম্পর্কে তাকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করে। এই অধিশাস্তা যখন অদসকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখনই ঘটে বিপত্তি। অবচেতনে সুপ্ত-থাকা অবদমিত ইচ্ছেগুলো কুৎসিত রূপে প্রকাশিত হয়; ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। কিন্তু অদস যখন অহম এবং অধিশাস্তার বলয়ে আবিষ্ট থেকে প্রগতির পথে গমন করে তখন জীবনে ইতিবাচকতা আসে, জীবন স্থিতিশীল হয়। লিবিডো যখন পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনা করে সুখের সন্ধান করে তখন তাকে প্রেম কিংবা ভালোবাসার মতো সদর্থক নামে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রেম ও যৌনতার অবিভাজ্য সম্পর্কের মধ্যে লিবিডোর নেতিবাচক রসায়নকে রুখতে গিয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজব্যবস্থা যুগে যুগে নানারকম বিধিনিষেধ আরোপ করে আসছে। প্রেম ও যৌনতার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সময় ও সংস্কারের চাপে কখনো কখনো এত বিকৃত হয়ে ওঠে যে, মানুষের মনোজগতে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। প্রেম ও যৌনতা উভয়ই স্থান ও পাত্রভেদে বিকারে

পরিণত হয়। একদিকে মানুষের উদ্দাম তাড়না ও অন্যদিকে সামাজিক সংস্কারের বিভিন্ন বিধিনিষেধে প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের মনকে কলুষিত করে তোলে।

অবাধ প্রেম ও যৌনাচারকে ঠেকাতে যুগে যুগে বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসন প্রযুক্ত হলেও সময়ের বিবর্তনে এইসব নিষেধাজ্ঞা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠেছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী হওয়ায় কখনো কখনো তা চরম মানবিক সংকটও সৃষ্টি করে। একজনের কাছে যা আচার অন্যজনের কাছে তা অবদমন হিসেবে গৃহীত হতে পারে। অনেকে সমাজ ও সংস্কারের ভয়ে নিজের চাহিদাকে দমিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও অনেকেই এ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। আবার কেউ কেউ এসব গ্রাহ্যই করে না; তারা ভিন্ন বিকল্প খুঁজে নেয়। সেই বিকল্পগুলো সমাজ ও ব্যক্তির জন্য ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষতিকরও হয়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে সিগমুন্ড ফ্রয়েড বলেন – 'Unexpressed emotions will never die. They are buried alive and will come forth later in uglier ways' (Freud n.d.).

বাঙালি সমাজব্যবস্থাও এই বাস্তবতা থেকে মুক্ত নয়। বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা এতটা পশ্চাৎপদ যে, অবদমন ও বিকৃতি উভয়ই এখানে অন্যান্য সভ্য সমাজের তুলনায় বেশি। বলা যেতে পারে, ১৯৩০-এর দশকের দিকে মনঃসমীক্ষণ বিষয়ে সচেতনভাবে গুরুত্ব আরোপের পূর্ব পর্যন্ত সমাজচিত্রের এই দিকগুলো বাংলা সাহিত্যে সেভাবে বিধৃত হয়নি। প্রেম ও যৌনতার বন্দনা করে যেসব সাহিত্য সে সময়ে রচিত হয়েছে তাতে চরিত্রের মনোবিকলনের স্তরবিভেদ দেখা যায় না। অথচ মানুষের মনোবিকলন কোনো নতুন প্রপঞ্চ নয়। তবে ফ্রয়েড-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মানুষের প্রেম ও কামনাকে নানা সূক্ষ্মতা-সহ বিশ্লেষণ করে চরিত্র নির্মাণে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছেন আধুনিক সাহিত্যিকেরা। তাঁদের সাহিত্যে প্রেম ও যৌনতা নিয়ে সমাজ ও ব্যক্তির বহুস্তরবিশিষ্ট সূক্ষ্ম ধারণা ও ঘটনাক্রম শিল্পিতভাবে উপস্থাপিত হতে শুরু করে। বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেম ও যৌনতা প্রসঙ্গে 'আঁতের কথা' বের করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় বাংলা কথাসাহিত্যে প্রেম ও যৌনতাকে উপস্থাপনের প্রথম প্রয়াস নেন তিনি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের প্রেমাকাঙ্ক্ষায় রোম্যান্টিক অনুভবের বিপরীত প্রবণতা কখনো কখনো প্রাধান্য অর্জন করে। স্বার্থ ও স্বার্থহীনতার দ্বন্দ্ব, শুভ ও অশুভের সংঘাত এবং আবেগ ও যুক্তিবোধের সমন্বয়ে তাঁর 'অতসী মামী' (১৯২৮) গল্পে অসীমের প্রতি আকর্ষণজনিত অতৃপ্তি এবং 'ধাক্কা'য় (১৯৩২) দাম্পত্য ও প্রণয়ের সংকট চিত্রিত হয়েছে। 'শিপ্রার অপমৃত্যু'তে (১৯২৮) নিঃসংকোচ প্রণয়প্রয়াস আঁকতে গিয়ে শিপ্রার সংকোচহীনতার মূলে একজন নারীর জীবনের অপরিসীম করুণ বেদনা আর মর্মযাতনাও তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে লক্ষ করেছেন। তাঁর 'সরীসৃপ' (১৯৩৩) গল্পের বনমালী কিংবা 'প্রাগৈতিহাসিক'-এর (১৯৩৩) ভিখু লিবিডোতাড়িত যৌনবিকলনের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পরবর্তীকালে জগদীশ গুপ্তের 'শঙ্কিতা অভয়া' (১৯৪৭) গল্পে পূর্বপক্ষের কন্যাকে নিয়ে পরবর্তী পক্ষের

সংসার করতে এসে অভয়ার যে শঙ্কা এবং স্বামী-স্ত্রী-কন্যা এই তিন চরিত্রকে ঘিরে পিতা-পুত্রীর আসঙ্গলিপ্সার যে আশঙ্কা মূর্ত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অনেকটাই নতুন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর জগদীশ গুপ্তের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। মনোগত প্রতিক্রিয়ার চিত্রাঙ্কনেই মানিকের আগ্রহ বেশি। কলুষতা ঘাঁটাঘাঁটিতে তিনি যেমন নিরুৎসাহী তেমনি কদর্য সমাজচিত্র পরিবেশনেও তিনি পরাঙ্মুখ।

বাংলা সাহিত্যে নরনারীর যৌনসম্পর্ক নিয়ে লেখালেখিরও একটা ধারাবাহিকতা আছে – জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। তবে জগদীশ গুপ্ত আর মানিকের সঙ্গে তুলনা করতে গেলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে মানিকের উত্তরসূরি বললে অত্যুক্তি হবে না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পে যৌনতার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কলুষতা ও কদর্যতার চিত্রাঙ্কনে আগ্রহী ছিলেন না। মানব-মানবীর সম্পর্কের বহুমুখী চিত্রায়ণ ঘটেছে তাঁর প্রেম ও যৌনতা বিষয়ক গল্পগুলোয়। নারী-পুরুষের প্রেম-ভালোবাসা, শরীরী আবেগজনিত ফ্যান্টাসি, যৌনতা, অবদমিত বাসনার অভিব্যক্তি, সমাজ-নিষিদ্ধ ও সম্পর্ক-বিরুদ্ধ প্রেমের প্রকাশের ভেতর দিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্ররা প্রাণবন্ত অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তাঁর গল্পে দেহজ কামনা-বাসনার প্রকাশ যেমন আছে তেমনি সহজ প্রেমের নিটোল চিত্রও দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে কখনো কখনো চরিত্ররা প্রেমের পবিত্রতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের গল্পের সংখ্যা যদিও কম, কিন্তু বিরল নয়। তবে তাঁর প্রেম ও যৌনতা বিষয়ক গল্পগুলোতে তিনি সর্বাংশে অশ্লীলতার পরিপন্থী, সম্ভোগ-বর্ণনা-বিমুখ। শৃঙ্গার রসের বর্ণনা তাঁর শিল্পীসত্তা-বিরুদ্ধ। প্রেম ও যৌনতার শিল্পরূপ দানের ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের অনুসন্ধান এবং চরিত্রের অন্তশ্চৈতন্যের চিত্রাঙ্কনেই তাঁর অধিক আগ্রহ। তাঁর সাহিত্যে প্রেম ও যৌনতা নানা মাত্রায় উপস্থাপিত হলেও তিনি নিজের হাতে কোনোরকম বিচারের ভার না রেখে শুধুমাত্র চরিত্র ও ঘটনার সংশ্লেষের ফলাফলটি দক্ষ লিখনশৈলীর মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেন :

> . . . যৌনতা শুধু স্ত্রী বা প্রেমিকার শরীর ঘাঁটাঘাঁটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। যৌনতায় আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্লিভেজ থাকে – সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইশারা যা আমাদের নিরন্তর অমৃত ভেবে বিষপান করায় – বিষ ভেবে গলায় ঢাললে অমৃতের স্বাদ মেলে।
>
> বাংলা সাহিত্যে সেই সূক্ষ্ম, জটিল যৌনতা আছে একমাত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীতেই।
> (অসীম সামন্ত ২০১৭ : ৮১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কাঠামোর নিরিখে প্রেম ও যৌনতার মিথস্ক্রিয়াকে দুটি আলাদা পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এদের প্রথমটি প্রেম ও যৌনতার পারস্পরিক সুষমতা, যেখানে গল্পের বিকাশে প্রেম ও যৌনতা একে অপরকে আশ্রয় করে গল্পের গঠন ও পরিক্রমায় বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এই পর্যায়ের গল্পে

প্রেম ও যৌনতা সবসময় গল্প-কাঠামোর মূল ভাগে অবস্থান না করলেও কাহিনির বিকাশ ও পরিণতিতে উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ গল্পে যৌনতা প্রেমকে পূর্ণতা দান করেছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলিতে কাহিনি-কাঠামোর প্রয়োজনে প্রেম ও যৌনতার অস্বাভাবিক উপস্থিতি লক্ষণীয়। এই গল্পগুলোকে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যায় 'লিবিডোতাড়িত যৌনবিকার'-এর গল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাঁর গল্পের এই পর্যায়টি নিয়ে 'লিবিডোতাড়িত যৌনবিকার' শিরোনামে পৃথকভাবে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। এখানে প্রেমের নির্যাস ছাড়াই কেবলমাত্র কামের তাড়না থেকে যৌনতার অস্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। এসব গল্পের চরিত্ররা প্রেমের স্পর্শে আর্দ্র হয়ে ওঠে না, বরং জৈবিক তাড়নার প্রাবল্যে গল্পে এক ধরনের কদর্য রূপ ধারণ করে কোনো কোনো চরিত্র।

তবে লিবিডোতাড়িত যৌনবিকারেরও দুটি স্পষ্ট আলাদা বিভাগ রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে। এদের একটি পাশবিক কামের তাড়না যা স্থূল জৈবিক চাহিদা থেকে উদ্ভূত, অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় তত্ত্বমতে অদস এখানে অহম ও অধিশাস্তার শাসনকেও হার মানিয়ে দেয়। অন্যটি একাকিত্ব ও আত্মআবিষ্কারের মোহ থেকে সৃষ্ট বিকার। জৈবিক অদসকে নিরস্ত করতে অহম ও অধিশাস্তা অবশ্য এখানেও বিফল, তবে এক্ষেত্রে ব্যক্তির জৈবিক তাড়নাই প্রধান নয়, বরং যৌনতা এখানে নিজের মন ও শরীরের মাধ্যমে আত্ম-আবিষ্কারের প্রয়াসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে এই উপপর্যায়টিও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রেম ও যৌনতার সহজ সহাবস্থান

মনোবিজ্ঞানের ভাষ্য থেকে বেরিয়ে সাহিত্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায়, গল্পকে সম্ভাবনাময় করে তুলতে কাহিনিতে সংকটের প্রয়োজন হয়। প্রেম ও যৌনতার মধ্যে সৃষ্ট সংকট সাহিত্যের প্রধান এক উপাদান। সাহিত্যে প্রেম ও যৌনতার মধ্যে সমাজসিদ্ধ সুষমতা বিরাজ করলে তা প্রায়শই মনোগ্রাহী গল্প হিসেবে দানা বাঁধতে পারে না। আবার কদাচিৎ দানা বাঁধতে পারলেও গল্পের বিষয়বস্তু এই দুটি প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে আবর্তিত না হয়ে আলাদা সংকটের উপর ভর করে বাহিত হয়। সেসব গল্পে প্রেম ও যৌনতা অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকে মাত্র। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু গল্পের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ভাষা ও ভাবনার সুসমন্বয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সংকট ও মনস্তত্ত্বের গাঁথুনি দিয়ে তাঁর সহজ প্রেমের গল্পগুলোর ভিত গড়েছেন। সেসব গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গল্প 'বনানীর প্রেম' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭)। এই গল্পে শহরতলির ছাপড়া শিক্ষয়িত্রী নিবাসে বসবাসরত পাঁচটি গ্রাম্য তরুণীর সঙ্গে বনানী নামে শহরের আর একটি তরুণী এসে ঠাঁই নেয়। মেয়েটি তার চিকিৎসাধীন প্রেমিকের সুচিকিৎসার প্রয়োজনে বাড়তি কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য উপশহরের ওই স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে আসে। অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থানের নিরিখে এই চাকরিটি সামান্য হওয়া সত্ত্বেও বনানী সচেতনভাবেই এসেছে এখানে। প্রেমিকের

বিপদে আশ্রয় হয়ে ওঠার মধ্যে যে গাঢ় প্রেমের অনুভূতি বিদ্যমান সেই অনুভূতির আনন্দ নিতে বনানী হাসিমুখে এই ক্লেশটুকু সহ্য করতে রাজি। অথচ ফিরতি চিঠিতে বনানীর প্রেমিক তাকে চাকরি ছাড়ার নির্দেশ দেয়। চিঠি পড়ে বনানীর উচ্ছ্বসিত প্রেম ক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। চিঠিতে প্রেমিকটি বনানীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ার অজুহাত দেখালেও সে বুঝতে পারে, মূলত মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে অবাধ যোগাযোগের সুবাদে তার চরিত্রের স্খলন ঘটতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রেমিকটি বনানীকে এমন নির্দেশ দিয়েছে। প্রেমিকের এমন অনুদার উচ্চারণে বনানী মুষড়ে গিয়ে ফিরে যেতে মনস্থির করলেও সেটি তাদের সম্পর্কের জন্য কোনো ইতিবাচকতা বয়ে আনে না। কারণ সে সিদ্ধান্ত নেয়, ফিরে গেলেও প্রেমিকের কাছে ফিরবে না আর। তার মতে, এত দরিদ্র যার মানসিকতা তার কাছে প্রত্যাবর্তন অর্থহীন। পরিবর্তিত উপলব্ধির ফলে নতুন রূপে আবির্ভাব ঘটে বনানীর। প্রেমিকের সন্দেহবাতিকগ্রস্ততা ও সংকীর্ণ মনের কারণে খুব দ্রুত তার মোহমুক্তি ঘটে।

শাশ্বত প্রেমের আমেজে 'বনানীর প্রেম' গল্পটি বিশেষত্ব পেলেও গল্পকার চরিত্রের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে প্রেমের চিরন্তন রূপটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ভিন্ন মাত্রা যোজনা করেছেন। এই গল্পে প্রেম তার সমস্ত সম্ভাবনা সত্ত্বেও শুধু মানব-মনের জটিলতার কারণে পরিণতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতাকে বাস্তবতারই অংশ বলে ধরে নেওয়া যায়।

প্রেমের অনুভূতির আরেকটি জোরালো প্রকাশ দেখা যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শালিক কি চড়ুই' (*শালিক কি চড়ুই*, ১৯৫৪) গল্পের তারাপদ চরিত্রে। দরিদ্র কেরানি তারাপদ কলকাতার অভিজাত এলাকা পদ্মপুকুর রোডের ধনীর দুলালি শান্তনু ওরফে শানুকে বিয়ে করার পর থেকে তার বন্ধু ও সহকর্মীরা তার স্ত্রীর চরিত্র ও মেজাজ নিয়ে নানা ঠাট্টা-তামাশা করতে থাকে। কিন্তু তারাপদের ভাবনায়, দুই মাসেই সে তার স্ত্রীকে চিনে নিয়েছে, বন্ধুদের তির্যক বাক্যে তাই সে বিচলিত হয় না। বরং এসব মন্তব্যে স্ত্রীর প্রতি তার প্রেম আরো প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। এরই ধারাবাহিকতায় সে শানুকে চমকে দিতে একদিন তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে অফিস থেকে ফেরার পথে শাড়ির দোকানের সামনে দিয়ে আসার সময় মাসের শেষ বলে স্ত্রীর জন্য শাড়ি কিনতে না পারার ব্যর্থতায় কাতর হয়। লেখকের বয়ানে :

> হাতে টাকা নেই, মাইনের আরো অনেক দেরি, শাড়ির দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যখন ট্রাম চলছে, কেন জানি তারাপদর খুব ইচ্ছে হল হলদে ছোপ দেওয়া সুন্দর একটা শাড়ি শানুর জন্য আজ কিনে নিয়ে যায়। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শালিক কি চড়ুই', ২০১৫ক : ৭০)

অর্থাভাব তারাপদের ইচ্ছাপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ালেও প্রেমের অভিব্যক্তিতে তার কোনো কার্পণ্য নেই। সে ধারণা করে, তার আর্থিক অসঙ্গতি পদ্মপুকুর পাড়ের শানুকে অস্বস্তি দিচ্ছে; বাড়তি মনোযোগের মাধ্যমে সেই অভাবটুকু ভরাট করে দিতে চায় সে।

গল্পের এক পর্যায়ে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে তারাপদ তার ঘর থেকে একজন পুরুষকে বেরিয়ে যেতে দেখলেও, তার স্ত্রীর ভাঙা খোঁপা ও খসে যাওয়া আঁচল তার দৃষ্টিগোচর হলেও, এসব ঘটনা তার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। তার সহজ হৃদয় স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ আস্থায় অবিচল থাকে। সেখানে কোনো পাপচিন্তার স্থান দিতে রাজি নয় তারাপদ। সে নিজের বোধ-বুদ্ধি দিয়ে যে শানুকে আবিষ্কার করেছে, মিথ্যে সন্দেহে তার সেই আবিষ্কারকে ধ্বংস করে দিতে চায় না। তার সেই শক্তি নেই, ইচ্ছাও নেই। লেখকও গল্পের শেষে এই রহস্যটুকু রেখে দিয়েছেন।

তারাপদ আমাদের সমাজের সেইসব চরিত্রের একজন যারা মূলত প্রেমিক কিন্তু ভীরু। স্ত্রীর প্রতি তাদের পূর্ণ প্রেম অটল, কিন্তু স্ত্রীকে পেতে কোনো ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয়নি তাকে। ভালোবাসার মানুষকে পেতে এরা কোনো অসাধ্য সাধনে বদ্ধপরিকর থাকে না, আবার ভালোবাসার মানুষকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে এরা তাদের (ভালোবাসার মানুষের) স্বেচ্ছাচারিতাকেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যায়। নিজের তুলনায় অতিযোগ্য স্ত্রী পাওয়ার আনন্দে এরা তৃপ্ত থাকে, আবার অবচেতনে হীনম্মন্যতা সুপ্ত থাকে বলে স্ত্রীর অসংলগ্ন আচরণ ও কথাবার্তাতেও সন্দিহান হয় না; বরং আত্মপ্রেমে মগ্ন থেকে সুখ পায়। মূলত অধিকতর যোগ্য স্ত্রী, যে তার প্রাপ্য ছিল না, সেই স্ত্রী তার সেবাতেই নিয়োজিত – এই আনন্দটুকুই এরা প্রাণভরে আস্বাদন করে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে তারাপদের এই আত্মতৃপ্তির কথা গল্পের শেষে পাঠককে জানানোর মাধ্যমে লেখক এও প্রকাশ করেন যে, স্ত্রীর চরিত্র সম্পর্কে তারাপদ সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল :

> তুমি অন্যরকম। মনে মনে হাসল তারাপদ, আর মনে মনে বন্ধুদের সে ডেকে বলল, অন্য মেয়েদের মতো স্বামীর ঘর ছেড়ে শানু পদ্মপুকুর রোডে ফিরে গেছে কি। সোনার পদ্মপুকুর রোড ধরে রেখেছে এই মেয়ে এখানেই, এই ঘরে, তারাপদর ছোট স্যাঁতসেঁতে বারান্দায়। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শালিক কি চড়ুই', ২০১৫ক : ৭৪)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চামচ' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পে আকাঙ্ক্ষাহীন প্রেমের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রকাশ গল্পের চরিত্র চিত্রার অধ্যাপক স্বামীর জন্য নয়, বরং প্রতিদিন সাইকেল চালিয়ে ফুল বিক্রি করতে আসা যুবকের জন্য। এটুকু জটিলতাকে উপেক্ষা করা গেলে তার এই প্লেটোনিক প্রেমের সপক্ষে চিত্রার ভাবনার নির্যাসটুকু আত্মস্থ করা সহজ হয়ে ওঠে। স্বামীর মনোযোগহীনতার কারণে একাকিত্বে ভোগা চিত্রা তার সময়টুকুকে ভালোভাবে যাপন করতে ফুলওয়ালার সঙ্গ উপভোগ করে। এর

মধ্যে সেই অর্থে পার্থিব প্রেম নেই, কিন্তু প্রেমের ফ্যান্টাসি আছে; তাই ফুল বিক্রেতা প্রতিদিন ফুল বিক্রি করতে এসে ধূমপান করে বলে সে বালিশের তলায় দেশলাই মজুত রাখে। প্রতিদিন যুবকটির দেখা পেতে একটি করে চামচ কেনে। সে বলে – 'একদিনে যদি দুটো রেখে দিই তো কাল রাখবো কী?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চামচ', ২০১৫ক : ১৪৫)। এ গল্পটির সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রের 'গিরগিটি' (১৯৫৬) কিংবা 'পতঙ্গ' (১৯৬১) গল্পের কাঠামোগত সাদৃশ্য রয়েছে। তবে 'গিরগিটি' ও 'পতঙ্গ' গল্পের মায়া ও রূপার তুলনায় চিত্রার সংযত উপস্থিতি গল্পটির গতিপথকে আলাদা করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সহজ প্রেমের নিটোল গল্পগুলোর মধ্যে 'ফুল ফোটার দিন' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১) অন্যতম। গল্পটিতে প্রেমের একটি ভিন্ন অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে প্রেমাস্পদের প্রতারণার শাস্তিস্বরূপ নয়না নামের সুন্দরী তরুণীটি আত্মহত্যা করে। অথচ নয়নার প্রেমিক শোভনের বন্ধু সোমেনকে নয়না প্রশ্রয় দিচ্ছিল, যা শোভনের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে এবং এই ঘটনার উপর ভিত্তি করেই গল্পের মূল পর্বের সূত্রপাত। পরবর্তীকালে এই সন্দেহই শোভনকে নয়না থেকে দূরে চলে যেতে বাধ্য করে এবং অতি দ্রুত অন্য এক নারীর প্রতি প্রেম ও কামাসক্ত করে তোলে, এবং এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নয়না আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তার ঠিক পূর্বমুহূর্তে শোভনের কথার উত্তরে সে জানায় :

> – কেন, তোমার বুকে এটা বসাব কেন, তোমার বুক ছুঁয়ে আমি হাত নোংরা করব কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর জায়গা, অনেক বেশি পবিত্র বুক আছে এটা বেরুনোর এটা সেঁধোবার . . . (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ফুল ফোটার দিন', ১৯৯১ : ২০৯)

নয়নার কথাগুলো আবেগমথিত হলেও সত্য। নয়না তার প্রেমকে প্রতারণায় কলুষিত করে তোলেনি; প্রেমিকের প্রতারণার উত্তর দিয়েছে সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। যদিও সে নিজেও অন্য পুরুষকে প্রশ্রয় দিয়েছে তারুণ্যের সহজাত উচ্ছ্বাসে। কিন্তু যখনই অনেকটা একইরকম ঘটনা প্রেমিকের জীবনেও ঘটেছে, তখন সে তা মেনে নিতে পারেনি। তারুণ্যের স্বাভাবিক প্রণোদনা থেকে নয়না ও শোভনের মধ্যে ভালোবাসা ও অভিমানের ফলে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয়েছে তা দুজনের মধ্যেই চিত্তচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রেমিকের প্রতি অভিমানবশত এবং প্রেমের পবিত্রতা রক্ষায় নয়না যে পথ বেছে নিয়েছে, তা তাদের কারো জন্যই শুভ হয়নি। পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতা ও আত্মধ্বংস প্রমাণ করে যে, দুজনের আচরণই অস্বাভাবিক, যার কোনো প্রকাশ্য প্রমাণ তাদেরকে স্বভাববিরুদ্ধ করে তোলেনি হয়তো। তবে তাদের নানা আচরণ বিশ্লেষণ করলে সেখানে অস্বাভাবিকতার বিভিন্ন আলামত ধরা পড়ে। প্রেমিকের বন্ধুকে প্রশ্রয় দেওয়া, সন্দেহের বশে শোভনের হঠাৎ-দেখা তরুণীর সঙ্গে মুহূর্তেই ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং

প্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতায় নিজেকে হনন করা – প্রতিটি ঘটনাই অস্বাভাবিক। গল্পের তৃতীয় চরিত্র সোমেনও অস্বাভাবিক ও উদ্দেশ্যপ্রবণ। দুর্বল মুহূর্তে বন্ধুর প্রেমিকাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর হুমকি মোকাবেলায় সঙ্গে ছুরি নিয়ে ঘোরা, এমনকি প্রয়োজনের সময় নয়নার হাতে ছুরি তুলে দেওয়া থেকে প্রমাণিত হয় – নয়নার প্রতি তার অপ্রকাশিত আকাঙ্ক্ষা তাকে ভিতরে ভিতরে বেপরোয়া করে তুলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘অজগর’ (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প* ১৯৭৬) গল্পেও মুহূর্তের জন্য চরিত্রের যৌনাকাঙ্ক্ষার দূরবর্তী ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। সুদর্শন যুবক হঠাৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যুভয়জনিত অসহায়তা গ্রাস করে তাকে। দৈব দুর্বিপাকের শিকার হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী বরেন চিন্তার ছকে আঁটা পৃথিবীকে ভোগ করতে না পারার পুঞ্জীভূত আক্ষেপে নিজের প্রেমাস্পদের নিরাবরণ শরীরকে কল্পনায় সঙ্গী করে। আত্মহত্যার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বরেনের মানসিক অবস্থা লেখকের বর্ণনায় পড়া যাক :

> কাগজ পেন্সিল দিয়ে ন্যাকড়া জড়ানো ঘায়ের হাতে মঞ্জুকে সে আঁকল। কেবল মুখ নয়। সম্পূর্ণ অবয়ব।
>
> ঘরের আলো নিভিয়ে দিল। এসো আজ একসঙ্গে দুজন ঘুমাবো। এত এত ঘুমের বড়ি এনেছে উপীন। রাংতা মোড়া ট্যাবলেট-এর পাতা, কাচের গেলাস ও মঞ্জুকে নিয়ে সে বাথরুমে ঢুকল। আলো জ্বালল। জামাকাপড় খুলে ফেলে উলঙ্গ হল। মঞ্জুকে এভাবে এঁকেছে। স্তন যোনী নিতম্ব ঊরু। তা না হলে ঘুমিয়ে সুখ! (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘অজগর’, ১৯৭৬ : ৩০৭)

এই গল্পের আর কোথাও বরেনের প্রকৃত বা বিকৃত কামনার কোনো পূর্বাভাসই লেখক দেননি। মঞ্জুর প্রতি বরেনের প্রেমের সাবলীল বহিঃপ্রকাশে কোনো অবদমিত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশও ঘটানটি। বরং তারুণ্য-উচ্ছল জীবনের আকস্মিক পরিসমাপ্তি টেনে পাঠককে তিনি আর্দ্র করে তুলেছেন বরেনের প্রতি। ফলে উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলোয় বরেনের যৌনবাসনা প্রকাশ পেলেও একে বিকার হিসেবে অভিহিত করলে তা চরিত্রটির প্রতি অবিচার হবে। প্রেমিকাকে অন্তত একবার সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা থেকে এই কামনার সৃষ্টি; প্রেমেরই তীব্র প্রকাশ হিসেবে তা ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই জ্যোতিরিন্দ্র সার্থক শিল্পীর সংকেত রেখে গেছেন। আকাঙ্ক্ষার বহুবিধ রূপ ও প্রকাশ থেকে বিকারকে সম্পূর্ণ আলাদা মানদণ্ডে চিহ্নিত করায় গল্পটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু কিছু গল্প ও উপন্যাসের চরম বিন্দুতে হত্যা কিংবা আত্মহত্যার ঘটনার পুনরাবৃত্তি প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> 'সূর্যমুখী'র উপসংহার আমাদের মনে পড়বে। 'মীরার দুপুর'এর শেষে হীরেনের আত্মহত্যা কিংবা 'রাবণবধ' নীহারের হত্যা এর দৃষ্টান্ত। 'পতঙ্গ' আর 'শয়তান' গল্পের অন্তিম হত্যা কিংবা 'ফুল ফোটার দিন' গল্পের অন্তিম আত্মহত্যাও এই পর্যায়ে পড়বে। (তপোব্রত ঘোষ ১৪১৭ ব. : ১২২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরো কিছু গল্প রয়েছে যেখানে চরিত্রের মনস্তত্ত্বে প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক সমন্বয়ে গল্পের কাহিনি গতি লাভ করেছে। 'চার ইয়ার' (*চার ইয়ার* ১৯৫৫), 'কতক্ষণ' (*ট্যাক্সিওয়ালা* ১৯৫৬), 'প্রতিনিধি' (*পতঙ্গ* ১৯৫৭), 'সন্দেশ' (*বনানীর প্রেম* ১৯৫৭), 'নীল পেয়ালা' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১) ইত্যাদি গল্পে প্রেমকে উপজীব্য করে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। এসব গল্পে যৌনতার উপস্থিতি সীমিত, অনুল্লেখ্য; তবে এই দুইয়ের অভিঘাতের উপর ভর করে গল্পের কাহিনি পরিণতি পেয়েছে। এ গল্পগুলোর বেশিরভাগই জ্যোতিরিন্দ্রের লেখক জীবনের প্রথম পর্যায়ে রচিত। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রেমের গল্পগুলোতে প্রেমের পাশাপাশি যৌনতাকে আরো অবাধভাবে আশ্রয় করেছেন। তাঁর কিছু শিল্পসফল গল্প আছে যেখানে প্রেমকে ছাপিয়ে যৌনতা মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে, গল্পের শোভাবর্ধক হয়ে উঠেছে। আবার কখনো কখনো তাঁর গল্পে প্রেম ও যৌনতা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। লেখকের তেমনই একটি গল্প 'নিঃশব্দ নায়ক' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১)।

'নিঃশব্দ নায়ক' গল্পটি অন্ধ সুহাসিনীর একপাক্ষিক নীরব প্রেমের আখ্যান। প্রতিবেশী বস্তির যুবক যুগলের প্রতি তার প্রেম যুগলের বিয়ের পরেও এতটুকু হ্রাস পায়নি। পুরো গল্প জুড়ে যুগলের প্রতি তার কাতরতা গল্পের শেষে এসে পরিণত হয় কামতাড়নায়। যে যুগল বর্তমানে সুহাসিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন, সেই যুগলই সুহাসিনীর গৃহে প্রবেশ করেছে, এই ভেবে সুহাসিনী আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে। লেখক গল্পের শুরু থেকে প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত সুহাসিনীর ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে প্রখর করে তুলে, গল্পের শেষে সেটিকে ভোঁতা করে দেন গল্পের পরিণতির খাতিরেই। কেননা লক্ষ করা গেছে, সুহাসিনী এতদিন বস্তির কোন ঘরে কী খাবার ঢুকছে সেটি তার ঘরে বসে কেবল গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারত, তাই যুগলের শরীরের গন্ধও তার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু গল্পের শেষে জ্যোতিরিন্দ্র সুহাসিনীর নাককে অকেজো করে দেন যুগলের স্থলে ভোম্বলদের ঘেয়ো কুকুরকে বসাবেন বলে। ইলিশের লোভে সেদিন সুহাসিনীর ঘরে কুকুরটির অনুপ্রবেশ ঘটে, যাকে সুহাসিনী যুগল ভেবে চুমু খেতে থাকে।

এই গল্পে প্রেম আছে এবং প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবেই যৌনতা এসেছে। যদিও সেটি একতরফা এবং অন্ধ সুহাসিনীর একাকিত্বের কারণে একে বিকার বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের তথা প্রাণীর জৈবিক তাড়নার দিক থেকে বিবেচনা করলে এটাই স্বাভাবিক। গল্পের রসায়নকে তুঙ্গস্পর্শী

করতে এখানে ঘেয়ো কুকুরের নাটকীয়তাটুকু যুক্ত হয়েছে মাত্র। সুহাসিনীর চোখের আলো নিভে গেলেও নির্জ্ঞানে সুপ্ত থাকা সেই আলো পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় অন্ধকারের রূপ ধরে, খাপছাড়াভাবে। যুগলের প্রতি মোহাবিষ্ট স্মৃতি তাকে ব্যথিত করে, ছদ্ম-বাস্তবতা তৈরি করে। তাই সুহাসিনীর দুর্দশাপীড়িত অন্ধ জীবনে প্রেমের আবহ নিয়ে যুগল নয়, যুগলের রূপ ধরে ঘেয়ো কুকুর তার বুকে এসে ধরা দেয় মন্দভাগ্যের স্মারক হিসেবে।

প্রেম ও যৌনতার আরেকটি অবিচ্ছেদ্য যুগলবন্দি 'রজনীগন্ধা গানে' গল্পটি। এখানেও অবশ্য প্রেমের তুলনায় যৌনতার প্রকাশ অনেকটা সীমিত, তবে প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতে যৌনতার উপস্থিতি অগ্রাহ্য করার মতোও নয়; বিশেষত যখন গল্পের তিনটি চরিত্র রেবা, ছন্দা ও কথক তরুণীটি সদ্য-বিপত্নীক সুকোমল রায়ের ছবির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে :

> বলতে কি, আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে কামনার সাপ কিলবিল ক'রে বেরিয়ে এসে সেই ফটোর উপর যেন ছোবল মারছিল। আমরা এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুখনলাল একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমাদের কাণ্ড দেখছিল। যখন সেদিকে চোখ পড়ল, মনে হল, একটা কুকুর লুব্ধ চোখ মেলে আমাদের খাওয়া দেখছে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রজনীগন্ধা গানে', ২০১৫ক : ৩৯৬)

সেই অর্থে প্রেমও তেমন জোরালোভাবে প্রকাশিত হয়নি গল্পটিতে, বরং প্রেমের আকাঙ্ক্ষা থেকে গল্পের আবহ গড়ে উঠেছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে নিদারুণ সত্যের আকস্মিক আঘাতে। গল্পের শেষ পর্যায়ে গিয়ে তারা জানতে পারে, সুকোমল রায় এই সদ্যযৌবনা তিন তরুণীর প্রেমের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত এবং দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহী না হয়ে তিনি তখনও বিগত পত্নীর প্রেমে বিভোর হয়ে রয়েছেন।

বয়সের এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে পৌঁছানোর সময় মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে কৈশোর থেকে তারুণ্যে উত্তরণের সময় এই পরিবর্তন শরীরে-মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারলে হিতে বিপরীত হতে পারে। 'রজনীগন্ধা গানে' গল্পে তিন তরুণীর জীবনে তা-ই ঘটেছে। গল্পটিতে বিষয়বস্তু ও ঘটনাক্রমের বেশ কয়েকটি স্তর রয়েছে। পরিবেশ ও পরিবারের সম্মতিতে সদ্যযৌবনা তরুণীদের মধ্যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমকে কেন্দ্র করে কামনার উদ্রেক ঘটা তার মধ্যে অন্যতম। অপমান ও ব্যর্থতার মধ্যেই এর সমাপ্তি ঘটা স্বাভাবিক, যা গল্পটিতে প্রতিভাত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প ‘গন্ধ’ (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড* ১৯৮২)। গল্পটিতে সমাজ-নিষিদ্ধ সম্পর্কের রূপায়ণ ঘটেছে, গন্ধের সুকৌশলী প্রয়োগে যা অতীন্দ্রিয় রূপ লাভ করেছে। রেল কোম্পানির কর্মচারী নিশীথ আর গ্রাম্যবধূর প্রেমকে উপজীব্য করে প্রেম, বিরহ আর যৌনকাতরতার মেলবন্ধনে রচিত গল্পটিতে গন্ধ এক ভিন্ন মাত্রা যোজনা করে। মাত্র অল্প ক'দিনের পরিচয়ে গ্রাম্যবধূটি নিশীথের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘর ছাড়তেও রাজি। কিন্তু সন্তানের প্রতি মায়া তার পিছুটান হয়ে দাঁড়ায়, সে সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে – ‘এক মন বলে সব ছেড়েছুড়ে চলে আসি – আর এক মন যে মানা করে। মন ঠিক করতে পারছি না’ (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘গন্ধ’, ১৯৮২ : ১৯৩)। অথচ নিশীথ তখনও জানত না যে, মেয়েটির সন্তান আছে। নিশীথ ওই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে শুনে মেয়েটি অস্থির হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নিশীথ কেবল দেহসর্বস্ব এক পুরুষ – চলে যাওয়ার আগে একবার সুযোগ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তার প্ররোচনায় মেয়েটি তাকে আড়ালে ডেকে নেয়। মেয়েটির বুকে হাত দিলে মাতৃদুগ্ধে নিশীথের হাত ভিজে যায়। বধূটির বাচ্চা আছে জেনে সে উদ্যম হারিয়ে ফেলে। তার মধ্যে ম্রিয়মাণ প্রেমটুকু আর জাগে না, সম্ভোগলিপ্সাও উবে যায়। সে কেবল হাতে লেগে থাকা মায়ের দুধের গন্ধে, তার চটচটে আঠায় শিশুটির মুখের লালার গন্ধ পায়, তার মুখ দেখতে পায়। গল্পটিতে যৌনতার অনুপুঙ্খের বর্ণনা নেই, অথচ চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সংকটে প্রেম ও যৌনতার দৃঢ় অবস্থান চিত্রিত হয়েছে। কামহীন প্রেমে নিশীথের নিরাসক্তি আর কোলের শিশুকে ফেলে নিশীথের সঙ্গে পালিয়ে যেতে বধূটির সিদ্ধান্তহীনতার বিষয়গুলো এমন কৌশলে লেখক গল্পটিকে গেঁথেছেন, বিরহ এখানে গল্পের মাছরাঙাটির মতো রহস্যময় সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে কামনার বশবর্তী হয়ে ব্লাউজের বোতাম খোলা এবং বুকে হাত দেওয়ার বর্ণনা আছে; কিন্তু তা অশ্লীলতায় পর্যবসিত হয়নি। মাতৃদুগ্ধ ও শিশুর মুখের লালার গন্ধকে গল্পকার এই বর্ণনার সঙ্গে এমনভাবে গ্রথিত করে দেন যে, সহজ-সরল প্রেম ও লিবিডোতাড়িত যৌনতাকে ছাপিয়ে ভিন্ন এক দ্যোতনার সৃষ্টি করে এই গন্ধ।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘পণ্য’ (*অনুষ্টুপ* ১৪১৬ ব.) গল্পে সর্বাংশে প্রেম ও যৎকিঞ্চিৎ যৌনতার আবহে মানব-মনের জটিল মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপন করা হয়েছে। মনস্তত্ত্বের অনেকগুলো স্তরকে একইসঙ্গে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে গল্পটি। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মন কীভাবে পরিচালিত হতে পারে, তাতে কেমন মুহুর্মুহু পরিবর্তন আসতে পারে – তা যেন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চিত্রায়িত করেছেন।

কাজের অভাবে দুর্ভিক্ষের বাজারে আনোয়ার নামে একজন ঘাটমজুর স্ত্রী-সন্তান নিয়ে দারুণ দুর্বিপাকে পড়ে গল্পের শুরুতে। কিন্তু এই অবস্থাতেই সে রোজগারের একমাত্র কপর্দকটি সদ্যমৃত বন্ধুর বিধবা স্ত্রীকে দিতে চায়। দুর্মূল্যের এই বাজারে এই মানবিক আচরণ অস্বাভাবিক হয়তো নয়, কিন্তু

ইঙ্গিতবহ। তার পরিণামে কিংবা মদ্যপ বন্ধুর সঙ্গে সাংসারিক অতৃপ্তির আক্ষেপ থেকে বন্ধুপত্নী রেবতী পুনরায় সংসার সাজাতে আনোয়ারকে শরীরের প্রলোভন দেখিয়ে বশ করতে চায়। একদিকে নিজের স্ত্রী-সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে সুন্দরী রেবতীর মোহময় আহ্বান আনোয়ারকে দ্বিধান্বিত করে তুললেও শেষ পর্যন্ত বাস্তবতার নিরিখে দক্ষ সমন্বয়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় সে। রেবতীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে সে অর্থের বিনিময়ে ঘাটের মহাজন ভুবন পোদ্দারের হাতে তুলে দেয়। গল্পের শেষটুকু খানিক রহস্যে ঢেকে রেখে লেখক অবশ্য পাঠকের ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন – 'ইচ্ছা করে রেবতী কাঁদেনি নাকি আপত্তি করেনি নতুন বাবু পেয়েছে বলে, নাকি ভুবন পোদ্দারই ওর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছিল?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পণ্য', ১৪১৬ ব. : ২৯)। অথচ পালিয়ে যাওয়ার সময় রেবতী বলেছিল – 'দেখ যদি কোনওদিন ছাড়বার ইচ্ছা মনে জাগে, ভাব রেবতীরে দিয়া আর সুখ পাই না, মুখে একবার কইবা। বিশ্বাস ভাইঙ্গ না' ('পণ্য', ১৪১৬ ব. : ২৮)।

এই গল্পে আনোয়ার পরিস্থিতির শিকার। সম্ভবত রেবতীও। আর তাই হয়তো তাকে ভুবনের রক্ষিতা হয়ে নৌকায় উঠে পড়তে হয়। তবে লেখকের মুনশিয়ানার শেষ প্রকাশটুকু তখনও বাকি ছিল। রেবতীর বাড়ির কাঁসার গ্লাস আর পাথরের বাটি না নিয়ে তার ঘরে তালা দিয়ে চাবিটা পানিতে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে আনোয়ার চরিত্রটির নিগূঢ় মনস্তত্ত্বও জ্যোতিরিন্দ্র উন্মোচন করে দেন পাঠকের সামনে। প্রেম ও যৌনতার উপর ভর করেই গল্পটির পরিণতি নির্ধারিত হয়েছে। আবার আনোয়ার ও রেবতীর মনস্তত্ত্ব নির্ধারণ ও প্রকাশ করার ক্ষেত্রে প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও যৌনকামনার ভূমিকাই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছিল। অথচ শেষ মুহূর্তে আনোয়ারের এমন কার্যকলাপে গল্পকার তার ভেতরের প্রেমের আবেগটুকু প্রকাশ করে দেন। যুদ্ধ-পরবর্তী বিরূপ বিধ্বস্ত সময়ে এই দুটি নিঃস্ব মানুষ একে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বাস্তবতা তাদের একত্রিত হতে দেয়নি; এই বাস্তবতাকে তারা মেনেও নিয়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রেম মাধুর্য হারায়নি। ভুবন পোদ্দার রেবতীর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়েছে কি দেয়নি, রেবতীর মন প্রসঙ্গে এই ফাঁকটুকু রাখলেও আনোয়ারের মানস পুরোটাই উন্মোচিত করেছেন লেখক, এই দুর্দিনেও রেবতীর ঘরের কাঁসার গ্লাস আর পাথরের বাটি বিক্রির অর্থের লোভ হতে তাকে বিরত রেখে। এ যেন রেবতীর প্রতি আনোয়ারের ভালোবাসার সর্বপ্রথম, সর্বশেষ এবং একমাত্র স্মারক।

প্রেম ও যৌনতার যুগলবন্দিত্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'চড়ুইভাতি', 'ক্যামাক স্ট্রিটে' (*চার ইয়ার* ১৯৫৫) সহ আরো কয়েকটি গল্পের কাহিনি সাজিয়েছেন। 'চড়ুইভাতি' গল্পে পাঠক মল্লিকা নামের এক তরুণীর সাক্ষাৎ পায়, যে প্রেম ও যৌনতা নিয়ে এক চরম মনস্তাত্ত্বিক সংকটে ভুগছে। সুপ্রতিষ্ঠিত বিত্তবান স্বামীর সংসার না করে সে দরিদ্র প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে হোটেলে ছুটে আসে। আবার পার্কে বিত্তশালী পরিচিতের দেখা পেয়ে তার সঙ্গে সময় কাটায় প্রেমিকের উপস্থিতিতেই, তাকে একা বসিয়ে

রেখে। পুরো গল্প জুড়ে মল্লিকা আদতে কী চায় তা বোঝা যায় না। তবে এটি স্পষ্ট হয় যে, অবচেতনে এক জটিল মানসিক সমস্যায় ভুগছে মল্লিকা। তার মতোই একই অবসাদে ভুগছে 'ক্যামাক স্ট্রিটে' গল্পের লাভলিও। সেও স্বামী-সন্তানের সংসার ছেড়ে বিত্তবান পরাশরের কাছে এসেছে ভালোবাসার স্বরূপ জানতে। তবু – 'পরম নির্ভাবনায় সবুজ রুমাল-গোঁজা অনিন্দ্যসুন্দর হাতটি গোলাপের বেড়ার দিকে আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিয়ে লাভলি চুপ থাকে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ক্যামাক স্ট্রিটে', ২০১৫ক : ২১৫)। পাশের বাগান থেকে নতুন প্রেমের আহ্বান পেয়েছে লাভলি।

প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক কিন্তু নিগূঢ় রসায়নে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি মননাশ্রয়ী গল্প পাঠককে আলোড়িত করে। তাঁর এই পর্বের কিছু রচনায় স্বাভাবিকভাবে নর-নারীর প্রণয়াকার্ষণের প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও তা তরল বা ভাবোচ্ছ্বাস-তাড়িত নয়। তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিজাত প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্বে নিবিড়ভাবে লীন হয়ে থাকে সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত জীবনানুভব। নারী-পুরুষের প্রেমের অনুভূতিজাত ও হৃদয়ঘটিত বিবিধ জটিলতাকে আশ্রয় করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রেম-কামনা-বিরহ-বেদনার কয়েকটি স্মরণীয় গল্প পাঠককে উপহার দিয়েছেন, যেখানে প্রেম ও যৌনতা সদর্থকভাবে গল্পের কাহিনির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কাহিনিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো মূলত লিবিডোতাড়িত যৌনতার নেতিবাচক প্রকাশ, যেখানে তা গল্পের প্রতি স্তরে চরিত্রগুলোর মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচনে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। চরিত্রদের যৌনবাসনা ও বিকৃতিকে উপজীব্য করে কিছু যৌনতা-আশ্রিত গল্প লিখলেও স্থূল মনোরঞ্জনের অশিল্পীসুলভ উদ্দেশ্য সেখানে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। যাপিত জীবনের প্রয়োজন এবং পাশবিক মনোবিকার – উভয় রূপে যৌনতা তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে সত্যি, কিন্তু কোথাও তা অশ্লীলতার দিকে মোড় নেয়নি। সস্তা প্রেমের কাহিনি বলা কিংবা ইন্দ্রিয়ঘন বর্ণনা দেওয়া জ্যোতিরিন্দ্রের শিল্পীসত্তা-বিরুদ্ধ, তবুও তাঁর রচনা সম্পর্কে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল একসময়, যার বিরোধিতা করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন :

> আমার মতে তাঁর লেখাতে বিন্দুমাত্র অশ্লীলতা নেই। কেননা, তিনি কখনও সম্ভোগ বা শৃঙ্গার উল্লাসের কথা লেখেন না। তাঁর বিষয় সৌন্দর্য দর্শন। আর এটা তো আমরা সবাই জানি যে সম্পূর্ণতা ছাড়া সৌন্দর্যের কোনো মানেই হয় না। (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪২৩ ব. : ৩২)

তাঁর যেসব গল্পে চরিত্রের তীব্র মনোবিকার কাহিনিতে স্থান পায় সেখানেও উদ্দীপনামূলক বিপরীতমুখী শাখাগল্পের উপস্থিতি মূল কাহিনির ভারসাম্য রক্ষা করে। কিংবা সেই মনোবিকারের অন্ধকারে জুতসই প্রতিফলক বসিয়ে মনোবিকারের কারণ খুঁজে আনেন তিনি। 'লিবিডোতাড়িত যৌনবিকার' পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করলে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

লিবিডোতাড়িত যৌনবিকার

সমাজের খর দৃষ্টির আড়ালে বাঙালির জীবনে যুগ যুগ ধরে নারী-পুরুষের যৌনতা চর্চিত হয়ে এসেছে। যুগান্তরের বাংলা সাহিত্যেও তার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান। কখনো তা প্রচ্ছন্নভাবে এসেছে, কখনো সরাসরি। আবার কখনো অশ্লীলতার দোষে দুষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় যৌনতাকে সস্তা প্রেমের আবরণে মুড়িয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন কবি-সাহিত্যিকেরা। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী স্পষ্টবাদী লেখক। চরিত্রের প্রেম, যৌনতা, সর্বোপরি জীবনকে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে নিজের ভাবনা, অনুভূতি ও বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম আর সাবলীল প্রকাশে আপস করেননি কখনো। অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েও বিচলিত হননি তিনি। সমাজ, মানুষ ও জীবনকে তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন নিস্পৃহতা নিয়ে নিজে দেখেছেন, পাঠককেও ঠিক সেভাবে দেখাতে চেয়েছেন। যৌনতা মানুষের জীবনের স্বাভাবিক এক অধ্যায়। একে উপেক্ষা করে সাহিত্যে মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন করতে গেলে কিংবা নারী-পুরুষের মনস্তত্ত্ব নির্ণয় করতে গেলে তা পরিপূর্ণতা পাবে না। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নিজের মতও তা-ই। তাঁর সাহিত্যে যৌনতার রূপায়ণ সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেন :

> জ্যোতিরিন্দ্র বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনের সঙ্গে যৌন চেতনা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। মানুষের মধ্যে যখন শিক্ষার অভাব ঘটে তখনই যৌন চেতনা রুচি বিকারে পরিণত হয়। তাঁর লেখায় যৌনতা এসেছে জীবনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হিসাবে। আসলে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমাদেরই আশে-পাশে ঘুরে বেড়ানো চরিত্রগুলো তাঁর গল্পে উপন্যাসে ভিড় করেছে। মানুষের বিচিত্র জীবন চর্চায় যৌনতা গভীর গোপনীয়তায় আসে – জীবনকে পূর্ণতা দিতে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যৌনতা অর্থে জীবনের পূর্ণতা বা পূর্ণ সৌন্দর্যের আলোকে জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। (দেবশ্রী মণ্ডল ২০১৭ : ১৩৮)

আবার মানুষের যৌন মনস্তত্ত্বের যে অজানা রহস্যকে ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র তার বিচিত্র প্রকাশ দেখিয়েছেন তাঁর কিছু গল্পে। অবচেতনের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তি, তার দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা এবং তার অভিশপ্ত শক্তি, যা নর-নারীকে তাড়িত করে অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিতে, তাকে নিয়োজিত করে অন্ধকারের অতলে, সেই দেহজ কামনা-বাসনা-নির্ভর চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে তাঁর এই পর্বের গল্পে।

লক্ষ করার মতো বিষয়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতা প্রসঙ্গে নারীর একটা সাহসী প্রকাশভঙ্গি রয়েছে। নারীবাদী ভাবনার অভিঘাতে এদের আবির্ভাব হয়নি। সাবলম্বিতা অর্জনে এরা তেমন মনোযোগী নয়, বরং বলা চলে এদের কেউ কেউ প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংসারী। কিন্তু এদের স্বাতন্ত্র্য এদের

স্বেচ্ছানুবর্তিতায়, বিশেষত যৌন স্বেচ্ছাচারিতায়; যদিও সবসময় সেটি মনোবিকার হিসেবে উপস্থাপিত নয়। অবদমিত জীবনের ব্যর্থতা কিংবা অবসাদ ও ক্লান্তি মোচনে এই যৌনতা কখনো কখনো আত্ম-আবিষ্কারের উপায়ও বটে। এদিক থেকে তাঁর গল্পে নারী জাগরণ প্রচলিত অর্থে নারীবাদ-প্রভাবিত নয়। ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের বিচারে এ জাগরণের মূলে রয়েছে তাদের জৈবিক চাহিদা। উদাহরণ হিসেবে 'পতঙ্গ', 'রূপকথার রাজা' (১৯৬১), 'রূপালী মাছ' (১৯৬৩) ও 'কালো বউদি' (১৯৯১) গল্পের উল্লেখ করা যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিছু গল্পে প্রেমের সূত্রে যৌনতা যেমন এসেছে, তেমনি বেশ কিছু গল্পে প্রেমহীন যৌনতা প্রয়োজনের তুলনায় মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রেম না থাকলেও সেখানে চরিত্রের আত্ম-আবিষ্কারের উদগ্র বাসনা রয়েছে, নিজের একাকিত্বকে ভরাট করার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, অন্যের উপেক্ষাকে উপেক্ষা দিয়েই প্রতিহত করার স্পর্ধা রয়েছে। আবার কখনো তা শুধুমাত্র জীবনের পাশবিক উদ্‌যাপনের হাতিয়ার হিসেবেই প্রকটিত হয়েছে। এসব দিক বিচার করে লিবিডোতাড়িত যৌনবিকারকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে – (ক) জৈবিক চাহিদাজনিত মনোবৈকল্য ও (খ) আত্ম-আবিষ্কারের উপায় হিসেবে যৌনতা।

জৈবিক চাহিদাজনিত মনোবৈকল্য

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর যেসব গল্পে জৈবিক চাহিদাজনিত মনোবৈকল্য দেখতে পাওয়া যায় সেখানে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব অনুযায়ী চরিত্রের আদিম প্রবৃত্তি অদস অহম ও অধিশাস্তার নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করেছে। এ সকল অপ্রতিরোধ্য চরিত্র নিজেদের অবদমিত কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নৈতিকতার যাবতীয় মানদণ্ডকে অস্বীকার করেছে। কেবল ইন্দ্রিয়সুখের জন্য তারা অন্যের জীবনে ও সমাজে এবং কখনো কখনো নিজেদের জীবনেও বিপর্যয় ডেকে এনেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রের কয়েকটি গল্পে শুধুমাত্র যৌনতাকে উদ্‌যাপন করতে মানুষ কীভাবে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। এই যৌনতায় প্রেমের কোনো ইন্ধন নেই, আত্ম-আবিষ্কারের কোনো তাগিদ নেই। কেবলমাত্র শরীরের চাহিদাকে উপলক্ষ্য করে পাশবিক উপায়ে যৌনতাকে আশ্রয় করাই এর মূল লক্ষ্য। কখনো অর্থের বিনিময়ে, কখনো লোভ দেখিয়ে, আবার কখনো সম-চাহিদাসম্পন্ন বিপরীত লিঙ্গের কাউকে খুঁজে বের করে, চরিত্রগুলো জৈবিক চাহিদা মেটায় বা মেটাবার ইচ্ছা পোষণ করে। 'কালো বউদি' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১) এমনই একটি গল্প।

'কালো বউদি' গল্পের মূল বিষয় শিবানন্দ নামের এক পুরুষের প্রতি হিমি ও নিমি নামে সদ্যযৌবনা দুই বোনের আগ্রহ ও পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। দুই বোনের এই প্রতিযোগিতায় হিমি তার

শারীরিক সৌন্দর্য ও অনাড়ষ্ট কামনা নিয়ে ছোট বোন নিমির তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে থাকে। বড় বোনের নিঃসংকোচ কাম-তাড়নাকে নিমির কাছে কদর্য মনে হয়, যদিও তারও আগ্রহ আছে সোমত্ত পুরুষের প্রতি। সেও শিবানন্দের মনোযোগ পেতে দু-একবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু হিমির মতো নির্লজ্জ আচরণ তার স্বভাবের পরিপন্থী। লেখকের বর্ণনায় হিমির স্বভাব গল্পে এভাবে পরিস্ফুট হয়েছে :

> সেজেগুজে সেও কি উঠানে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকত না? জোয়ান মানুষটার মন ভোলাতে চোখ টানতে কম চেষ্টা করল কি সে!
>
> পারল না। কিছুই হল না, হিমির কাছে হেরে গেল।
>
> দেড় আঙুলে রোগা পটকা শশীকে দেখে কোনোদিন তার মন ওঠেনি। কিন্তু শশীর পর যে এল, ছ ফুট লম্বা, এই পুষ্ট পায়ের গোছা, ঊরু ভর্তি কালো কালো লোম, শিবানন্দ না যোগানন্দ যেন নাম, আধপাগলা মানুষটা নিমির চোখে ধরেছিল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কালো বউদি', ১৯৯১ : ৪৩)

দিদির শারীরিক গঠন তার চেয়ে আকর্ষণীয় বলে সে পিছিয়ে পড়েছে এই প্রতিযোগিতায়। যৌন কামনাকে চরিতার্থ করতে তার দিদি শশীর মতো অনাকর্ষণীয় পুরুষের সঙ্গেও সম্পর্ক করতে পারে, যা নিমির রুচিবিরুদ্ধ। মনের মতো মানুষের অভাবে অন্তর্গত আগুনকে উস্কে দেওয়ার পক্ষে নয় নিমি, সুপ্তই রাখতে চায় একে। প্রেমহীন কাম নিমির কাছে মূল্যহীন ও কুৎসিত। সমাজের রক্তচক্ষুর আড়ালে হিমি নির্বিকারভাবে অনৈতিক কাণ্ড ঘটালেও নিমির সংস্কার তাকে এমন কিছু ভাবতেও বাধা দেয়। তাই নিজের মনকে প্রবোধ দিতে প্রেমটুকুকে পুঁজি করতে চায় সে।

এক পুরুষকে কেন্দ্র করে দুই বোনের প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত 'কালো বউদি' গল্পটি লেখকের বর্ণনার শৈলীতে বিশিষ্টতা পেয়েছে। গল্পের নিমি ফ্রয়েডীয় মতে কেবল অহম দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, অপরদিকে হিমিকে নিরস্ত করতে অহম আর অধিশাস্তা উভয়েই বিফল হয়েছে। শ্রীহীন যৌনতার অনুষঙ্গে হিমি জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের সাহসী ও বেপরোয়া নারীদের অন্যতম, যে নিয়ত লিবিডো দ্বারা তাড়িত এবং যৌনতার ক্ষেত্রে যার একরৈখিক চিন্তাভাবনা চরিত্রটিকে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই গল্পে চরিত্রের মনস্তত্ত্বে যৌনতা বেশ দৃঢ় আসন নিয়েছে। কিন্তু অবাধ যৌনতাকে আশ্রয় করে রগরগে কাহিনি-বর্ণনা যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অভীষ্ট নয় তা পাঠকমাত্রই বুঝতে পারে। বরং এই গল্পে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, পুরুষের শরীর-আকাঙ্ক্ষী দুটি সদ্যযৌবনা তরুণীর মনস্তত্ত্বকে তাদের কামনার রং দিয়ে সুচারুভাবে চিহ্নিত করেছেন লেখক। গল্পটির মধ্যে লিবিডোতাড়িত মনোবিকার প্রাধান্য পেলেও তা কদর্যতায় পর্যবসিত হয়নি। বরং গল্পের সকল অনুষঙ্গ মিলিয়ে এখানে যৌনতার নানা স্তর রূপায়িত হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখকের অনন্যতার দিকটি তুলে ধরে সমালোচক মন্তব্য করেন :

> তিনি ইন্দ্রিয় চেতনা এবং প্রকৃতি উত্থাপনের সঙ্গে যৌনতাকে, যৌন চেতনাকে যেভাবে জুড়ে একটা ভিন্ন স্বাদ রচনা করতে পারেন যা বাংলায় আর কারো লেখায় আমরা পাই না। (রবিন পাল ২০১২ : ৪০)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শয়তান' (*শ্বাপদ, শয়তান ও রূপালী মাছেরা* ১৩৭০ ব.) গল্পটি এদিক থেকে ভিন্ন। লিবিডোতাড়িত যৌনবিকারের স্পষ্ট উদাহরণ এই গল্প। অর্থ ও বৌদ্ধিক কৌশলের সমন্বিত প্রয়োগে সকল অসম্ভবকে সম্ভব করা যায় – এই চেতনায় বিশ্বাসী গল্পের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ চৌধুরী। মাংসলোলুপ বয়োবৃদ্ধ চৌধুরী এই গল্পের মূল চরিত্র, যাঁকে গল্পের শুরু থেকেই লেখক কদর্য রূপে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে :

> চুকচুক করে মাংসের ঝোলটুকু খাওয়া হয়। তাও সবটা না। ঝোল আর চাকা চাকা মাংস আর চর্বি মজ্জা সমেত চমৎকার হাড়ের টুকরোগুলি ডিশে পড়ে থাকে। কাতর ক্ষুণ্ন চোখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে চৌধুরী সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শয়তান', ১৯৮২ : ১৯৭)

লেখকের বর্ণনা থেকে গল্পের প্রথমেই একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় মাংসপ্রেমী চৌধুরী সাহেব সম্পর্কে, যিনি বয়সের কারণে মাংস খেতে না পারলেও মাংসের প্রতি তাঁর লোভ এতটুকু কমেনি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতার প্রতীক হিসেবে 'মাংস' ব্যবহৃত হয়েছে বেশ কয়েকবার। অচরিতার্থ কামনার রূপক হিসেবে পশুমাংসের প্রতি স্থূল আকর্ষণের প্রকাশ ঘটিয়ে প্রায়শই চরিত্রের নেতিবাচক মানস-গঠন সম্পর্কে পাঠককে প্রাথমিক ধারণা দিয়ে দেন লেখক। 'মঙ্গলগ্রহ', 'নায়ক-নায়িকা' (১৯৫৪), 'চড়ুইভাতি' গল্পে যার পরিচয় পাওয়া যায়। 'শয়তান' গল্পেও মাংস ভক্ষণের প্রতি চৌধুরীর অসংযমী আকাঙ্ক্ষা সেই নেতিবাচকতারই বহিঃপ্রকাশ।

গল্পের ক্রমবিকাশে কিছুক্ষণ পরই স্বরূপে আবির্ভূত হন চৌধুরী সাহেব। অগাধ সম্পদের মালিক চৌধুরী সাহেব যৌবন হারালেও মানসিক তারুণ্য হারাননি। আত্মার শান্তি খুঁজতে, মনকে তৃপ্ত করতে তিনি 'হলদে পাখি'র দেখা পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়েও কুণ্ঠাবোধ করেন না। অনেক খুঁজে ড্রাইভার বঙ্কু হলদে পাখি অর্থাৎ নারীর সন্ধান পায়, যে কিনা চৌধুরী সাহেবেরই ইটখোলার কর্মচারী মুকুন্দের স্ত্রী। যাকে চৌধুরী কখনো দেখেনইনি, কেবল নারীলিপ্সার কারণেই মুকুন্দের কাছে তার কথা শুনে চৌধুরী তাকে পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, উত্তরোত্তর টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে চলেন। বয়স আর নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে মাংস খেতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। লেখকের গদ্যশৈলীতে যা আরো ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে – 'গরহজমের কথা ভুলে গিয়ে, বাঁধানো দাঁতের কথা ভুলে গিয়ে আজ মাংস চিবোতে সাহেব উঠেপড়ে লেগেছেন' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শয়তান', ১৯৮২ : ২১৯)। একদিকে সাত্ত্বিক মুকুন্দরামের ধর্ম,

অন্যদিকে শয়তান চৌধুরীর লালসার ঠান্ডা লড়াই – এই নিয়ে গল্প এগিয়ে চলে। লড়াইয়ের শেষ অস্ত্র হিসেবে চৌধুরী ইটখোলা বন্ধ করে দেন কর্মহীন মুকুন্দের ধর্মের জোর কমানোর জন্য। মুকুন্দ পুকুরের শাপলা খেয়ে বেঁচে থাকে, তবুও অধর্মের কাছে আত্মসমর্পণ করবে না বলে বদ্ধপরিকর থাকে। মুকুন্দের এমন ভাবনা চৌধুরীকে মানসিকভাবে আরো শক্তিশালী তোলে – 'আমার শান্তির সঙ্গে আরেকজনের অশান্তির আগুন দাউদাউ করে জ্বলবে, সুখটা সেখানে বেশি, আত্মার তৃপ্তি তখন বেশি হবে' ('শয়তান', ১৯৮২ : ২১৯)। চৌধুরীর অসংযমী মানসিকতার কারণে মুকুন্দ এবং ইটখোলার আরো অনেকে চাকরি হারায়। চৌধুরী বঙ্কুকে দিয়ে তার স্বার্থসিদ্ধি হবে না আন্দাজ করে তাকেও চাকরিচ্যুত করে তার জায়গায় অন্য একজনকে নিযুক্ত করেন। অচরিতার্থ লালসাকে মাত্রা দিতে চৌধুরী তাঁর এতদিনের পুরোনো বিশ্বস্ত ড্রাইভারকে চাকরিচ্যুত করা থেকে শুরু করে, ইটখোলা বন্ধ করা, এবং আরেকজনকে এবার সরাসরি মুকুন্দের স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব নিয়ে পাঠানোর মতো ঘৃণ্য কাজ করতে থাকেন একে একে। অভাবের তাড়নায় এই অর্থের ফাঁদে পা দিতে গিয়ে স্বামীর হাতে জীবন হারাতে হয় মুকুন্দের স্ত্রীকে। চৌধুরী তখনও সম্ভবত তাঁর কারণে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হন না, আশাহত হন নিজের লালসা চরিতার্থের ব্যর্থতায়। অবশ্য এতদূর অবধি গল্পকার গল্প টানেন না। গল্পে বর্ণিত বাস্তবতার নিরিখে চৌধুরীর অন্তর্ভাবনাকে উপলব্ধি করার দায় পাঠকের উপর ন্যস্ত করেন তিনি।

যৌনতার অনুষঙ্গে চৌধুরী চরিত্রটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের অন্যতম বেপরোয়া পুরুষ, যার লিবিডো কদর্যভাবে তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ফ্রয়েডীয় মতানুসারে অপ্রতিরোধ্য চৌধুরীর জৈবিক প্রবৃত্তি অদস অহম আর অধিশাস্তার নিয়ম ও শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে একের পর এক অন্যায় করে গেছে; যার ফলে লোকটা ইটভাটা বন্ধ করে, ড্রাইভারকে চাকরিচ্যুত করে, এমনকি নিজের ক্রিয়াকলাপে মুকুন্দকে তার স্ত্রী-হত্যায় প্ররোচিত করে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে ক্রমাগত। এতগুলো অনভিপ্রেত ঘটনার পরেও নিজের লিবিডোর দুর্নিবার তাড়নায় মত্ত থেকেছে সে। গল্পটি আদ্যোপান্ত আবর্তিত হয়েছে বিকারগ্রস্ত চৌধুরীর সম্ভোগলিপ্সাকে কেন্দ্র করে। চরিত্রটির মানস উন্মোচনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে রূপকাশ্রিত ভাষার ব্যবহার করেছেন তা অব্যর্থ ও বিকল্পহীন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি বিকৃত যৌনতার গল্প 'রূপকথার রাজা' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১)। গল্প হিসেবে রসোত্তীর্ণ না হলেও গল্পটিতে বিত্তের ফাঁদে ফেলে কীভাবে নারীসঙ্গ উপভোগ করা যায়, পাশাপাশি বিত্ত কীভাবে নারীকে মোহগ্রস্ত করে তোলে, এবং যৌনতা কী করে মানুষের সামাজিক অবস্থান ও বয়সকে হার মানিয়ে তার নিজের অবস্থানকে অটুট রাখে, তারই ব্যতিক্রমী প্রকাশ লক্ষণীয়। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপা নামের এক তরুণী, যে এতদিন ধরে কলেজ-শিক্ষক সুব্রতের

সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল, কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব হলেও সুপুরুষ মোহনলালের বিত্ত-বৈভব আর মধুর কথার মায়াজালে আটকা পড়ে সে পূর্ববর্তী সম্পর্ক ছিন্ন না করেই মোহনলালের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়াতে চায়, তাকে বিয়ে করতে চায়। গল্পটিতে প্রেমের স্থান গৌণ, প্রেম এখানে শ্রীহীন হয়ে বিকৃত আকার নিয়েছে। যৌনতাও তার আদিম রূপে উপস্থিত। অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রের লেখনীর গুণে এই আদিমতা আঁচ করতে হলে গল্পের শেষ অবধি যেতে হবে। যৌনতা গল্পটির একটি শক্তিশালী উপাদান। কিন্তু কোনো ধরনের অশ্লীলতা ছাড়াই এই মাত্রাটি একেবারে গল্পের শেষে উন্মোচিত হয় আশ্রমের কর্মী কাজলের বয়ানে, রূপার মা হেমনলিনীর সিদ্ধান্তে।

গল্পটিতে যৌনতার অনুষঙ্গে অভূতপূর্ব এক চরিত্র মোহনলাল, যে কিনা পুরো গল্প জুড়ে নিজেকে মুড়ে রেখেছিল ভালোবাসার জাদুকরি মোড়কে; লেখক তার ভেতর আর বাইরের ফারাকটুকু পাঠককে বুঝতে দেননি। গল্পের শেষে এসে প্রকাশিত হয় – তার মায়াবী কথার ফাঁদে পড়ে রূপা, কাজল আর মালার মতো আরো অনেকেরই ইতঃপূর্বে আশ্রমে আগমন ঘটেছে। মোহনলালের স্ত্রী হয়ে আশ্রমের ভার গ্রহণ করার কথা থাকলেও তারা আজ অনেকেই আশ্রমের সামান্য কর্মী। তাদের কারো কারো গর্ভপাতও ঘটানো হয়েছে। মোহনলালের ছলচাতুরী মাখা কথা – 'আমার ইচ্ছে এই আশ্রমের ভার তুমি নিজের হাতে তুলে নাও' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রূপকথার রাজা', ১৯৯১ : ২৪১)। এই একই কথা মোহনলাল এদের সবাইকেই বলেছে এবং সম্ভবত রূপার মা হেমনলিনীকেও। সবকিছু জানার পর রূপা তার শিক্ষা ও বাস্তববুদ্ধি দিয়ে এই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারলেও কাজল কিংবা মালাদের মুক্তি নেই। আর হেমনলিনী সব বুঝেও এর থেকে মুক্তি পেতে চায় না।

রূপার মা হেমনলিনী এই গল্পের গৌণ চরিত্র হলেও এই চরিত্রটিকে লেখক শুরু থেকে শেষ অবধি অল্প রেখায় স্পষ্ট করেছেন। গল্পের এক সাহসী চরিত্র হেমনলিনী। হেম অকালবিধবা ও প্রৌঢ়, কিন্তু তারপরও মাছ-মাংস, স্নো-পাউডার, শাড়ি-গয়না এবং পুরুষের প্রতি আগ্রহে ঘাটতি নেই তার। হেম নিজেকে আবিষ্কারে এতটাই ব্যগ্র যে, মোহনলালের চরিত্রের কলুষতা সম্পর্কে জেনেও সে তাকে কাছে পেতে বদ্ধপরিকর। মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে তাই তাকে বলে – 'এই বয়সে এর চেয়ে ভালো আর কোথায় পাব!' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রূপকথার রাজা', ১৯৯১ : ২৫৬)। হেমনলিনী স্পষ্টত জীবনবাদী চরিত্র। দীর্ঘকাল ধরে সমাজ আর সংস্কারের ঘেরাটোপের আবদ্ধতাও তার মনের কামনাকে দমন করতে পারেনি। বরং সুযোগ পেয়েই তা আরো কুৎসিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে। গল্পটিতে অচরিতার্থ কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য চরিত্রের গতিবিধির শিল্পসমৃদ্ধ উপস্থাপন রয়েছে। বিশেষ কোনো বাঁকবদল বা বর্ণনাভঙ্গি না থাকলেও যাপিত জীবনের কদর্যতা ও তীব্র মনোবিকার ভিন্ন আবহ সৃষ্টি করেছে এই গল্পে।

মা ও মেয়েকে একইসঙ্গে ভোগ করার পরিকল্পনায় মোহনলাল নামক চরিত্রটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে লিবিডোতাড়িত যৌনবিকারের এক মূর্তিমান প্রকাশ।

জ্যোতিরিন্দ্রের কোনো কোনো গল্পে কখনো কখনো সামাজিকভাবে সম্মানহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনে আত্মবিস্মরণের জন্য যৌনতার অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটেছে। তেমনই একটি গল্প 'মঙ্গলগ্রহ'। এই গল্পে সরাসরি যৌনতা না থাকলেও কাহিনির ইঙ্গিতময়তা, চরিত্রের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি লিবিডোতাড়িত কথকের কাতরতা পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। যৌনতার বিচ্ছিন্ন ইঙ্গিত মানুষকে কীভাবে ব্যক্তিত্বহীন করে তোলে তারই শৈল্পিক প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় গল্পটিতে। গল্পের শুরুই হয় কথকের যৌনকাতরতার ইঙ্গিত দিয়ে :

> জানি না রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার আবছা মূর্তি ওর চোখে পড়েছিল কি-না, ঈশ্বর জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক খুললো।
>
> অবশ্য একটু পরেই আলো নিভলো। আমার দু-কান দিয়ে তখন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'মঙ্গলগ্রহ', ২০১৫ক : ১৭৯)

গল্পের কথক কুলদারঞ্জন পাইন পাশের ঘরে নতুন আসা বিত্তবান পরিবারটিকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে করা এই সহযোগিতার পেছনে নতুন ভাড়াটে গিন্নি লীলাময়ীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তার প্রতি, তার শরীরের প্রতি আকর্ষণের বশেই এমন উদার, পরার্থপর হয়ে ওঠে কুলদারঞ্জন। লীলাময়ীও কথকের উদারতা কলহাস্য ও লাস্য দিয়ে শোধ করতে চায়। এতে আরো উজ্জীবিত হয়ে ওঠে কুলদা। গল্পের প্রবাহে এক পর্যায়ে আবিষ্কৃত হয় – লীলাময়ীর লীলার ছলনায় বুঁদ হয়ে কুলদা নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে প্রায় গৃহভৃত্যের মতোই আচরণ করছে তার সঙ্গে। লীলাময়ীর জন্য বাজার থেকে মাছ-মাংস এনে দেওয়াই শুধু নয়, তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর জন্য রিকশা ডেকে দেওয়া থেকে শুরু করে সিগারেট এনে দেওয়ার ভারও পড়ে কুলদার উপর। সদ্যকাটা তাজা ইলিশের রক্ত মুছে দেওয়ার ছলে লীলাময়ী নিজের গাল ছুঁতে দিয়ে কুলদাকে যেন একেবারে সম্মোহিত করে ফেলে। তারই ধারাবাহিকতায় ঘরের ভেতর থেকে লীলাময়ীর ইঞ্জিনিয়ার স্বামী তাকে দিয়ে কাঠ কাটিয়ে নিতে বললে লীলাময়ী আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে স্বামীর জন্য সিগারেটও আনিয়ে নেওয়ার আশা ব্যক্ত করে। তাদের বাক্যালাপ শুনে প্রতিবেশীর লাল সিমেন্টের উপর চোখ আটকে রেখে কামনার

সম্মোহনে অসহায়ভাবে বাঁধা পড়া ছাড়া কুলদার আর কিছু করার থাকে না। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের পর্যবেক্ষণও প্রণিধানযোগ্য :

> ঘরে-বাইরে সর্বতোবিধ্বস্ত কুলদারঞ্জনের প্রতিবেশী হয়ে নতুন ফ্ল্যাটে এল নতুন দম্পতি। দেখা গেল, শাড়ি-গয়নার ঝলক। সাবান পাউডার দামি সিগারেটের গন্ধ, ঘি গরম মশলার মাংসের রসনালোভন সুবাস, লাল আলোয় উজ্জ্বলতা। বিধ্বস্ত কুলদারঞ্জনের চোখে স্বপ্ন মাখিয়ে দিল সেই ঘরের নারী, রূপসী যুবতী লীলাময়ীর ছলাকলায় বিভ্রান্ত প্রৌঢ় তার ক্রীতদাস হয়ে যায়। (নিতাই বসু ২০১৫খ : ১৮)

যৌনকাতর মনস্তত্ত্বের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ 'মঙ্গলগ্রহ'। বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ এই গল্পটিতে মধ্যবিত্তের যাপিত জীবনের অনেকগুলো ধাপ চিত্রিত হয়েছে, যার মধ্যে জৈবিক চাহিদা কীভাবে মানুষকে চেতনারহিত করে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে তা উল্লেখযোগ্য। লীলাময়ীর প্রতি কুলদারঞ্জনের এই যৌনকাতরতা যতটা ইন্দ্রিয় সুখানুভূতির জন্য, ততটাই তার আত্মবিস্মরণের জন্যও। গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে এটি উপলব্ধ হয় যে, নতুন প্রতিবেশী লীলাময়ীর লাস্যময় সাহচর্যে কুলদারঞ্জন বিস্মৃত হতে চেয়েছিল বাতের রোগে ক্লিষ্ট তার লুপ্তশ্রী মধ্যবয়সী স্ত্রীকে। লীলাময়ীদের 'মঙ্গলগ্রহের লাল আলো'রূপী গৃহের হ্যাজাক, সাজসজ্জার জাঁকজমকের চাকচিক্যে সে ভুলতে চেয়েছিল নিজের সংসারের দারিদ্র্যকে, কন্যাদায়গ্রস্ততাকে, ছেলের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারার ব্যর্থতাকে। কুলদারঞ্জন নিজেও জানে, এই বিস্মরণ সাময়িক এবং মাছের রক্ত মুছে দেওয়ার অজুহাতে ক্বচিৎ তাকে স্পর্শ করতে দেওয়ার সুযোগ দিলেও এর চেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়সুখ লীলাময়ীর কাছ থেকে তার পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু এই সামান্য প্রাপ্তিতেও কুলদারঞ্জন হতাশ নয়, আপাতত লীলাময়ীর সহাস্য উপস্থিতি এবং তার ভুবনমোহিনী ভঙ্গিই লোকটার গৌরবহীন কেরানি-জীবনের, সমস্যাসংকুল সামাজিক জীবনের ও সর্বোপরি হতশ্রী গার্হস্থ্য জীবনের পরম পাওয়া – 'সংসারের ভারে, খিন্ন জীবনের গ্লানিতে সে নুয়ে থাকে সবসময়। তখন আলোকিত মঙ্গলগ্রহের ভিতরেই সে প্রাণ খোঁজে' (অমর মিত্র ১৪১৬ ব. : ৫০২)।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে চিত্রিত এই মধ্যবিত্ত এবং তাদের অবদমিত যৌনতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবক্ষয়িত মূল্যবোধ ও অবদমিত যৌনতাকে মূর্ত করে তুলেছেন। . . . তিনি মধ্যবিত্তের আত্মিক সংকট ও তার পাশাপাশি অবদমিত যৌন তৃষ্ণাকে অবিকৃত করে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। (নীহার শুভ্র অধিকারী ২০১৮ : ২১৮)

চরিত্রের মানস-উন্মোচনের হাতিয়ার হিসেবে প্রেম, যৌনতা কিংবা যৌনবিকার স্থান পেয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বেশ কিছু গল্পে। এমনকি তাঁর ভিন্নধর্মী আঙ্গিকের ‘আরসোলা’ (১৯৮০) গল্পেও প্রেম, যৌনতা ও বিকারের একটি পরাবাস্তব রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শরীরে-মনে বসন্ত উদ্‌যাপন করতে গিয়ে অসংখ্য আরশোলার আক্রমণের শিকার হয় এক প্রেমিক-যুগল। লেখক গল্পের কোথাও এই যুগলের পরস্পরিক সম্পর্ক উল্লেখ করেননি। তারা দম্পতিও হতে পারে, কিংবা তারা হয়তো শুধুই প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ, যারা দুই মাসের জন্য এ সম্পর্ককে উপভোগ করতে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু শুভ্রা নামের মেয়েটির শরীর বেয়ে অজস্র তেলাপোকা উঠতে থাকলে তাদের সম্পর্কের দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে পুরুষটি শুভ্রাকে সন্দেহ করে – শুভ্রা তার শরীরের মধ্যে সব তেলাপোকা লুকিয়ে রেখেছে কি না। সে শুভ্রার বুকের উপর কান পেতে আরশোলার ফড়ফড় শব্দ শুনতে চায়, তার ব্লাউজ টেনে ধরে। যেন অযুত আরশোলার আবাসভূমি শুভ্রার শরীর; অশুদ্ধতার, অন্ধকারের প্রতীক হয়ে এই শরীরে তারা আত্মগোপন করেছে।

গল্পের প্রথম পর্যায়ে পুরুষ চরিত্রটিকে প্রথম পুরুষে বর্ণনা করলেও শেষে এসে চরিত্রটি তৃতীয় পুরুষে রূপ নেয়। আকস্মিকভাবে মনে হতে পারে সেখানে তৃতীয় কোনো পুরুষের উপস্থিতি রয়েছে। চরিত্রের এমন বর্ণনা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে বিরল নয়। ‘আমি, তুমি ও সে’-এর এই অভিনব প্রয়োগ তাঁর গল্পে ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করে; মুহূর্তের জন্য দ্বিধান্বিত করে তোলে পাঠককে। কিন্তু পাঠের একাগ্রতাকে ছিন্ন করা যে লেখকের অভীষ্ট নয় তা বোঝা যায় যখন এই নিরীক্ষা আলাদা অর্থ নিয়ে হাজির হয় পাঠকের সামনে। ‘আরসোলা’ গল্পেও তার গূঢ় ইঙ্গিত রয়েছে। চরিত্র দুটির পরিচয় প্রকাশিত না হলেও তারা যেন ঠিক সাবলীল যুগল নয়, অলক্ষ্যে কোথায় যেন একটা খটকা আছে। আরশোলা তারই প্রতীক যা ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করে ফিরিয়ে এনেছে নিজেদের প্রকৃত রূপে। এই প্রচণ্ড প্রেমের উদ্দামতার আড়ালে আরশোলা বিকার হয়ে এসে তাদের মনোজগতের বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে তুলেছে। তাদের জটিল ও বিচিত্র এই সম্পর্কের রূপায়ণে গল্পকার আশ্রয় নেন পরাবাস্তব গদ্যশৈলীর। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে এ গল্পের অংশবিশেষ দেখা যাক :

> হুঁ, তারা ভেবে রেখেছিল সারাটা বসন্ত তারা উপভোগ করবে, উপদ্রবহীন প্রেমের ঝড় বুকের মধ্যে নিয়ে মাতামাতি করবে, অস্থির হয়ে উঠবে, এ ওকে অস্থির করবে, ও একে পাগল করবে। . . . সব গোলমাল করে দিল শুভ্রা। . . . শুভ্রা মোটেও জানত না ওয়ার্ডরোবের ভেতর এই ব্যাপার। ডালাটা খোলা মাত্র, . . . ফর ফর করে ওরা তার লম্বা ছুঁচলো হালকা আঙুলগুলি বেয়ে, কব্জি বেয়ে, সুঠাম কনুই বেয়ে তার গলায় মাথায় চুলে, এমনকি ব্লাউজের ভিতর ঢুকে পড়তে আরম্ভ করল . . . এমনকি তার সায়ার ভিতর পর্যন্ত ওরা ঢুকে পড়েছিল, সায়ার মধ্যে,

ব্লাউজের ভিতর, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে শুভ্রার ঊরু বেয়ে, পায়ের পাতা বেয়ে ঘরের মেঝেয় চেয়ার-টেবিলে সোফায় আলনায় বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আরসোলা', ১৯৮০ : ৭৬)

অস্বাভাবিক যৌনতাকে ভিত্তি করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪), 'খেলোয়াড়' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪), 'ঘরণী' (*ট্যাক্সিওয়ালা* ১৯৫৬) সহ আরো কিছু গল্প লিখেছেন যেগুলো মানোত্তীর্ণ হলেও উৎকর্ষের শিখর স্পর্শ করতে পারেনি। গল্পগুলোতে মনোবিকার মূল উপজীব্য হয়ে না উঠলেও গল্পের কাঠামোয় এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' গল্পের শেষ পর্যায়ে বৃদ্ধ বসন্তবাবুর কাতর আকুতি থেকে তার যৌনবিকার স্পষ্ট হয়ে ওঠে – 'কী, তবে কি বলছ একটিও নেই, একজন গার্লফ্রেন্ডও তোমার নেই যে দু'জন গিয়ে একটা সন্ধ্যা একটু ফুর্তি করব। আমার অনেক দিনের শখ' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী', ২০১৫ক : ১৬২)। অন্যদিকে 'ঘরণী' গল্পেও চরিত্রের অবচেতনে লিবিডোতাড়িত মনোবিকার প্রশ্রয় পেয়েছে। লেখকের ভাষায় :

স্নান সেরে দক্ষিণা ঘরে ঢোকে যখন দেখে লাল টুকটুকে মুখ ছেলেটার গাল টিপছে সারদা। বলটা নিতে এসে প্রিয়দর্শন কিশোর সারদার খপ্পরে পড়ে গেছে। দক্ষিণা ঠোঁট টিপে হাসল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ঘরণী', ২০১৫ক : ৩২৪)

কমনীয় কিশোরের প্রতি আপাতনির্দোষ বাৎসল্য সবসময় মনোবিকারের লক্ষণ না হলেও লেখক এখানে সারদার আচরণের অস্বাভাবিকতাকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। পরের বাক্যে লেখক বর্ণনা করেন – 'যে হাত দুটো দিয়ে ছেলেটার গাল টিপছিল সেই হাত দুটো আরেকবার দেখা শেষ করে সারদা নিশ্বাস ফেলল' ('ঘরণী', ২০১৫ক : ৩২৪)। এতে স্পষ্ট হয় কিশোরের প্রতি নির্দোষ ভালোবাসা থেকে নয়, একরকম যৌনতাড়না থেকেই সারদা এমন আচরণ করেছে। আবার 'খেলোয়াড়' গল্পে কিশোর গুর্খার সঙ্গে বাজি রেখে প্রজাপতি ধরার মধ্যে মোনার মায়ের প্রচ্ছন্ন কামনাই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। মোনাদের বাসা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে গুর্খা কথক ও তার সঙ্গীদের জানায় – 'আসল খেলোয়াড়ের মন ওর' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খেলোয়াড়', ২০১৫ক : ১৩২)। এই ইঙ্গিতটুকু দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন মোনার মায়ের সংগুপ্ত কামনার কথা। তবে তৎকালীন প্রেক্ষাপট বিচার করলে হঠাৎ-পরিচিত একদল উদ্ধত কিশোরের সঙ্গে প্রজাপতি-ধরা খেলা, দলনেতার প্ররোচনায় খেলার সুবিধার্থে গায়ের শেমিজ খুলে ফেলা – এই ঘটনাগুলো বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কতটা যৌক্তিক তা নিয়ে ভাবনার অবকাশ আছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লিবিডোতাড়িত মনোবিকার নিয়ে লেখা বেশিরভাগ গল্প বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হলেও শিল্পোত্তীর্ণ গল্প হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে এর অল্প কয়েকটি। প্রথম জীবনে লেখা

অনেক গল্পে কাহিনির ব্যাপকতায় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব হারিয়ে গেছে। লেখকের রসোত্তীর্ণ ও শ্রেষ্ঠ গল্পগুলো একাকিত্ব-জনিত যৌনতার উপর ভিত্তি করে রচিত। এই পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলো নিয়ে নিচে 'আত্ম-আবিষ্কারের উপায় হিসেবে যৌনতা' শীর্ষক অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

আত্ম-আবিষ্কারের উপায় হিসেবে যৌনতা

এই পর্বের গল্পগুলো 'লিবিডোতাড়িত যৌন বিকার' বর্গভুক্ত হলেও গল্পের বিষয়বৈচিত্র্যের বিশিষ্টতায় এগুলোকে যৌনবিকার-সংশ্লিষ্ট হিসেবে আখ্যা দিলে এসব গল্পের প্রতি অবিচার করা হবে। এই গল্পগুলোতে বৈচিত্র্যহীন ও অবসাদগ্রস্ত জীবনের বৈক্লব্য থেকে মুক্তি পেতে যৌনতার আগমন ঘটেছে। চরিত্রের আত্মপ্রেম ও আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রে গল্পগুলো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই পর্বের গল্পের মধ্যে তিনটি গল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্পের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো হলো যথাক্রমে 'গিরগিটি' (১৯৩৬), 'পতঙ্গ' (১৯৬১) ও 'রূপালী মাছ' (১৯৬৩)। তিনটি গল্পেই অবসাদগ্রস্ততা, নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতায় ভর করে আত্ম-আবিষ্কারের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা থেকে চরিত্রের যৌনবাসনা প্রকাশ পেয়েছে।

মানবজীবনের এই অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধের রসায়নে গল্পগুলো মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের যৌনতা ও সৌন্দর্য-দর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ 'গিরগিটি' (প্রথম প্রকাশ : *দেশ* ১৯৫৬, *প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭)। আত্মপ্রেম ও আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রে প্রেম, যৌনতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণার অনন্যসাধারণ মেলবন্ধন গল্পটিকে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে। গ্রিক পুরাণের বহুচর্চিত নার্সিসাসের স্বভাবের আধারে নির্মিত ফ্রয়েডীয় ভাষ্যের পুনর্বিন্যাসে এই গল্পের অন্তর্গঠন নির্মিত হয়েছে। গল্পের মায়া চরিত্রটি প্রেম কিংবা যৌনতার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল না। ব্যক্তি ও সংসার জীবনে গতানুগতিক নারীদের তুলনায় ব্যতিক্রম মায়া একঘেয়ে, নিরানন্দ, বিষণ্ন ও একাকী জীবনে আত্মপ্রেমকে অবলম্বন করেছে যাপন প্রক্রিয়াকে উপভোগ্য করে তোলার জন্য। প্রণয় ও যৌনতা সম্পর্কে স্বামী প্রণবের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক ও সাংসারিক বিষয়ে তাদের রুচির ব্যবধানে স্বামীর সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব বেড়ে চলে প্রতিনিয়ত। মায়ার রূপ নিয়ে স্বামী প্রণবের একঘেয়ে স্তুতি তার অন্তরে গভীর কোনো রেখাপাত করেনি, বরং ক্লান্ত বোধ করেছে সে। লেখক মায়ার সেই অবসাদের চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লেখেন :

> কি, অপরের চোখে সে নিজেকে দেখছে? কে সেই পর? কেউ না। মানুষ না পুরুষ না। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাতদিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে মায়া এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর কোনো পুরুষের চোখেমুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল না

> শুনল না। যদি দেখত শুনত তবে কি সে রাগ করত? মায়া ঠিক ভেবে পেল না।
> (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গিরগিটি', ২০১৫ক : ৫২৭)

স্বামীর গতানুগতিক প্রশংসার চাইতে, তার সামনে নিজের রূপকে উন্মোচিত করার চাইতে, প্রকৃতির অপারতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে মায়া অধিক আনন্দ পায়। পেঁপেগাছ, নিমগাছ, প্রজাপতি, বুলবুলি, কাক, গিরগিটি, ফড়িং এদের সামনে কুয়োতলায় স্নানের সময় নিজের সৌন্দর্যকে সে মেলে ধরেছে। সবাক স্বামীর চাইতে নির্বাক প্রকৃতি তার কাছে নতুন, বৈচিত্র্যময়, প্রাণময় এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ। এদের সামনে নিজেকে উন্মুক্ত করে মায়া এক ধরনের ইন্দ্রিয়সুখ অনুভব করেছে। লেখকের ভাষায় মায়ার আত্মরতির শৈল্পিক রূপায়ণ:

> মায়া একটানে গায়ের ব্লাউজটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও শায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। . . . এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পত পত করছিল। . . . এ এক আশ্চর্য অনুভূতি! গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা পেট কোমর তলপেট ঊরু হাঁটু হাঁটুর নীচে পায়ের মাংসল ডিমগুলোকে সতেজ স্নিগ্ধ করে দেয়। . . . জলের আয়নায় নতুন করে সে নিজেকে দেখে। যেন চিনতে পারা যায় না এ মায়া সেই মায়া, এই কপাল সেই কপাল, এই থুতনি সেই থুতনি, এই বুক সেই বুক। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গিরগিটি': ২০১৫খ : ৫২২-৫২৩)

উদ্ধৃতাংশে লক্ষণীয় মানব-মনের অপার রহস্যের দ্বার উন্মোচনে জ্যোতিরিন্দ্র এখানে কাব্যধর্মী গদ্যভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন। কাব্যধর্মিতা তাঁর গদ্যশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে রচিত তাঁর গল্পগুলোয় তিনি এই কাব্যধর্মিতার শৈল্পিক বিনির্মাণ করেছেন।

গল্পের ধারাবাহিকতায় বৃদ্ধ ভুবন সরকারের আগমন ঘটলে তাকে ডুমুরের মরা ডালের মতো নিষ্প্রাণ জ্ঞান করে প্রকৃতির একটি জড় অংশ ভেবে, তার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে, তার সামনে অনাড়ষ্ট থাকে মায়া। এক পর্যায়ে ভুবন তার রূপের প্রশংসা করে তাকে সদ্যযৌবনপ্রাপ্ত ডালিম গাছের সঙ্গে তুলনা করলে ভুবনের সপ্রাণতা ও প্রশংসার ভাষার নতুনত্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে তার অবচেতনে। স্বীকার না করলেও মায়া যে সেই প্রশংসায় আন্দোলিত হয়েছিল গল্পের পরবর্তী প্রতিটি স্তরে তা বোঝা যায়। আপাত-নিষ্প্রাণ ভুবন সরকার মায়ার প্রতি তার মনোযোগ প্রকাশের শিল্পিত ঢঙে তরুণীটির মনে ধীরে ধীরে স্থান করে নিতে সমর্থ হয়। আত্মপ্রেমে মায়া এতটাই মগ্ন ছিল যে, বৃদ্ধ ভুবনকে তার সৌন্দর্যের

দর্শক ও তার রূপের একমাত্র স্তুতিকারী ভেবে ভুবনের তৃতীয় বিয়ের আলাপ প্রসঙ্গে জোরালো বিরোধিতা করে বলেছে – 'না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না।' . . . 'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হবে না' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গিরগিটি', ২০১৫ক: ৫৪৪)। অথচ ভুবনের তৃতীয় বিয়ে মায়ার জীবনে কোনো অভিঘাত সৃষ্টি করার কথা নয়, কারণ ভুবনকে কেন্দ্র করে তার সম্ভোগলিপ্সার কোনো আভাস নেই গল্পে। তদুপরি স্ত্রীর মন পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রণবের গতানুগতিক পন্থা, তার সঙ্গে সম্ভোগের পৌনঃপুনিকতায় ক্লান্ত ও বিরক্ত মায়ার কাছে ভুবন এক মুক্তির প্রতীক। ভুবনের সঙ্গে তার রুচির মিল – উপহার হিসেবে তার জন্য আনা দোপাটি ফুলের মালা, প্রকৃতির সঙ্গে তার সৌন্দর্যের তুলনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা; অর্থাৎ ভুবন বৃদ্ধ হলেও তার 'রসের বাল্‌ব' সদৃশ দৃষ্টির সামনে নিজেকে পরখ করার অভিপ্রায়ে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি যেন কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে, সম্ভবত সে কারণেই মায়ার এই জোরালো বিরোধিতা।

জংলা ছিটের শায়া পরিহিত মায়াকে দেখে ভুবন তাকে বনের চিতার সঙ্গে তুলনা করে বোঝাবার চেষ্টা করে – সে বুড়ো হয়ে গেলেও 'ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে দৃষ্টিটাকে এখনো আয়নার মতো ঝকঝকে করে' রেখেছে (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গিরগিটি', ২০১৫ক : ৫৪৫)। বৃদ্ধ ভুবন সরকারের অনুরাগে সাড়া দিতে এবং তৃতীয় বিয়ে থেকে তাকে নিরস্ত করতে মায়াও "তার উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে . . . হাসলো – 'বিশ্বাস করি, তা না হলে কি আর দুপুররাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?'" ('গিরগিটি', ২০১৫ক : ৫৪৫)। এই গল্পে প্রেম ও যৌনতার পরোক্ষ প্রশ্রয় থাকলেও এই উপাদানগুলো গল্পটির মূল ভরকেন্দ্র নয়। বরং আত্মপ্রেমের অনুষঙ্গ হিসেবে এগুলো গল্পটিতে ব্যবহৃত হয়েছে। যৌনতার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে মায়া ও ভুবন সরকারের সম্পর্কের রসায়নে লেখক বোধের অতীত এক বিস্ময়ের জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছেন এই গল্পে :

> একদিকে মায়ার বিস্ফারিত লাস্য অন্যদিকে বিগতযৌবন ভুবনের ভয়ার্ত মুগ্ধতা – যৌবনের অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার রূপায়ণ ঘিরে এখানে জমে ওঠে অন্যরকম এক আমিষ দৃশ্য : মাছ কাটা ও মাছ রাঁধার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। (ঋতংকর মুখোপাধ্যায় ১৪১৭ ব. : ২২১)

প্রেমেন্দ্র মিত্র অবশ্য এর পূর্বেই ১৯৩০ সালে এই প্রেক্ষাপটে লিখেছেন 'এই দ্বন্দ্ব' নামের একটি গল্প। এক বঞ্চিত নারীর রিরংসা অচরিতার্থতার দুর্বিষহ রূপ পরিগ্রহ করে প্রকাশিত হয়েছে গল্পটিতে। পরী নামের এই চরিত্রটিকে তার স্বামী আর আকৃষ্ট করতে পারে না। ফেলে আসা প্রেমিকের সুখস্মৃতিই তাকে বেশি আবিষ্ট করে রাখে। বাস্তব চাহিদা পূরণে ব্যর্থ স্বামীর আচরণ পরীকে আরো হিংস্র করে তোলে। সে

স্বামীর আদরের প্রতিবাদ জানায় তাকে হঠাৎ ‘আঁচড়াইয়া, কামড়াইয়া গালে চড় মারিয়া’ (প্রেমেন্দ্র মিত্র, ‘এই দ্বন্দ্ব’, ১৯৮৯ : ২২)। জ্যোতিরিন্দ্রের ‘গিরগিটি’ গল্পের মায়া অবশ্য এতটা আগ্রাসী নয়। পরীর তুলনায় তার চাহিদা আরো গূঢ় ও নিবিড়। সে সম্ভোগ চায়, কিন্তু এ ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তার প্রক্রিয়াগত পার্থক্য তাকে অপ্রাপ্তির বেদনায় ভারাক্রান্ত করে। কিন্তু তা থেকে উত্তরণে সে প্রথমে নিজেকে প্রকৃতির কাছে সমর্পণ করে এবং ভুবন সরকার প্রকৃতির অংশ হিসেবে তার সম্মুখে উপস্থিত হলে পরবর্তী পর্যায়ে তার কাছে সমর্পিত হয়। এই সমর্পণে যৌনতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতি নেই, কিন্তু তারই প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় এর নেপথ্যে ক্রিয়াশীল। আত্মপ্রেমের চরিতার্থতায় লিবিডোতাড়নার ব্যতিক্রমধর্মী ও সর্বাপেক্ষা নানন্দিক প্রকাশ ঘটেছে ‘গিরগিটি’র মায়া চরিত্রটিতে।

যৌনতাকে উপজীব্য করে জ্যোতিরিন্দ্রের আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প ‘পতঙ্গ’। এই গল্পটি ‘গিরগিটি’ গল্পের মায়ার মতো আরেক নিঃসঙ্গ নারীর প্রতিশোধ গ্রহণ ও নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম হিসেবে যৌনতাকে অবলম্বন করার কাহিনি। অধ্যাপক স্বামীর উপেক্ষা ও অমনোযোগ রূপা নামের রমণীটিকে অন্য পুরুষের প্রতি কীভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছে তা-ই গল্পটিতে লেখক প্রকাশ করেছেন মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে। লেখকের পক্ষ থেকে এই সহৃদয়তা সমাজসিদ্ধ নয় জেনেও তিনি নারীটির মনের গহ্বরে আলো ফেলে পাঠককে দেখাতে চেয়েছেন অবহেলা কীভাবে পরিবারের জবরজং কাঠামোর ভিত নাড়িয়ে দেয়।

অন্যদিকে যৌনতার সঙ্গে পূর্বপরিচয়হীন পলাশ নামের এক তরুণের অস্থিতিশীল মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পাঠক পরিচিত হয় এই গল্পে। পলাশ রূপার সঙ্গে প্রথমবারের শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে রূপার উপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে – এমন ভাবনার বশবর্তী হয়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে রূপার ঘনিষ্ঠতাকে মেনে নিতে পারে না। এই প্রতারণার শাস্তিস্বরূপ সে রূপাকে হত্যা করে। রূপার ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণে সে প্রশ্রয় পেলেও রূপা তার কাছে মানসিকভাবে নিজেকে সমর্পণ করেনি। পলাশ কেবল রূপার যৌনবাসনা চরিতার্থের মাধ্যম হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে এখানে। অথচ পলাশ মনে মনে ভেবে নিয়েছিল রূপার উপর পূর্ণ দখল লাভ করেছে সে। সেই অযাচিত ভাবনা ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ায় অপমানিত পলাশ হিংস্র হয়ে গল্পের শেষে রূপাকে হত্যা করেছে।

গল্পটিতে পুরুষ ও নারীর যৌনচেতনার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তবে এও সত্য, প্রথম যৌন বাসনার পরিতৃপ্তি নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই পরিতৃপ্তি মানব-মনের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটিয়ে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দকে কীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে এই গল্পের পলাশই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষার আরেকটি দৃষ্টান্ত লেখকের 'রূপালী মাছ' (*শ্বাপদ, শয়তান ও রূপালী মাছেরা* ১৩৭০ ব.) গল্পটি। একাকিত্বের হতাশা, উপেক্ষার প্রতিদান দেওয়ার তাড়না কিংবা নিছক শরীরকে তৃপ্ত করার ইচ্ছা থেকে পূর্ণেন্দুর স্ত্রী মাধুরী এ গল্পে শিবদাসের শরীরসঙ্গ চায়নি, বরং 'বিশুদ্ধতা'র একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পেতে 'নরক'-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিল। লেখকের ভাষায় :

> . . . প্রভুভক্ত ঘড়ির টিকটিক তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে কোথাও নরক আছে নোংরামি আছে, সাবধান, সাবধান, সাবধান। তাই তার রক্ত চঞ্চল হয় কৌতূহল জাগে, রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে চোখ দুটো নিচে পাঠিয়ে দিয়ে ও মেহগনির খাটটা বা সবুজ দরজার বাথরুমটা দেখা যায় কি না দেখতে চেষ্টা করে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রূপালী মাছ', ১৯৮২ : ২৩০)

পূর্ণেন্দুর উপরতলার নিয়মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক জীবনে মাধুরীর হাঁপ ধরে গেছে বলে নিচতলার মাংসাশী শিবদাস তাকে কৌতূহলী করে তোলে। সেই জীবনের স্বাদ নিতেই যেন শিবদাসের কাছে মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে মাধুরী। মাধুরীর এই যৌনবাসনা সমাজের দৃষ্টিতে বিকার হিসেবে চিহ্নিত হলেও এতে মাধুরীর অতল মনের একটি চিত্র ফুটে ওঠে। সেখানে সে নিজের কাছে অকপট। কেবল সমাজের চোখে নয়, মাধুরীর নিজের দৃষ্টিতেও এটা অন্যায় জেনেও সে এমন বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ জীবনকে অগ্রাহ্য করবার অভিপ্রায়ে। শিবদাসের সঙ্গে তার হৃদয়ের লেনদেন হয়নি, কোনো প্রতিশ্রুতিও আদান-প্রদান হয়নি দুজনের মধ্যে, এমনকি গল্পের কোথাও তাদের কোনো ধরনের যোগাযোগ কিংবা কথপোকথনেরও ইঙ্গিত নেই। তবুও শিবদাসের ঘরে অন্য রমণীর প্রবেশ ঘটলে মাধুরীর চোখ জ্বালা করে ওঠে। কোনো যুক্তি দিয়ে একে বিশ্লেষণ করা যায় না; যেমন ব্যাখ্যা করা যায় না মনে মনে মাধুরীর নিচতলায় শিবদাসের ঘরে নেমে যাওয়ার ঘটনাকেও। নিষ্প্রাণ সাত্ত্বিক জীবনের বিপরীতে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা মাংসাশী শিবদাসের জীবন তাকে আকৃষ্ট করে তোলে এবং সেই আকর্ষণের ফলে শিবদাসকে কেন্দ্র করে মাধুরীর কল্পনা সুদূরপ্রসারী হয়, যার সবটাই অজানা থাকে শিবদাসের। গল্পকার সুনিপুণ ভাষার কারুকার্যে মাধুরীর মনস্তত্ত্বের অতুলনীয় ইন্দ্রজাল নির্মাণ করেছেন এই গল্পে।

হতাশাপীড়িত যৌবনে নবপ্রেমের রোম্যান্টিক স্বপ্নচিত্র অঙ্কনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পটিতে যে গদ্যভঙ্গির আশ্রয় নেন তাতে জীবনানন্দীয় বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রেরণা অনুভূত হয়। গদ্যের এই ভঙ্গির কারণে মাধুরীর রহস্যজটিল মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

> নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকা, স্থাণুর মতো স্থির হয়ে থাকা, না আর একটু বেশি, আকাশের অনির্বচনীয় নীল চোখে মেখে রোদের তাপ বুক দিয়ে শুষে শুষে ক্লান্ত হয়ে পরে এক মধুর অবসাদের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়া, মরে থাকা।
>
> মরে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর। বা মরে গিয়েছিল। ভাবা যায় মরা শরীরটা রোদের জলে ভাসছে, কিন্তু স্থির হয়ে আছে এক জায়গায়।
>
> সোনার রঙের স্তন নিতম্ব কাঁধ গলা কোমর হাত পা নিয়ে ফুলে ওঠা ভেসে ওঠা শরীরের কোথাও গাত্রবাসের চিহ্নটি নেই বলে বনের কাছে কোন স্তব্ধ জলের ছবি মনে পড়ে শেওলার গন্ধ মনে পড়ে; অকৃত্রিম এক শব, শব ঘিরে অপরিসীম বেদনা আর নিঃসঙ্গ মধ্যদিনের বিহ্বলতা। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রূপালী মাছ', ১৯৮২ : ২২৭)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বেশ কিছু গল্পের মূল বিষয় মানুষের যৌনকামনা। যৌনতার প্রতি মানুষের দুর্দমনীয় আকর্ষণ ও তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে মানবচরিত্রের অপ্রকাশিত অস্বাভাবিক বিকারকে তিনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর এ সকল গল্পে। সেই ব্যাখ্যা সমালোচকের মতো তথ্য-উপাত্তময় নয়, বরং তাতে মিশে রয়েছে তাঁর একান্ত সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি।

তাঁর প্রথমদিকের গল্পে প্রেম ও যৌনতার স্থান সীমিত, অনুল্লেখ্য। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রেমের গল্পগুলোতে প্রেমের সঙ্গে যৌনতাকে আরো অবাধে মিশ্রিত করেছেন। তাঁর কিছু গল্পে প্রেমকে ছাপিয়ে যৌনতা মূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আবার কখনো তাঁর গল্পে প্রেম ও যৌনতা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি না করে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গল্পে বিচ্ছিন্নভাবে যৌনতার ইঙ্গিত এসেছে, যৌনতা কীভাবে চরিত্রের অবয়বকে দুমড়েমুচড়ে দেয় তার বিবরণ প্রকাশ পেয়েছে, গল্পের পরিণতি নির্ধারণে যৌনতার প্রধান ভূমিকা গ্রহণের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। তাঁর এসব গল্পে সামাজিক ও আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত লুপ্তগৌরব মানুষের জীবনে যৌনতা এসেছে আত্মবিস্মরণের উপলক্ষ্য হয়ে। এদিক থেকে দেখতে গেলে যৌনতা জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের উল্লেখযোগ্য উপাদান। কখনো প্রেমের অজুহাতে, কখনো আত্ম-আবিষ্কারের উপায় হিসেবে, কখনো প্রতারণার মাধ্যমে, আবার কখনো শুভ্রতার বিপরীতে পঙ্কিলতার আস্বাদ নিতে তাঁর গল্পের চরিত্ররা যৌনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছে। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে স্বাভাবিক যৌনতার চেয়ে অস্বাভাবিক যৌনতার প্রকাশ ঘটেছে বেশি; পুরুষের যৌনকামনার চেয়ে নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা বারবার প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে। এর পেছনে নিষিদ্ধ কিছুর প্রতি মানুষের অদম্য কৌতূহলকে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তাঁর কিছু গল্পে অবসাদগ্রস্ত, বৈচিত্র্যহীন, অবক্ষয়ী জীবনের যৌনতার প্রকাশ রয়েছে। এসব চরিত্রের জীবনে যৌনতার আবির্ভাব ঘটেছে কখনো আত্ম-

আবিষ্কারের সূত্রে। যেখানে নিষেধের রক্তচক্ষু চরিত্রদের শাসন করতে চায় সেখানে প্রেম ও যৌনতা অপ্রতিরোধ্য হয়ে প্রকাশিত হয়। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-সমৃদ্ধ গদ্যশৈলীর গুণে গল্পগুলো রস বিচারে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিশোর-মানস

যাপনের মাপকাঠিতে মানুষের জীবনকে কয়েকটি কালানুক্রমিক অধ্যায়ে ভাগ করা যায়, কৈশোর যার অন্যতম প্রধান ও বর্ণিল অধ্যায়। কৈশোর মানব জীবনের প্রাথমিক পর্যায়, যেখানে বিকশিত হবার আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করা যায় অবারিতভাবে, নিঃসংকোচে। কৈশোরকাল স্বাধীনতার শুদ্ধ রূপ। পরিবার, পরিপার্শ্ব ও সামাজিক সংস্কারের বাধা-বন্ধনকে সে নিজের অপাপবিদ্ধ সারল্য দিয়ে উপেক্ষা করতে পারে। অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে কৈশোরের অগোছালো, অস্থির দোলায়মানতা প্রকারান্তরে কিছুটা প্রশ্রয়ও পায়।

কৈশোর ও এর সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মনোঃসমীক্ষকগণ আলোচনা করেছেন। কিশোর-কিশোরীদের স্বাভাবিক বিকাশ এবং কৈশোরের নানা অস্বাভাবিক দিক ও সমস্যা সমাজতাত্ত্বিক ও শিক্ষাবিদদের আগ্রহের বিষয়। তাঁরা কিশোর-মনস্তত্ত্ব নিয়ে সাম্প্রতিক কালে অনেক চর্চা করছেন, কৈশোরের স্বাভাবিক বিকাশে কোনো সমস্যা চিহ্নিত হলে তা প্রতিকারের চেষ্টা করছেন। শিশু-কিশোর অপরাধ নিয়ে অপরাধ বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও সচেতনতা তৈরি হয়েছে। ১৯০৪ সালে স্ট্যানলি হল সর্বপ্রথম বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের ক্রমবিবর্তনের নিরিখে দেখান যে, তাদের বিকাশ ও পরিণতি ধীরেসুস্থে ঘটে না। আকস্মিক জোয়ারের মতো কৈশোরের তরঙ্গ এসে জীবনকে হতবিহ্বল করে দেয়, তাদের মানসিকতায় প্রভূত পরিবর্তন সাধন করে।

সাধারণত শৈশব থেকে যৌবনপ্রাপ্তির মধ্যবর্তী পর্যায়কে কৈশোর বলা হয়। দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক বৃদ্ধি এবং আনুষঙ্গিক মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন কৈশোর বিকাশের বিশেষত্ব। দেশ-কাল-পরিবেশ এবং সংস্কৃতিজাত ও জিনগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনও এই ক্রমবিকাশকে প্রভাবিত করে। দেহ-মনের বৃদ্ধি, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা কিশোর-মানসে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ব্যক্তিগত, সংস্কৃতিগত, অঞ্চলগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কৈশোরের উন্মেষের গতি-প্রকৃতি ও যৌবনপ্রাপ্তির একটি সাধারণ প্রক্রিয়া রয়েছে। সব দেশের কিশোর-কিশোরীই মোটামুটিভাবে একই চাহিদা ও সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়।

বিশেষজ্ঞদের পক্ষে কৈশোরের একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণ করা দুরূহ। কৈশোরের বয়ঃসীমা নির্দেশ করাও অসম্ভব। তবে মোটের উপর বলা যায়, কৈশোর হলো শারীরিক ও মানসিক বিকাশের এমন একটা পর্যায় যার ব্যাপ্তি সাধারণত বয়ঃসন্ধিকাল থেকে আইনগতভাবে যৌবনে পদার্পণ

পর্যন্ত। 'কৈশোর পরিণতবুদ্ধি মানুষ হওয়ার প্রস্তুতি পর্ব' (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯৫ : ১২৯)। তবে সম আবহাওয়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত হয়েও কিশোর-কিশোরীদের বৃদ্ধি ও পরিণতির ভিন্নতা দেখা যেতে পারে। আবার ছেলে আর মেয়ের কৈশোরকালেরও ভিন্নতা রয়েছে। মেয়েরা সাধারণত ছেলেদের তুলনায় দ্রুত কৈশোরপ্রাপ্ত হয়। তাদের বিকাশ ও পরিণতি ছেলেদের তুলনায় অগ্রবর্তী। যার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পেও। তাঁর 'বুটকি ছুটকি' (১৯৫৭), 'কেষ্টনগরের পুতুল' (১৯৬১), 'গুইনি' (১৯৬১), 'শ্বাপদ' (১৩৭০ ব.), 'রাক্ষসী' (১৯৬১) প্রভৃতি গল্পে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দ্রুত বিকশিত হতে দেখা যায়।

আমাদের দেশে একটা সময়ে এগারো থেকে পনেরো বছর বয়সীদের কিশোর বলে ধরা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে কৈশোরকালের বয়সসীমা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন পড়ে। এত দিনের প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী কৈশোর শুরু হয় তেরো বছর বয়স থেকে। আর প্রাপ্তবয়সে পদার্পণ ঘটে উনিশ বছর বয়সে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, এই ধারণা পরিবর্তনের সময় চলে এসেছে। জাতিসংঘ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দশ থেকে উনিশ বছর বয়সকে কৈশোরকাল হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে কিশোর-মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ নতুন নয়। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখা প্রয়োজন, শিশু-কিশোর সাহিত্য এবং কিশোর-মানসকে আশ্রয় করে লেখা সাহিত্য এক নয়। শিশু-কিশোর সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য শিশু-মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুপাঠ্য সাহিত্য রচনা করা। আর কিশোর-মানসকে কেন্দ্র করে রচিত সাহিত্যের লক্ষ্য কেবল কিশোর পাঠক নয়, সেগুলোর লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রেই পরিণত পাঠক। সুতরাং এই ধরনের রচনায় কিশোরদের চরিত্রের অভ্যন্তরীণ জটিলতা ও সংকট উন্মোচনে রচয়িতা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাই দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের (১৮৭৭-১৯৫৬) *ঠাকুরমার ঝুলি* ও *ঠাকুরদার ঝুলি*, সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) *পাগলা দাশু*, শিবরাম চক্রবর্তীর (১৯০৩-১৯৮০) *বাড়ি থেকে পালিয়ে* প্রভৃতি শিশু-কিশোর সাহিত্য হলেও তাদের মনের অন্ধিসন্ধিতে আলোকসম্পাত করা রচয়িতাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু কিশোর-মনস্তত্ত্ব নিয়ে রচিত সাহিত্যে রচয়িতার এই দায়বদ্ধতা থাকে এবং এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালিত হলেই কেবল সেটি কিশোর-মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক সাহিত্য হিসেবে সাফল্য অর্জন করে। এর প্রথম পর্যায়ের দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়। 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮ ব.), 'ছুটি' (১২৯৯ ব.), 'অসম্ভব কথা' (১৩০০ ব.), 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১ ব.), 'অতিথি' (১৩০২ ব.), 'বলাই' (১৩৩৪ ব.) প্রভৃতি গল্পে কৈশোরের নিগূঢ় বৈচিত্র্যের কতিপয় দিক বিধৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' (১৯১৪) ও *মেজদিদি*-তেও (১৯১৫) কিশোর-মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছে। উত্তরকালের

লেখক জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ তাঁদের রচনায় কিশোর-মনের জটিলতাকে তুলে ধরতে আগ্রহী হয়েছেন।

তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যতিরেকে অন্য লেখকদের অনুসন্ধানের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অনুসন্ধানের কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়। এঁদের বেশিরভাগ রচনা পরিণত বয়সের মনস্তত্ত্ব ঘিরে আবর্তিত, কিশোর-মনস্তত্ত্ব তার অংশ মাত্র। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি গল্প বিশেষভাবে কিশোর-মানসকে কেন্দ্র করেই রচিত। তাঁর এই পর্যায়ের গল্পের কেন্দ্রবিন্দু কিশোররাই। তারা মোটামুটিভাবে দশ থেকে উনিশ বছর বয়সী। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে তাঁর কৈশোর কীভাবে আপ্লুত ও ঋদ্ধ করেছে তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়। লেখক বেশ কয়েকটি গল্পে কৈশোরের বিস্তৃত ও বর্ণিল পর্বটির অসংখ্য খণ্ডচিত্র উপস্থাপন করেছেন। আবার অনেক গল্পে কৈশোরের রহস্যময় রূপটিও তিনি পারিপার্শ্বিক অনুপুঙ্খ-সহ পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। এর কোনোটি তাঁর নিজের যাপিত কৈশোরের রসে সিক্ত, কোনোটি আবার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার অর্জন। কোনো কোনো চরিত্রকে জীবনের ক্লেদ তখনও স্পর্শ করেনি, আবার কোনোটি তার উপরেই পদ্ম হয়ে ফুটেছে। কয়েকটি অল্পবয়সী চরিত্রের হতশ্রী জীবনে ভবিষ্যতে বিকশিত হবার সম্ভাবনাটুকুও নেই। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

> শিশুগুলি চুপ করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। শীর্ণ শঙ্কিত চাউনি সব ক'টির। গায়ে কাপড় নেই, শরীরে নেই স্বাস্থ্যের চিহ্ন। লিকলিকে হাত-পা, মাথাগুলো বড় বড়। পোকায় খাওয়া, মৃতপ্রায় চারাগাছের মতো ওরা এখানেই এসে থেমে গেছে, এই বয়সেই ফুরিয়ে এসেছে ওদের আশা আর ভবিষ্যৎ। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সন্ততি', ২০১৫ক: ১৯)

কাহিনির প্রয়োজনে তারা লেখকের গল্পে চরিত্র হয়ে এসেছে। জীবনের আখ্যান রচনা করতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী একদিকে যেমন কৈশোরের সম্ভাবনা নিয়ে আহ্লাদিত হননি, তেমনি অন্যদিকে সম্ভাবনাহীনতার কথা বলতেও দ্বিধা করেননি। তিনি নির্মোহভাবে কৈশোরের মুগ্ধতার কথা বলেছেন – দুঃখ-যন্ত্রণা, হাসি-আনন্দ, প্রেম-ক্ষোভ ও পরিণতির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। গল্পের ভাঁজে ভাঁজে সযত্নে সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাদের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাকে। সেইসব গল্প থেকে পাঠক জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের কিশোরদের মনোজগৎ ও যৌনচেতনা সম্পর্কে একটা ধারণা পায়, যা হয়তো সেই কিশোরদের কাছেও তখনও পর্যন্ত অস্পষ্ট। লেখক তাঁর এই গল্পগুলোতে কিশোর-মানসের নানা স্তরকে নিরীক্ষণ করেছেন একনিষ্ঠ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে।

বিবর্তনশীল কিশোর-মনস্তত্ত্বের নানা পর্বের উন্মোচনের গল্প 'বনের রাজা' (*মহীয়সী* ১৯৬১)। প্রকৃতির সংস্পর্শে এসে কী করে নাগরিক পরিবেশে লালিত মতি গ্রামের জল-হাওয়ার গন্ধ পেতে শিখল,

কীভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার এক অনির্বচনীয় অনুভবের সাক্ষাৎ পেল, তা-ই স্তরপরম্পরায় সাজিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। নাতিকে বেঁচে থাকার আনন্দময় রসদ জোগাচ্ছে ভূতপূর্ব নাগরিক ইঞ্জিনিয়ার, অধুনা অবসরপ্রাপ্ত গ্রামীণ এক দাদু – নাম তাঁর সারদা। ষাট বছর বয়সী সারদা নাগরিক বৈভব ত্যাগ করে, ভব্যতার খোলস ছেড়ে প্রকৃতির কাছে নিজেকে মেলে ধরার দীক্ষা দেন শহর থেকে গ্রামে বেড়াতে আসা নাতিকে। কিন্তু নাগরিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত নাতির অস্বস্তি হয় দাদুকে নগ্ন অবস্থায় দিঘিতে সাঁতার কাটতে দেখে। তার সেই অস্বস্তি আরো প্রকট হয় যখন দিঘির পাড়ে পাতাকুড়ুনি মেয়েটির আগমন ঘটে; যদিও এর আগেই দাদুর প্ররোচনায় প্রকৃতির প্রশ্রয়ে গরম থেকে বাঁচতে নিজের প্যান্টখানি খুলে মাথায় জড়িয়ে নিয়েছিল সে। নিজে জলের নিচে আছে বটে, কিন্তু দাদু কতক্ষণ থাকবে, এই নিয়ে সে অস্বস্তি বোধ করে। শহুরে মার্জিত বোধে লালিত মতির উপলব্ধি – কোনো পূর্ণবয়স্ক পুরুষকে কোনো মেয়ের নগ্ন অবস্থায় দেখা সমীচীন নয়। সে জানে না এই বিধি-নিষেধের আরোপকর্তা কে, এর ভিত্তিই-বা কী। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারে, এটা একটা আচরণীয় রীতি যা সভ্য ও সামাজিক মানুষকে মেনে চলতে হয়।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে আবিষ্কার করার সূত্রের সন্ধান পায় মতি। নাভিজলে দাঁড়িয়ে পাতাকুড়ুনি মেয়েটির উদ্দেশে সারদার শাপলাফুল ছুঁড়ে দেওয়া এবং মেয়েটিরও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সেটি তুলে নিয়ে চুলে গোঁজার ঘটনা মতির মনস্তত্ত্বে সহজতার অনুরণন জাগায়। মতির নাগরিক মানসিকতা তাদের সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ককে আর কটাক্ষ করতে পারে না। সে অনুভব করতে পারে ইট-পাথরের কঠিন নিয়মকানুন ঢেলামাটির পৃথিবীতে এসে কোমল হয়ে পড়ে, স্নিগ্ধ এবং সহনীয় গড়ন পায়। দাদুর গায়ের গন্ধ, এমনকি চামড়ার গন্ধও, সে চিনে নিতে শেখে :

> মাছের গন্ধ না, আমের গন্ধ না, ক্ষীরের গন্ধ না, জাম জামরুলের গন্ধ না। জলের গন্ধ? শ্যাওলার গন্ধ? তা-ও না। কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ এটা। মতি বুঝল। মতি বুঝল না আয়ুর ফিতে লম্বা করতে এই গন্ধও শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কি না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বনের রাজা', ২০১৫ক: ৬৫২)

নাগরিক জীবনের যান্ত্রিক জটিলতার বিপরীতে নিসর্গলালিত প্রাণচাঞ্চল্য ও দাদুর প্রাণময়তায় অনুপ্রাণিত হয়ে মতি উপলব্ধি করতে পারে, 'আয়ুর ফিতে' লম্বা করতে প্রকৃতির অকৃত্রিম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তাকে স্বাগত জানাতে হয়। প্রকৃতির প্রাণস্পন্দনে নিয়ত স্পন্দিত দাদুর অনাবৃত দেহের সারল্য ও উদার নিসর্গের সহজতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মতি প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ আর গন্ধকে অনুভব করে, যান্ত্রিক জীবন থেকে দূরবর্তী ভিন্ন এক জগতের সন্ধান পায়। গল্পটিতে এক কিশোরের মনে নবচেতনার

সঞ্চার ঘটাবেন বলে স্তরপরম্পরায় তার মানসিক উত্তরণের অনুপুঙ্খ লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক কিশোর-মনস্তাত্ত্বিকের দক্ষতায়। এই গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যাক :

> এই গল্পে মতির স্বীকারোক্তিগুলো সেই অসহায় মানুষের আত্মসমীক্ষা। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটকে যান্ত্রিকতার নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত প্রকৃতির মুক্ত আনন্দযজ্ঞে নিজেকে শামিল করতে চেয়েছে অভিজিৎ। 'রক্তকরবী'র রাজা নিজের তৈরি ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রকৃতির মুক্ত প্রাণ স্পর্শ পাওয়ার আশায়। আর 'বনের রাজা'য় সারদা নামকরা যন্ত্রবিদ ছিল বলে যান্ত্রিকতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি সচেতন। আজকের আধুনিক যুগের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে মতির মত। 'কোমল মিষ্টি ঠান্ডা মৃদু শাপলা ফুলের গন্ধ' শরীরে ধরে রাখার দরকার আছে কিনা বুঝতে না পেরে ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে। (দেবশ্রী মণ্ডল ২০১৭ : ১৬২)

নিজের ঠাকুরদার চরিত্রটিকে ভেঙেচুরে কীভাবে 'বনের রাজা'র সারদা চরিত্রটি নির্মিত হয়েছে সে সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বলেছেন :

> শিশুকালে নিত্য যার সঙ্গে প্রত্যূষে বেড়াতে বেরোতাম, সেই আমার দীর্ঘায়ু লোভী ঠাকুর্দার গায়ের পাকা আমের গন্ধের মতন নিবিড় মদির গন্ধ ও হেলিডির বাংলোর গোলাপের টাটকা গন্ধ মিলেমিশে গিয়ে আমার কলম থেকে একদিন 'বনের রাজা' বেরিয়ে এল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ১৪১৬ ব. : ২২৩)

পিতা-মাতার দাম্পত্য দূরত্ব কীভাবে কিশোর-মানসকে হতাশাগ্রস্ত ও বিষণ্ন করে তোলে তারই মর্মস্পর্শী আখ্যান 'কৈশোর' (*প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭)। অসুস্থতার কারণে দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী বাবলুর মায়ের সঙ্গে তার বাবার দূরত্ব তৈরি হলে তার কচি প্রাণ আহত হয়। সেই আঘাত বহু গুণ বিবর্ধিত হয় যখন সে তার বন্ধুর বাবা-মায়ের পারস্পরিক আন্তরিকতা, বিশেষত তাদের খুনসুটি ও চুমুর শব্দ শুনতে পায়। সে তার নিজের বাবা-মায়ের মধ্যে মিল করিয়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ডাকে। কিন্তু গল্পকার গল্পের ভার ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে না দিয়ে কাহিনিকে নিজের গতিতে চালিত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে ভিন্ন এক জগতের মুখোমুখি হয় বাবলু। মায়ের ইঞ্জেকশন আনার জন্য বাবলুও বাবার সঙ্গে যাওয়ার বায়না ধরলে নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবা তাকে সঙ্গে নেন, গল্পকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাবলুর ভিন্ন জগৎ পরিদর্শনের লক্ষ্যে। এই ঘটনা কাহিনির গতিপথকে আমূল বদলে দেয়। কিশোর বাবলুর মনে এক অপ্রত্যাশিত অভিঘাত সৃষ্টি করে, যেটিকে সে তার চেনা জগতের সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারে না। ইঞ্জেকশন কেনার জায়গাটি যে আদতে ঔষধ বিক্রির স্বাভাবিক কোনো জায়গা নয় তা বাবলু সেখানকার

মেয়েদের চালচলন ও মানুষের অপরিচিত হাসি দেখেই বুঝতে পারে। কথকের বয়ানে বাবলুর সে সময়ের মানসিক অবস্থার চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করা যাক :

> বস্তুত এখানে দুটো মানুষের মধ্যে একটা মানুষকেও বাবলুর ভাল লাগছিল না। ডাক্তারটা খারাপ লোক, কম্পাউন্ডারটাও খারাপ লোক। তার মন বলছিল। ভাল লোকেরা এভাবে হাসে না। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের হাসি তার মনে পড়ে। তাদের হেডমাস্টার বঙ্কিম বাবু . . . বাবলুদের ধোপা রামধনিয়া, এমনকী, তাদের বাড়ির ঝি শোভার মা'র হাসি তার সামনে ভেসে উঠল। 'ওরা কেউ এভাবে হাসে না। ওদের হাসি দেখলে কি কোনওদিন আমার রাগ পেয়েছে?' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কৈশোর', ২০১৫ক : ৫০৬)

তার বাবা তাকে সেই ডিসপেনসারিতে রেখে ইঞ্জেকশন কেনার নাম করে বেরিয়ে গেলে বাবলুর এই জগতের আরো গভীরে প্রবেশের সুযোগ ঘটে। এখানকার মেয়েদের ধূমপান ও মদ্যপ অবস্থায় অসংলগ্ন আচরণের কারণে তার চেনা জগতের সঙ্গে এই জগতের পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ হওয়ার পাশাপাশি এখানকার মানুষদের শ্রেণিচরিত্রও সে কিছুটা আন্দাজ করতে পারে। বুঝতে পারে যে, তার সঙ্গে, তার বাবার সঙ্গে, এদের শ্রেণিগত পার্থক্য বিস্তর। বাবলু তার পূর্ব-অভিজ্ঞতা দিয়ে এই জগতের বিশৃঙ্খল খণ্ডদৃশ্যগুলোকে একত্রে জুড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হতে হতে গলিটা ধরে বাবাকে খুঁজতে গিয়ে সে অভিজ্ঞতার আরো গভীরে প্রবেশ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বাবাকে যে বাড়িতে সে খুঁজে পায় সেটির চেহারা এবং বাবার ভাবভঙ্গি দেখে তার মনে হয় – ইঞ্জেকশন নয়, হয়তো অন্য অস্বাভাবিক কিছুর খোঁজে তার বাবার এই স্থানে আগমন ঘটেছে।

গল্পটি যেহেতু কিশোরের মনস্তাত্ত্বিক তল থেকে দেখা, বাবলুর চোখে সেই অস্বস্তিকর জায়গা ও তার বাবার অসংলগ্ন আচরণ সম্পর্কে গল্পে স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই; কিন্তু নানা ইঙ্গিত থেকে অনুধাবন করতে বেগ পেতে হয় না যে, এটা একটা পতিতাপল্লি এবং বাবলুর পিতা অবিবেচকের মতো সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছে। ব্যাপারটা এর মধ্যে সীমিত থাকলেও হয়তো একে কোনোমতে সুস্থতার মান্যতা দেওয়া যেত, কিন্তু সেটিও সম্ভব হয় না যখন দেখা যায় তার পিতা তাকে অন্যের জিম্মায় রেখে নারীসঙ্গ উপভোগ করতে নির্দিষ্ট কোনো বারবণিতার বাড়িতে গেছে।

ইঞ্জেকশন কেনার বাহানায় একটি কিশোরকে পিতার সঙ্গে পতিতাপল্লিতে পাঠানো গল্পকারের পক্ষে কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে এ নিয়ে সমালোচনার অবকাশ থাকতে পারে; এক পর্যায়ে এও মনে হতে পারে যে, ঘটনাপ্রবাহকে বুঝি বাড়াবাড়ি পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু সেখানকার এক রমণীর দেওয়া চকোলেটের সূত্র ধরে, অর্থাৎ বাড়ি ফিরে রাতের বেলা বাবলু সেই চকোলেট খেতে গিয়ে, চকোলেট

চোষার শব্দের সঙ্গে মিল খুঁজে পায় তার বন্ধু অমলের বাবা-মায়ের চুমুর শব্দের। সেদিন আড়ালে থাকায় শব্দটা কীভাবে তৈরি হয়েছিল সেটা সে বোঝেনি, কিন্তু এতটুকু বুঝেছিল শব্দের উৎস আদৌ চকোলেট নয়, সেটি এমন এক অপরিহার্য উৎস যার কারণে পিতা-মাতার জীবন সুন্দর ও সহজ হয়। বাবলু তার চেতনা দিয়ে সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করে, স্থানভেদে কোনো শব্দ অস্বস্তিকর হলেও নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে একই শব্দ পরম সুন্দর ও স্বাভাবিক, সম্পর্কের রসায়নে তা সপ্রাণতার সঞ্চার ঘটায়। বাবলুর পিতার চরিত্রের উন্মোচনের পাশাপাশি শব্দটির এমন ব্যঞ্জনাময় উপস্থাপন করবেন বলেই হয়তো গল্পকার বাবলুকে পতিতাপল্লি ঘুরিয়ে এনেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে হতে পারে কিশোরের এই পরিভ্রমণ হয়তো ততটা অযৌক্তিক নয়। তার চোখে সেই অচেনা জায়গার অনেক কিছুই অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হলেও, পিতার আচরণ বেখাপ্পা মনে হলেও, কৈশোরের স্বভাবসুলভ সারল্যে তার সমস্ত নেতিবাচক ভাবনাকে নাকচ করে দিয়ে বন্ধুর বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠতার সূত্রে নিজের বাবা-মায়ের সম্পর্কের উষ্ণতাকে প্রত্যক্ষ করতে উদ্‌গ্রীব হয়েছে বাবলু।

কিশোর বাবলু পরিস্থিতিজনিত ব্যক্তিক বিচ্ছিন্নতার শিকার। ফলত সহপাঠীদের আনন্দে অংশগ্রহণেও সে সংকোচ বোধ করে এসেছে এতদিন। পতিতাপল্লির খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে সে গলদঘর্ম হয়, কিন্তু সেখানকার নারীদের বাৎসল্য তাকে আলোড়িত করে। বন্ধুর বাবা-মায়ের ঘনিষ্ঠতার সূত্রে নিজের পিতা-মাতার সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ ঘটলে অল্পবয়সী কিশোর-মন তার ধর্মীয় সংস্কারবশতই আপাত ঈশ্বরহীন পৃথিবীতে অনন্যোপায় হয়ে পুনরায় ঈশ্বরের কাছেই সমর্পিত হয় – 'ঈশ্বর, অমলের বাবা-মায়ের মতন আমার বাবা-মার মধ্যে মিল করে দাও' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কৈশোর', ২০১৫ক : ৫১৯)। পিতা-মাতার মানসিক দূরত্ব কী করে একটি কিশোর-মনকে আন্দোলিত করে তাকে হতাশ, বিষণ্ন করে তোলে, তিলে তিলে দগ্ধ করে, তারই প্রকাশ 'কৈশোর' গল্পটি। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন :

> মধ্যবিত্ত পরিবার জীবনের পারিপার্শ্বিকতায় কিশোর মনে কি পরিমাণ আলোড়ন সৃষ্টি হতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অতি দক্ষতায় তার চিত্র এঁকেছেন, প্রচলিত নীতির দিক দিয়ে বাবলুকে যে জায়গায় লেখক নিয়ে গেছেন, তা সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু সত্য সুন্দরের খাতিরে এমন ঘটনার সংস্থাপন না হলে বুঝি গল্পের মূল সুরটা হারিয়ে যেত। (অজ্ঞাত ১৪১৬ ব. : ২৯১)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গুইনি' (*মহীয়সী* ১৯৬১) গল্পে কৈশোরের আরেকটি জটিলতার ভিন্ন রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। গুইনি মতি কিংবা বাবলুর মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কিশোরদের প্রতিনিধি নয়। সে অশিক্ষিত, অবাঙালি ফেরিওয়ালার সন্তান, তাও আবার মেয়ে। বস্তির ঠুনকো ঘরে থেকে দেশি ফল ফেরি

করার সংগ্রামী জীবনে লাটিম খেলাই তার একমাত্র বিনোদন। এই খেলায় তাকে হারানো দুঃসাধ্য। তার খেলার সাথীরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের হলেও গুইনির সঙ্গে খেলতে তাদের কোনো দ্বিধা কাজ করে না, বরং তার সঙ্গে খেলাটা তারা উপভোগ করে দারুণভাবে।

কিশোরী গুইনির একদিন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বাল্যবিবাহ সেই সময়ের নৈমিত্তিক ঘটনা। দরিদ্র অবাঙালি মেয়ে গুইনির বিয়ে হবে – এতে তার কিশোর সঙ্গীরা আশ্চর্য হয়নি; কিন্তু লাটিম খেলায় গুইনি তাদের অঘোষিত নেতা ছিল, তাই তাকে হারিয়ে ফেলার কষ্টটা ছিল তীব্র। তারা নিজেরাও জানত না গুইনির কাছে প্রতিদিন খেলায় হেরে যাওয়ার মধ্যে তারা কেন এত আনন্দ পেত।

গল্পকারের কিশোর চরিত্ররা তাদের অনুভূতিগুলোর উৎসমুখ খুঁজে না পেলেও লেখক কাহিনি বর্ণনার ছলে তাদের কিশোর-মানসকে স্তরে স্তরে উন্মোচিত করে দেখিয়েছেন। যে গুইনি প্রতিদিনের লাটিম-যুদ্ধে সচরাচর বিজয়ীর হাসি হাসে, কদাচিৎ পরাজয় ঘটলে যে রাগ করে, অভিমান করে, হিংসায় জ্বলে ওঠে, শেষদিন হেরে গিয়ে সেই গুইনির চোখে জল ঝরতে থাকে। লাটিম খেলার সাময়িক পরাজয় তাকে হয়তো ব্যক্তিজীবনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরাভবের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেখানেও গুইনি হারতে চায়নি, যুদ্ধ করে জিততে চেয়েছে। কিন্তু জীবন নামক লাটিমের ধার আর শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি সে।

গুইনি কৈশোরের স্বাভাবিক পরিক্রমা থেকে বঞ্চিত এক কিশোরী, যে পরিস্থিতির কারণে মুহূর্তে কিশোরী থেকে তরুণীতে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়। যদিও তার হৃদয়টা রয়ে যায় পুরোপুরি কিশোরীরই। তার পূর্ববর্তী চঞ্চলতায় ভরা কৈশোর, বর্তমানে যা পারিপার্শ্বিকতার চাপে অবরুদ্ধ হয়ে দুর্মর যন্ত্রণায় জর্জরিত, সেই যন্ত্রণার প্রচ্ছন্ন রূপটি গল্পের উপান্তে লাটিম খেলায় হেরে যাওয়ার রূপকে বিবৃত করেন লেখক। গল্পটিতে তার সঙ্গী কিশোরদের মনস্তত্ত্ব নির্ণয়ে গল্পকারের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ থাকলেও গুইনির হৃদয়ের হাহাকার প্রকাশে ও তার মানস উন্মোচনে তিনি পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। অল্প কয়েকটি আঁচড়ে তিনি গুইনির কৈশোরের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার রহস্যজটিল মনোজগৎকে উন্মোচিত করেছেন।

অব্যক্ত অনুভূতির আড়ালে কিশোর-মনের যৌন তাড়নাকেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী চিত্রকল্পের মাধ্যমে হাজির করেছেন তাঁর কিছু গল্পে। ব্যক্তিজীবনে এর ব্যাপকতা সম্পর্কে কিশোরেরা হয়তো তখনও সচেতন নয়, কিন্তু বংশানুক্রমে যৌনকাতরতার যেসব বৈশিষ্ট্য তারা সঙ্গে করে এনেছে সেগুলো তাদের অবচেতনে অবিরাম অভিঘাত সৃষ্টি করে চলেছে। তাই গুইনিকে কলতলায় স্নান করতে দেখে জ্যোতিরিন্দ্রের কিশোর

বয়সী কথক যে আপ্লুত হতো তা সে স্বীকার করে গল্পে। কিশোর-মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে গল্পকার এখানে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের আশ্রয় নিয়েছেন তা পর্যবেক্ষণ করা যাক :

> মিথ্যা বলব না, কলতলায় বসে গুইনি যখন রগড়ে রগড়ে কালো চামড়ার ঘাম ময়লা ধুতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত তখন ওর শরীর দেখে কালো পাথরের কথা মনে হলেও আমরা এটা খুব আস্তে, অত্যন্ত সংগোপনে, যেন নিজের কাছে নিজে স্বীকার করতাম, আসলে গুইনির গা পাথরের মতো শক্ত না, নরম, কালো মখমলের মতো নরম, মসৃণ, উজ্জ্বল, – আর উঁহু, পাথরের মতো মোটেই ঠান্ডা না, এতক্ষণ জলের ধারা লাগার পরেও মখমলের মৃদু উষ্ণতা ওর শরীরের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'গুইনি', ২০১৫ক : ৬৫৬)

'গুইনি' গল্পে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যৌনচেতনার প্রকাশ ঘটলেও 'কেষ্টনগরের পুতুল' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১) গল্পটির পুরো কাহিনি কিশোর বয়সের প্রচ্ছন্ন যৌনচেতনার আবহে গড়ে উঠেছে। সেই যৌনতা আবার কামগন্ধী নয়, তাতে প্রেমের ভাগই বেশি। বস্তুত এই কৈশোরক যৌনচেতনা প্রেম থেকেই উদ্ভূত।

'কেষ্টনগরের পুতুল' গল্পে গাছ থেকে জাম পাড়াকে কেন্দ্র করে সমবয়সী দুই কিশোর-কিশোরীর যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। গল্পটি উত্তম পুরুষে রচিত এবং এখানে মেয়েটির চরিত্রকে পূর্ণরূপে বিকশিত হওয়ার অবকাশ রাখা হয়নি। কিন্তু গল্পকার কিশোরটির মনের নানা সূক্ষ্ম অনুভবকে উন্মোচিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা যায়, পনেরো বছরের এই কিশোরটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পরিপাটি পোশাক পরিহিত কিশোরীটিকে। কথকের বয়ান অনুসরণ করলে তাকে অনিন্দ্যসুন্দর ভেবে নেওয়া অমূলক হবে না; তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মেয়েটির বয়ঃসন্ধিকালীন প্রস্ফুটিত কৈশোর। তাই কিশোরটি তার আপাদমস্তক অর্থাৎ পায়ের গোড়ালি, হাঁটু হতে চোখের পাপড়ির সৌন্দর্য পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে; এইসব সৌন্দর্য সে আকণ্ঠ পান করে বললেও অত্যুক্তি হবে না। আপাতদৃষ্টিতে আলাপচারিতায় অনিচ্ছুক কিশোরীটির কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আক্রোশবশত ছেলেটি তাকে ব্যথা দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার হাত চেপে ধরে। কিশোরটির এই আচরণের অন্তরালে রয়েছে তার প্রচ্ছন্ন কাম-তাড়না। পরবর্তীকালে পানিতে পড়ে গিয়ে মেয়েটির জামা ভিজে শরীরের বিভিন্ন বাঁক স্পষ্ট হয়ে উঠলে ছেলেটি বিহ্বল হয়ে পড়ে। কথক কিশোরটির বর্ণনার ভাষায় আর গল্পকারের গদ্যশৈলীর গুণে তা শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে :

> কী, জল ছেড়ে তীরে ওঠা মাত্র ওর দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল ও বড়, এইমাত্র যেন বড় হয়ে গেল, যেন অন্তত দশ বছর বয়স এগিয়ে গেছে। আর আমি ছোট।

> ছোট হয়ে গেছি ওর সামনে। যেন আমি আর ওর দিকে তাকাতে পারছি না, অথবা তাকাতে গিয়ে চোখ অন্যদিকে সরাতে পারছি না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কেষ্টনগরের পুতুল', ২০১৫ক: ৮০২)

শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে মেয়েটির ক্ষতস্থান রুমাল দিয়ে বেঁধে দিতে গিয়ে নিজের মধ্যে অচেনা এক অনুভূতির উপস্থিতি টের পায় কিশোরটি। কিশোরীর পা থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তকে দুর্লভ কোনো ফলের রসের মতো মধুর মনে হতে থাকে তার। এক পর্যায়ে মেয়েটিও ছেলেটির এই অস্পষ্ট প্রেমের আকাঙ্ক্ষাকে নিঃশব্দে সমর্থন দেয়, ক্ষত নিরাময়ের অজুহাতে তাদের মধ্যে মৃদু কিন্তু স্পষ্ট মানসিক যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু এর ঠিক পরই ছেলেটিকে তার রুমাল ফিরিয়ে দিয়ে রক্ত-পড়া বন্ধ হওয়ার কথা জানিয়ে কিশোরীটি চলে যায়। মেয়েটি চলে গেলেও ছেলেটির মনের মধ্যে যে অনুভূতির অনুরণন জাগিয়ে দিয়ে যায় তা বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক অবস্থাকে কেমন স্পষ্ট করে তোলে তা কথকের জবানিতে দেখা যাক :

> আমি কতক্ষণ জামতলায় চুপ করে বসে ছিলাম খেয়াল নেই। . . . হঠাৎ পায়ের কাছে ঘাসের ওপর চোখ পড়ল। রুমালের টুকরো দুটো পড়ে আছে। রক্তের রং আর চেনা যায় না, শুকিয়ে কেমন কালচে হয়ে আছে। আর কোথা থেকে এতগুলো মাছি এসে জুটেছে ওটার ওপর। কেমন তিরতির করে উঠল বুকের ভিতরটা, কেমন যেন কান্না পাচ্ছিল। হাত বাড়িয়ে রুমালের টুকরো দুটো টেনে এনে চোখের সামনে তুলে ধরে নাড়াচাড়া করি, আর যেন অনেকটা ভয়ে ভয়ে, এদিক ওদিক তাকাই . . .। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'কেষ্টনগরের পুতুল', ২০১৫ক : ৮০৪)

উদ্ধৃতাংশে ছেলেটির মানসিক শূন্যতার পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার লক্ষণীয় – সেটা হলো তার ভীতি। রুমালের টুকরো নাড়াচাড়া করার সময় তার বোধোদয় হয় যে, এটি একটি অনুচিত কাজ এবং এই কাজ অন্য কারো চোখে পড়া বিব্রতকর। যৌবনের উন্মেষপর্বে যৌনচেতনা কিশোর বয়সের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। বয়ঃসন্ধিকালের এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলে কিশোরেরা লজ্জিত ও বিব্রত থাকে, অপরাধবোধে ভোগে। এই উপমহাদেশের সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশে এ সম্পর্কে কিশোরদের পর্যাপ্ত জ্ঞানলাভের অপ্রতুলতা তাদের এই অস্বস্তিকর অবস্থার প্রধান কারণ। বয়ঃসন্ধির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হলেও এই প্রসঙ্গে খোলামেলা আলাপচারিতার মাধ্যমেই তাদের এই আড়ষ্টতা দূর করা যায়। বর্তমানে কোনো কোনো বিদ্যালয় অবশ্য এই সংক্রান্ত জ্ঞানদানে সচেতন ভূমিকা পালন করছে, যা বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যাগুলোর সমাধানে অনেকটাই কার্যকর। পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-মনোবিজ্ঞান বিষয়ক লেখক অসীম বর্ধন এ প্রসঙ্গে বলেন :

> কিশোর বয়সে যখন ছেলে-মেয়েদের দেহে যৌনতার উন্মেষ ঘটতে থাকে, তখন অবশ্যই তা নিয়ে তারা কৌতূহলী হবে। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার পথে বড়দের সহায়তা পাওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বড়রা সহায়তা করে না, বরং কৌতূহল দমন করতেই চেষ্টা করেন। তাই ছেলেমেয়েরা যৌনতা সম্পর্কে পাপবোধই গড়ে তোলে। (অসীম বর্ধন ১৯৯৯ : ৩৯)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিশোর চরিত্রের যৌনতা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন – 'তাঁর সৃষ্ট সমস্ত কিশোর চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিমজ্জন ঘটেছে নারীদেহে, নারী দেহভাবনায়, নারীসঙ্গ কামনায়, অন্ততপক্ষে রমণীর অনুগ্রহে' (নিতাই বসু ১৪১৬ ব. : ৩২৭)। কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রত্যক্ষ, কোথাও প্রেমের মোড়কে, কোথাও-বা মুহূর্তের আলোড়নে জ্যোতিরিন্দ্রের কিশোরদের যৌনাকাঙ্ক্ষা প্রকটিত হয়। অনেক সময় এর কারণ তারা উপলব্ধি করতে পারে, আবার এ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে কখনো কখনো তা তাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতা কেবল নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি শরীরী আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর রচনায় যৌনতা বহুমাত্রিক। তিনি তা দেখিয়েছেন সূক্ষ্ম অথচ তীব্রতর করে। অতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে যৌনতার রকমফের ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে ওঠে তাঁর রচনায়। আর কিশোরদের যৌনতার ক্ষেত্রে কোনো কোনো গল্পে আদিমতার বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। ইতঃপূর্বে আলোচিত 'কেষ্টনগরের পুতুল' গল্পে এই আদিমতা ইঙ্গিতময়তায় প্রকাশিত হলেও 'খেলোয়াড়' (*শালিক কি চড়ুই* ১৯৫৪) গল্পে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন সুপ্রযুক্ত চিত্রকল্পে :

> . . . ওই বয়সের মেয়ের উরু দুটোও কম যাচ্ছিল কী। যেন দেখছিলাম সোনালি দুটো থাম। অল্প সরু হয়ে নীচের দিকে নেমে এসেছে।
>
> এখানেও মাংসের ঠাসবুনোনি। তবে মসৃণতা বেশি। বেশি ঝকঝকে। সোনালি থামের মাথায় লাল ফ্রকের কুচিটা সাপের গায়ের মতন কিলবিল করছিল। . . .
>
> এবং মেয়ের শরীর দেখে আমাদের মনে হয়েছিল যেন রিং-করা কি কডলিভার-খাওয়া তেজি শরীর। টন্‌কো। মাজাঘষা। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খেলোয়াড়', ২০১৫ক : ১২৮)

পরবর্তীকালে মেয়েটির সঙ্গে এবং তার মায়ের সঙ্গে কিশোর গুর্খার আচরণে আরো প্রকটিত হয় এই আদিম যৌনতা। দুরন্ত কিশোর খেলার অজুহাতে মধ্যবয়সী নারীর আবেদনময় সৌন্দর্যের সামনে নির্দ্বিধায় দাঁড়িয়েছে, খেলার সুবিধা হবে জানিয়ে তাকে 'বডিজ' খুলে খেলার পরামর্শ দিয়েছে। প্রজাপতি-ধরা সেই খেলার ছলে সেই নারীকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত করে দিয়ে আদিমতার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়েছে

গুর্খা। বয়ঃসন্ধিকালের এই ধরনের অযাচিত আচরণে কাম-তাড়নার উপস্থিতি লক্ষ করে অসীম বর্ধন এই ব্যাপারটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করেন তা দেখা যাক :

> কিশোর বয়সের শুরু হতেই ছেলে-মেয়ের দেহের মধ্যে বিভিন্ন অন্তঃক্ষরী গ্রন্থিগুলি থেকে যে সব রস ক্ষরণের সূচনা হয়, সেগুলোর প্রভাবে তাদের আবেগ-প্রক্ষোভের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, যে পরিবর্তনের ওপর তাদের নিজেদেরও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এই জন্যই এই বয়সে যৌন অনুভূতি এবং দুঃসাহসিকতার প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে, অথচ শরীর বিকাশ সেই অনুপাতে দ্রুত বৃদ্ধি পায় না। তার ফলে, তাদের আচরণে ফুটে ওঠে সামঞ্জস্যের অভাব। (অসীম বর্ধন ১৯৯৯ : ১০২)

বয়ঃসন্ধিক্ষণের পাঁচ কিশোরের যৌনচেতনার খবর জানাতে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কথক কিশোরের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেন :

> বলতে কী, সেদিন থেকে, তারপর থেকে এ ধরনের খেলাই যেন আমরা মনে মনে খুঁজতুম। এমন সুন্দর হাস্যরসিকা মহিলার দেখা আর একটিও পাইনি। ক'টাই বা বাড়ি ছিল তখন ও-পাড়ায়। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খেলোয়াড়', ২০১৫ক : ১৩২)

অবশ্য গল্পে মোনার মায়ের প্রশ্রয়টুকুও ধর্তব্যে আনা প্রয়োজন। তার প্রচ্ছন্ন সম্মতি না থাকলে এমন দুঃসাহসিক পদক্ষেপ নিতে হয়তো সংকোচ বোধ করত গুর্খা। পরবর্তী পর্যায়ে, কথক কিশোরের বয়ান অনুযায়ী ছেলের দল এমন সাহসী খেলোয়াড়ই খুঁজত, এবং সেই প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সন্ধান পেলে তাদের নিজেদের তরফ থেকে খেলোয়াড় নির্বাচিত হতো গুর্খাই। বেয়াড়া গুর্খার সুঠাম দেহ এবং তার সাহসিকতাকে ভয় কিংবা সমীহ করত বলে তাকেই দলনেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে তারা। আর তাই এমন খেলোয়াড়ের সঙ্গে গুর্খার প্রতিপক্ষতাকেই দর্শক হিসেবে দেখে তারা আনন্দ লাভ করত, যার নেপথ্যেও ক্রিয়াশীল থাকত যৌনতার প্রচ্ছন্ন তাড়না। গুর্খার মতো দুঃসাহসী হওয়ার মন্ত্র তাদের অজানা থাকা এবং এমন পদক্ষেপ নেওয়ার মানসিক ও শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও বয়ঃসন্ধিকালীন এই সহজাত যৌন-ফ্যান্টাসি স্বাভাবিকভাবেই তাদের এমন ভাবনার খোরাক জোগায়। ছেলের দলের এই অক্ষম মানসিকতা এবং যৌনতা সম্পর্কে তাদের স্বভাবসুলভ কৌতূহলের তীব্রতাকে গল্পকার গ্রথিত করে গেছেন সুনিপুণ শিল্পিত বয়ানে। অবশ্য এ নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি তিনি, কিছু ইঙ্গিত দিয়ে কাহিনির পরিসমাপ্তি টানার ভার পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে গল্পের পরতে পরতে কথক কিশোরের বয়ানে এটুকু স্পষ্ট করেছেন যে, যৌনতা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব তাদের এ বিষয়ে অতি উৎসাহী ও আগ্রাসী করে তুলছে কখনো কখনো। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বালক-বালিকা-কিশোর-কিশোরীরা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মহানগরীর জটিল জীবনে দরিদ্র সংসারের বাচ্চারা দ্রুত ফেলে আসতে বাধ্য হয় তাদের সারল্যের দিনগুলি। চতুর, নির্মম, স্বার্থশ্লিষ্ট পৃথিবী তাদের অল্প বয়সেই চিনিয়ে দেয় বড়োদের পৃথিবীর স্বরূপ – যেখানে তারা বঞ্চিত ও অবহেলিত। সেই সঙ্গেই যৌনবাসনার সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটে যায় তীব্রভাবে। বালক-বালিকাদের স্বাভাবিক যৌন-বোধ বস্তির জীবনে, ফুটপাথের বসবাসে – অসময়ে, বিকৃতভাবে পরিপক্ব হয়ে উঠতে থাকে। সেই ছেলেমেয়েদের আশ্চর্য পূর্ণতায় গড়ে তোলার ক্ষমতা রাখেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। (সুমিতা চক্রবর্তী ২০১০ : ১৩)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বুটকি ছুটকি' (*প্রিয় অপ্রিয়* ১৯৫৭) গল্পটি দুই কিশোরী বোনের নারীত্ব অর্জনের গল্প হলেও গল্পের কাঠামো-বিন্যাসে স্থান পেয়েছে তাদের কৈশোরের একটা বড় অংশ। তাছাড়া একটা নির্দিষ্ট বয়সের গণ্ডির মধ্যে কৈশোরের সীমারেখা বেঁধে দিলে অভিজ্ঞতার অর্জনকে খাটো করা হয়। সময়ের নিঃশব্দ তরঙ্গ সব পরিস্থিতিতে, সবার জীবনে সমানভাবে এগোয় না। আনন্দদায়ক, উৎসাহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতায় মনের প্রাণশক্তি যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি যন্ত্রণাদায়ক, হতাশাব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা জীবনীশক্তি শুষে নেয়, যাপনের প্রতিটি অধ্যায়কে ধ্বস্ত করে জীবনকে দিশেহারা করে তোলে। আবার নারীত্ব নিজেই জীবন-গ্রন্থের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়, যে যৌবনের উপর ভর করে বাঁচে বলে তৃষ্ণার্তের মতো সময়ের ভাগ কেড়ে নেয় কৈশোর আর প্রৌঢ়ত্ব থেকে। 'বুটকি ছুটকি' গল্পে দুই বোন কৈশোরের মাঝামাঝি থেকেই যৌবনের ঘ্রাণ পেয়ে গিয়েছিল। নিজেদের আসন্ন যৌবনের গন্ধে আপ্লুত হওয়া সত্ত্বেও তারা বুঝতে পারছিল না এই মাতাল ঘ্রাণ কোথা থেকে আসছে, কিন্তু প্রতিবেশীদের শিকারি চাহনি থেকে ধারণা করতে পারছিল যে, যৌবনের এই উন্মাতাল সুগন্ধ তাদের জন্য বিপদজনক।

আকস্মিকভাবে মা মারা যাওয়ায় বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে এই বিপদ থেকে তাদের রক্ষার করার মতো কেউ ছিল না। কিন্তু নারীর সহজাত পূর্বজ্ঞান তাদের প্রতিনিয়ত সতর্ক করত বলে তারা অনুমান করতে পারত, মদন হালুই কেন তাদের অল্প পয়সায় বেশি বেশি অমৃত-গজা-রাজভোগ খেতে দেয়, কেন সম্প্রতি বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ইলেকট্রিক দোকানের মালিকের ছেলে মানিকদা চোখ দিয়ে তাদের শরীর পরখ করতে করতে বিনা পয়সায় টেবিল ল্যাম্প দিয়ে দিতে চায়।

মায়ের মৃত্যুর পর প্রতিরোধের নড়বড়ে ঢালটাও হারিয়ে ফেলে নিজেদের রক্ষা করার জন্য তারা স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। যদিও তাদের স্বপ্ন-কল্পনা তখনও বাঁধনহারা, তবুও ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নিজেদের আটকে রাখতে শিখে নিচ্ছিল তারা। লেখকের ভাষায় :

> বুটকি ছুটকির যখন সময় কাটে না শুয়ে শুয়ে, দেয়ালের বুকে দু'বছর আগে পড়ার আধুনিক উপন্যাস-গল্পের চরিত্রগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে চেয়ে থাকে। এখানে ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের অন্ধকার গলির তেরো টাকা বাড়ির ভাড়াটে প্রতাপ কম্পোজিটারের ঘরে তার সতেরো-আঠারো বছরের দুই মেয়ে এদের নিয়ে এত মগ্ন, আধুনিক গল্পলেখকদের তা জানবার কথা নয়। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বুটকি ছুটকি', ২০১৫ক : ৫৬২)

মনকে বেঁধে রাখতে শিখলেও শরীরের জেগে ওঠাকে আটকাতে পারে না তারা। তাই নিজেদের অজান্তে এই দুই বোন পরস্পরের শরীর জাগরণের সাক্ষী হয়। তারা জানে না, কীসের তাড়নায় তাদের শরীর ভেতরে ভেতরে জেগে উঠছে; তারা শুধু জানে দুজন দুজনের জীবনের অংশীদার, পরস্পরের আশ্রয়। তাই কোনো এক রাতে তাদের বাবার ফিরতে দেরি হওয়ার সুযোগে ছুটকি বুটকির উরু দুটো জড়িয়ে বুক দিয়ে চেপে ধরে কান্না করে।

লেখকের বয়ানে যেন সমপ্রেমের মাত্রা পায় তাদের এই আবেগ। যৌবনের উন্মেষপর্বে স্বেচ্ছাবন্দিত্বের এই আশাহীনতা তাদের হতাশ করে তোলে। এখানেই গল্পটির বিষাদময় সমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু গল্পকার আশার বাণী দিয়ে গল্পের পরিসমাপ্তি টানেন – 'আশা, আশা নিয়ে বেঁচে থাক বুটকি, ওতেও সুখ আছে, আমি তো –' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'বুটকি ছুটকি', ২০১৫ক : ৫৬৬)। তারা হয়তো জানে না রাত্রির অন্ধকার গহ্বরে জেগে থাকা যৌবনবতী দুটি কুমারীর জীবনে আলোর মশাল নিয়ে কোনো রাজপুত্রের আগমন ঘটবে কি না, কিন্তু তারপরও 'আশা নিয়ে বেঁচে থাকা'র মধ্যেই তারা খুঁজে পেতে চায় বেঁচে থাকার রসদ। সম্ভাবনার পথ যতই অপরিসর হোক না কেন, এই আশাই হয়তো তাদের ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের অন্ধকার কুঠুরিতে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে। লেখক সুনিপুণ কৌশলে উদ্ভিন্নযৌবনা দুই বোনের অবরুদ্ধ যৌবনের করুণ হাহাকারকে চিত্রিত করেছেন, গল্পের ইতি টেনেছেন জীবনবাদিতার ইতিবাচকতায়। শ্লীল-অশ্লীলের তথাকথিত মানদণ্ডকে সরিয়ে রেখে আত্মপ্রেম, যৌবন-সৌন্দর্য আর জীবনবাদের এক অসামান্য আখ্যান হয়ে উঠেছে 'বুটকি ছুটকি'।

মানুষের মূল জীবনে উপনীত হওয়ার প্রথম ধাপ কৈশোর। পরবর্তী জীবনের বাঁকবদলের নকশাটির প্রথম পরিমার্জনা শুরু হয় কৈশোরের খেরোখাতায়। জীবনের এই পর্যায়ে এসে শৈশবের কাদামাটির তাল ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করে। পরিস্থিতির তারতম্যের কারণে কৈশোরের প্রথম লগ্নেই অনেকে নানা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে ওঠে, আবার কেউ কেউ কৈশোর পেরোলেও কিশোর থেকে যায় মনোজগতের অপরিপক্বতায়, অভিজ্ঞতার অভাবে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যেহেতু তাঁর বহু গল্পে সমস্যা-জর্জরিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির কথা লিখেছেন সেহেতু তাঁর গল্পের বেশিরভাগ কিশোর চরিত্রই এসব সমস্যার

স্রোতে কোনোমতে গা ভাসিয়ে টিকে আছে। আর আছে বাবা-মা কর্তৃক পরিত্যক্ত টোকাই শ্রেণির দু-একজন, যারা এই অকূলপাথারে দিব্যি রপ্ত করে নিয়েছে ভেসে থাকার বিদ্যা। 'পালিশ' (*ট্যাক্সিওয়ালা* ১৯৫৬) গল্পের কিশোর মন্নু এমনই একজন। তার মা তাকে ছেড়ে, তার বস্তি ছেড়ে, করিমুদ্দির পাকা বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। বাপ তার রোজগারের পয়সায় মদ্যপান করে। এমনকি নিজের বস্তিতেও থাকতে পারে না সে বাপের যন্ত্রণায়। তবুও তেলকল করার জন্য কোনো এক সুখনলাল তার বস্তি গুঁড়িয়ে দেবে বলে ছোট্ট দেহটায় বিক্ষোভের লাল আগুন জ্বলে ওঠে। কথক নিজের জুতো পালিশ করাতে গিয়ে মন্নুর সংস্পর্শে এসে তার ভেতরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সম্পর্কে ধারণা পায়। তার বয়ানে :

> না, না পারুক সে বস্তিতে নিজের ঘরে গিয়ে রাত্রে একটু মাথা গুঁজতে। বাপ পয়সা কেড়ে নেয় মদ খেতে, খেয়ালি মা ছেড়ে গেছে ওকে। এসব নিজের কথা। ব্যক্তিগত। এখন ওর কাছে বড় দল। অগ্রণীর বঞ্চনা। বিদ্রোহের ঘূর্ণাবর্তে অভিমানের বুদবুদ ওঠে না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পালিশ', ২০১৫ক: ৩৩৫)

ঘটনাক্রমে পুনরায় মন্নুর সঙ্গে দেখা হলে এই কিশোরের মেজাজে মন্থরতা লক্ষ করে কথক। সেখানে গতদিনের আবেগের স্ফূরণ অনুপস্থিত। পার্কে বেড়াতে আসা সুন্দরী বাঙালি মহিলার কুকুরের বেল্ট, ছেলেমেয়েদের জুতা-স্যান্ডেল পালিশ করে আট আনা বকশিশ পেয়ে তার চোখে আজ অন্য স্বপ্ন খেলা করে। মন্নুর সঙ্গে যেচে ভাব জমাতে গেলে তার নিরাসক্ত উত্তরে কথক অবাক হয়, আগের দিনের বিপ্লবের আগুন নিভে জল হয়ে আছে। ব্যক্তিগত বিক্ষোভ যেখানে সমষ্টিগত বিক্ষোভে পরিণত হওয়ার কথা, সেই বিক্ষোভের স্ফুলিঙ্গ একরাতের মধ্যেই নিভে কয়লা। সে কথকের সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথা বলে। জানায়, বাঙালি নারী সুন্দরী হয়। এতে উপলব্ধি করতে বেগ পেতে হয় না যে, পার্কে আসা সুন্দরী বাঙালি রমণীটির অবয়ব তখনও তার মন থেকে মুছে যায়নি।

মন্নুর অবাঙালি বাবা বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছিল। মন্নু সেই মায়েরই সন্তান। কিন্তু তার মা তাদের ছেড়ে অবলীলায় অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়েছে বলে তাদের বস্তিতে তার বাবাকে নিয়ে এখনো ঠাট্টা-তামাশা করে অনেকে। মায়ের অনভিপ্রেত আচরণের কারণে মন্নুর বাবা মন্নুকেও সহ্য করতে পারে না। বাঙালি মায়ের কারণে মন্নুর জীবনে এত দুর্ভোগ নেমে এলেও মন্নু তার ক্ষুদ্র জীবনের অভিজ্ঞতায় জেনে গেছে তাদের মতো নিচু শ্রেণির অবাঙালি সমাজে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করার মধ্যে এক ধরনের সুপ্ত গৌরব আছে, দেখানোপনা আছে। সেইসঙ্গে আরো আছে বাঙালি নারীর শারীরিক সৌন্দর্য। তাই যে মন্নু আগের দেখায় কথকের কাছে বিপ্লবের বীজমন্ত্রে বলিয়ান তেজী কিশোর রূপে হাজির হয়েছিল পরবর্তী সাক্ষাতে সে-ই নিস্তেজ রূপে প্রতিভাত হয়। কথক তাকে ছেলেমানুষ জ্ঞান করে তাতে অবশ্য আশাহত হন না। কিন্তু কথককে চমকে দেওয়ার জন্য অন্য বিস্ময় সাজিয়ে রেখেছেন লেখক। তাই গল্পের শেষে

যখন মন্নু বলে – 'বাঙ্গালি জেনানা খুপসরত; আমি বাঙ্গালিনি সাদি করব' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'পালিশ', ২০১৫ক : ৩৩৭), তখন অপ্রস্তুত কথক অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শ্রেণিসংঘাতের কারণে বিধ্বস্ত কিশোরের সংগ্রামী চেতনার ঊর্ধ্বে কিশোর-মানসের বৈচিত্র্যময় রূপটিও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে 'পালিশ' গল্পে।

কিশোর-মনস্তত্ত্বকে উপজীব্য করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি মনোজ্ঞ গল্প 'আরসি' (*উল্টোরথ* ১৮৯৫ শকাব্দ)। সদ্য বারোয় পা দেওয়া কিশোর ঘনীভূত হয়ে ওঠা পারিবারিক সংকটে কী ধরনের আচরণ করতে পারে এবং সেই সংকটকে কতটা পরিশীলিতভাবে অনুপুঙ্খসমেত প্রকাশ করা যায় তারই দৃষ্টান্ত গল্পটি।

উত্তম পুরুষে বর্ণিত এই গল্পে কিশোর ছেলেটি, যে নিচতলার ভল্টুর মাসির কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে প্রতিদিন বিকেলে ফুচকা বা অন্যান্য খাবার খেতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায় এবং অকারণে হাসে, ভল্টুর মাসির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেও নিজের বাবাকে মনে মনে 'দত্ত সাহেব' সম্বোধন করে এবং প্রায়ই আয়নায় নিজেকে দেখে; দেখে বুঝতে চায় কখন তার মুখে গোঁফ গজাবে। এরকম স্বভাব আগে ছিল না তার; ছয় মাস আগে ছোট বোনটাকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তার মধ্যে এই স্বভাবের জন্ম দিয়ে গেছে তার মা।

ভল্টুর মাসি শোভনা এখন তার ছোট বোন টুমটুমের দেখভাল করলেও সহজাত প্রবণতা দিয়ে কিশোর বুঝতে পারে, মাসির আচরণ এখন আর আগের মতো নেই। একদা মায়ের সঙ্গে মাসির হৃদ্যতাপূর্ণ সময় কাটানো এবং অফিস থেকে তার বাবার ফিরে আসার সময় হলে তাড়াহুড়ায় পালিয়ে যেতে চাওয়া এই মাসিই ইদানীং বাবার আসার সময় হলে পয়সা দিয়ে নাশতা খাওয়ানোর অজুহাতে কথক কিশোরকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়। মায়ের মৃত্যুর পর এসব নতুন অভিজ্ঞতা কিশোরের মনের বয়স হু-হু করে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। নিজের চেহারায়ও সেই বয়সের ছাপ পড়ে কি না তা দেখতেই হয়তো কিশোর উতলা হয়ে সবখানে আয়না খুঁজত। তাছাড়া আত্মপরিচয়ের যে ধোঁয়াশা তার চারদিকে ঘনিয়ে উঠছে তার চেহারা সেটির কোনো চিহ্ন বহন করছে কি না তাও জানা সম্ভবত কিশোরের পক্ষে জরুরি হয়ে উঠেছিল।

টুমটুমের বয়স মাত্র ছয় মাস। বাবার আর শোভনা মাসির আচরণে এটা স্পষ্ট যে, তারা দুজনের কেউই এখন আর শিশু-কিশোর দুটির তোয়াক্কা করে না। মাসি আর বাবার মনোমালিন্যে টুমটুমের দেখভালের অবহেলায় কিশোরটিকেই অপটু হাতে ছোট বোনের যত্নআত্তি করতে হয়। বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কিশোরের উপলব্ধি হয়, ছোটবোনের জন্য, এমনকি তার নিজের জন্যও তার দ্রুত বড় হওয়া প্রয়োজন। মাসি এই মুহূর্তে টুমটুমের দেখভাল করলেও কিশোর জানে যে, সে সময় ফুরোতে সময়

লাগবে না বেশি। সে সাবালক না হয়ে উঠলে ধেয়ে আসা চতুর্মুখী বিপদ থেকে নিজেকে এবং ছোট বোনটিকে রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

সময় নয়, সংকটই বরং মানুষকে দ্রুত বড় করে তোলে, অভিজ্ঞ করে তোলে; নিজস্ব রচনাকৌশলে লেখক এই সত্যকে, দর্শনকে মূর্ত করে তুলেছেন তাঁর 'আরসি' গল্পে। কাহিনি বর্ণনায় সংসারের কাঁদুনি না গেয়ে, দুঃখ-দুর্দশার ছাঁচে ফেলা বিবরণকে অস্বীকার করে, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে তাদের সমগ্রতা-সহ ধারণ করে, সুনির্মিত গদ্যে নান্দনিকভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক :

> পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তার পাশের এক একটা দোকানের আরসিতে মুখটা দেখতে দেখতে বড় বড় পা ফেলে সিনেমা হলটার দিকে এগুতে লাগলাম। আমি সাবালক হয়ে গেছি এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আরসি', ১৮৯৫ শকাব্দ : ৬৪১)

গল্পটিতে কিশোর-মনস্তত্ত্বের আরেকটি রহস্যাবৃত কক্ষে উঁকি দিয়েছেন লেখক, সেটি হলো যখন তখন কিশোরটির হাসি :

> শুনে আপনারা হাসবেন জানি।
>
> এবং যেমন আমিও কারো কারো কাজ-কারবার দেখে ভীষণ হাসি। যখন-তখন আমার হাসি পায়। . . . তক্ষুনি ঘরে ফিরে দেখি দত্তসাহেব এসে গেছে। দেখে আমার কী হাসি! . . . তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হয়, মা মরে গিয়ে দুটো জিনিস আমায় দিয়ে গেছে – উপহার দেওয়ার মতো আর কি, আয়নায় বার বার মুখ দেখা ও কারণে-অকারণে দাঁত ছড়িয়ে হাসা। হুঁ, আরো একটা জিনিস উপহার পেয়েছি, বাবাকে দত্তসাহেব বলা। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আরসি', ১৮৯৫ শকাব্দ : ৬৩১)

পরিস্থির বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে এই হাসি, পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে আয়না, আর 'দত্তসাহেব' সম্বোধন পিতা-পুত্রের বর্তমান মানসিক দূরত্বকে নির্দেশ করছে। শ্লেষাত্মক বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এক কিশোরের সংকটময় জীবনযন্ত্রণার ব্যতিক্রমী প্রকাশ গল্পটিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছে।

কৈশোরের এমন অবস্থা বিবেচনা করে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মনঃসমীক্ষক আলফ্রেড অ্যাডলারের 'ক্ষতিপূরণ তত্ত্বে'র (The concept of compansation) বিশ্লেষণ করে বলেন :

> মানব শিশুর অসহায়ত্ব তাকে জন্মমুহূর্ত থেকেই হীনম্মন্যতাবোধে আচ্ছন্ন করে এবং শৈশব থেকেই হীনম্মন্যতা ও দৈন্যবোধ দূর করার চেষ্টায়, নিজের অসহায়ত্ব ক্ষতিপূরণ প্রচেষ্টায় সে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ঔপরিকম্মন্যতা (superiority complex) লাভের উপায় ও পদ্ধতি নিজের জৈবিক ধর্ম (Biological endowments) অনুযায়ী ও শৈশবের পরিবেশ অনুযায়ী শিশু আয়ত্ত করে। (ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৯৫ : ১০৬)

'আরসি'র মতোই নান্দনিক গদ্যশৈলীর প্রয়োগে কিশোর-মনস্তত্ত্বের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় লেখকের 'রাক্ষসী' (*পতঙ্গ* ১৯৬১) গল্পে। এটি নিমকি নামের চৌদ্দ বছরের একটি মেয়ের কিশোরী থেকে রাক্ষসী হয়ে ওঠার গল্প।

মদ্যপ পিতা আর বিধবা পিসিকে নিয়ে নিমকির পরিবার। দারিদ্র্য ও অসংযমে সম্পর্কের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে পিতা আর পিসি দুজনই তার কাছে দূরের মানুষ হয়ে উঠতে থাকে দিন দিন। আর কেউ নেই বলে ঘরের অন্যান্য কাজকর্মের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিন ছোটখাটো বাজারসদাইও করতে হয় তাকে। আবার যথাসময়ে ফিরে না এলে গঞ্জনাও সইতে হয়। তাই দ্রুত বাড়ি ফেরার জন্য প্রায়ই একটা অন্ধকার গলি বেছে নেয় নিমকি। বাড়ি ফিরতে সময় কম নিলেও এই গলি দিয়ে যেতে ভয় হয় তার, কারণ সে শুনেছে সেখানে ঝাঁকড়া কদম গাছটায় একটা ভূত থাকে, যে মানুষের ঘাড় মটকে দেয়। ভূতটাকে নিমকি দেখতেও পায় একদিন। এমনকি দৌড়ে পালিয়ে আসার সময় ভূতটার হাতে সাদা মতন কি যেন একটা জিনিসও দেখে ফেলে সে একমুহূর্তে। সেই ভূত যেন তাকে দেওয়ার জন্যই হাতের মুঠোয় করে নিয়ে এসেছিল জিনিসটা। বিছানায় শুয়ে ঘামতে ঘামতে নিমকি নিজেকে প্রবোধ দেয়। লেখকের ভাষায় :

> নিমকি শুনেছে ভূত মানুষকে কিছু করে না। তোমরা ভূত দেখে ভয় পাও তাই ভূতেরা তোমাদের ভয় দেখায়। আসলে ভূতেরা খুব ভাল লোক। যদি তুমি একবার সাহস করে ওদের কাছে যেতে পার, ওরা তোমাকে এমন জিনিস দেবে, যা তুমি টাকাকড়ি দিয়েও কিনতে পার না। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'রাক্ষসী', ১৯৮২ : ১৩৪)

পরদিন নিমকি আবারও একই পথ ধরলে ওই ভূতের সঙ্গে তার পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে। আজ আর গতদিনের মতো ভয় পায় না সে। ভূতটা তাকে ঘুটঘুটে অন্ধকারে টেনে নিয়ে যেতে চায়। নিমকি যেতে রাজি না হলে সাদা মতো জিনিসটা তার হাতে গুঁজে দিয়ে পরদিন আবার আসার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেয়।

ভয় জিতে পাওয়া সাদামতো জিনিসটি অর্থাৎ পাঁচ টাকার নোটটি নিয়ে বাড়ি ফিরতেই মদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে সেটি কেড়ে নেয় তার বাবা শশী। কিন্তু টাকাটা সে কোথায় পেল তা নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল জন্মায় না। বরং ঘটে যাওয়া ঘটনাকে মেনে নিয়ে নিমকিকে কাঁদতে বারণ করে দেয় পিসি।

সহজাত প্রবৃত্তিবশে নিমকিও জানত ভূতটা আদতে কী, কী চায় তার কাছে। উপহার পেতে যাতে ঝক্কি না হয় সেজন্য সে নিজেও সুন্দর জামা পরে, টিপ দিয়ে, বেণি বেঁধে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেই গিয়েছিল ভূতের গলিতে। মূলত তার আসন্ন যৌবনই প্রলুব্ধ করে তাকে সেখানে যেতে। তবুও শেষমুহূর্তে সে নিজেকে রক্ষা করেছে, ভূতটাকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পরদিন সেই পথে পা না মাড়াতে মনস্থির করেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পর যাদের তাকে ভূতের হাত থেকে রক্ষা করার কথা ছিল টাকা পেয়ে তারা বরং খুশি হয়ে ওঠে, এমনকি পিসি পাঁচ টাকার নোটটাকে নিমকির রোজগারের টাকা বলে বিষয়টাকে সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যান্য দিনের মতো তারা যদি তাকে তিরস্কার করত, মারত, তাহলেও তার ভালো লাগত; এতটা অসহায় লাগত না, নিজেকে রাক্ষসী মনে হতো না। ভূতের থাবার মধ্যে ঠেলে দিয়ে আপনজনেরাই কিশোরী নিমকিকে রাক্ষসী বানিয়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য :

> . . . রাক্ষসী গল্পে এই মনোবিকার অন্য মাত্রা পেল। যখন এক নারীর কবর খননে হাত লাগায় মাতৃসমা অন্য এক নারী। . . . কাজেই নিমকি যদি তার পিসিকে ঘৃণা করে, বাবা তথা সমগ্র পুরুষ সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করে, প্রতিটি ক্ষত লেহন করে সাত হাত লম্বা জিব বার করে, তাহলে তাকে বোধহয় নারী বলা যায় না। সে তখন রক্ত প্রত্যাশী রাক্ষসী হয়ে উঠতে পারে। কারণ এই বিদ্বেষ কিংবা বিতৃষ্ণা সবই তার আত্মা থেকে সঞ্চারিত। সে আগে নিজের আত্মার পীড়ন সহ্য করেছে। আপন আত্মার আর্তনাদ কান পেতে শুনেছে। তারপর এক ভয়ংকর বিবমিষা থেকে নিমকি আবিষ্কার করেছে ‘তার কান দুটো গরম হয়ে গেছে। হাত দিয়ে চোখের জল মুছে ও ভাবে। তবে কি সত্য নিমকি আর নিমকি নেই, একটা রাক্ষসী হয়ে গেছে?’ (রঞ্জনা দত্ত ২০০২ : ১৬০)

কিশোর-মনের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষাগুলোর প্রকাশ ঘটানোর মাধ্যমে কথাসাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে কৈশোর ও তারুণ্যের সন্ধিক্ষণের সমস্ত ইঙ্গিতকে পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর কিশোরেরা তারুণ্যের কাছে পৌঁছতেই কৈশোরকাল ব্যয় করে দিতে চায় যেন; না বুঝে না জেনে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির বশে সকল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে চায়। তাদের এই অস্থিরতা, যৌনকাতরতা, অসহিষ্ণুতাকে

যুগসন্ধির চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে কৈশোরের অপার রহস্যের মর্মোদ্‌ঘাটন করেছেন লেখক। কিশোর-মানসের উপর ভিত্তি করে রচিত তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প 'শ্বাপদ'-এর (*শ্বাপদ, শয়তান ও রূপালী মাছেরা* ১৩৭০ ব.) ক্ষেত্রেও এই বক্তব্য প্রযোজ্য।

ফাঁপা আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ শহুরে কিশোর গ্রাম থেকে তাদের পরিবারে আশ্রয় নিতে আসা মাসতুতো ভাইয়ের উপর বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতে গিয়ে নিজেই পরাস্ত হয়। বায়বীয় আভিজাত্যে নিজের চারপাশ আবৃত করে নেওয়া এই কিশোর তার শ্রেণিসর্বস্বতার ক্ষমতা মাপতে চেয়েছিল গেঁয়ো ভাইটিকে বলির পাঁঠা বানিয়ে :

> আমার বুদ্ধির শিকল দিয়ে একে বেঁধে রেখেছি, তখন আর ভয় কি! বরং নতুন একটা খেলা হবে। আর একটু দেখে শিখে গেঁয়োটা কতটা অগ্রসর হয় মজা দেখা যাবে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'শ্বাপদ', ২০১৫খ : ১৫১)

নিজের গণ্ডিতে আটকে থাকা কিশোর গেঁয়ো ভাইকে নিয়ে মুক্ত প্রকৃতিতে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলে পরিস্থিতি আমূল পাল্টে যায়। তার উদ্দেশ্য ছিল ভাইটিকে দিয়ে প্রেমিকার জন্য পদ্মফুল তোলানো, পেয়ারা-কামরাঙা পাড়িয়ে নেওয়া। সেইসঙ্গে প্রেমিকাকে দেখানো কীভাবে বুনো জানোয়ারকে পোষ মানিয়ে নিজের বশে রেখেছে সে। তার এই নৃশংস আনন্দ অচিরেই বিষাদে পর্যবসিত হয়। ফুল-ফল পাড়ার জন্য ভাই আর প্রেমিকাকে বনের মাঝে বিচরণ করতে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানতে থাকা শহুরে কিশোরটি হঠাৎ আবিষ্কার করে তার প্রেমিকা রুবি ও গেঁয়ো ভাই গণেশ দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে গেছে। হতবিহ্বল হয়ে সে একাই বেরিয়ে আসে জঙ্গল থেকে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তার বোধোদয় ঘটে – যাকে সে পোষা কুকুরের মতো বশ করে রাখতে চেয়েছিল সেই গেঁয়ো বুনো ভাইটি তার সহজাত বিচরণের ক্ষেত্র বনের মাঝে শ্বাপদ হয়ে উঠে তারই অহংকে সংহার করেছে। প্রতিটি সত্তা তার স্বক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক – এই বক্তব্যই মূর্ত হয়ে উঠেছে 'শ্বাপদ' গল্পে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে সাধারণত নাগরিক কোলাহলে জর্জরিত আড়ষ্ট চরিত্রেরা মুক্ত পরিবেশে এলে পাল্টে যায়। প্রকৃতির সান্নিধ্যে সকল সম্মোহন কেটে যায় তাদের, আদিম তাড়নাগুলো উজ্জীবিত হয়ে ওঠে কখনো কখনো। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন – 'তিনি দেখিয়েছেন জঙ্গলের মধ্যে এসে মানুষের মনে জাগে ইতিহাস পূর্বকালের সুখ ও আদিম মুক্তজীবনের কথা। তার লোভ বাসনাও তখন দৈত্যাকার প্রবল' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৪২৩ ব. : ৩৩)। এই পর্যবেক্ষণটি জ্যোতিরিন্দ্রের 'শ্বাপদ' গল্পের গেঁয়ো কিশোর গণেশ ও শহুরে কিশোরটির প্রেমিকা রুবির আচরণের পর্যালোচনায় প্রাসঙ্গিক।

‘শ্বাপদ’ গল্পটির একই ছক পুনর্ব্যবহার করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পরবর্তীকালে রচনা করেন *আজ কোথায় যাবেন* (১৯৮০) গল্পগ্রন্থভুক্ত ‘ভালো ছেলে খারাপ ছেলে’ শীর্ষক গল্পটি। ‘শ্বাপদ’-এর মতো এই গল্পটিও মূলত সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ দুই ভাইয়ের কাহিনি। এখানে তারা আপন ভাই। এদের মধ্যে বড় ভাই অরুণ খারাপ হওয়ার প্রবল আত্মবিশ্বাসে আরো খারাপ হতে সংকল্পবদ্ধ। কেবলমাত্র নিজে মন্দ হওয়ার মধ্যে তার এই আনন্দ সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না সে, ছোট ভাই বরুণকে খারাপ হওয়ার দীক্ষা দিয়ে নিজের অহমিকাকে আরো পরিপুষ্ট করে তুলতে চায়। দেখিয়ে দিতে চায়, অঙ্ক বইয়ে মুখ গুঁজে রেখে জীবনকে উপভোগ করা যায় না, সত্যিকারের জীবনের স্বাদ পেতে হলে ‘রোদ ঝলমলে ভরদুপুরে উড়নচণ্ডীর মতো পাড়ায় মহল্লায়’ ঘুরতে হয়, একাধিক প্রেমিকা থাকতে হয়। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে পড়ার বই নিয়ে চিরকাল কেউ ঘরে বসে থাকতে ভালোবাসে না। তার বয়ানে :

> কারো সঙ্গে মিশলাম না, কারো সঙ্গে কথা বললাম না, কোনোদিকে তাকালাম না। সারাদিন ঘরে বসে অঙ্কের বই নিয়ে থাকব, এভাবে গার্ল ফ্রেন্ড জোটানো যায় না। মুশকিল। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘ভালো ছেলে খারাপ ছেলে’, ১৯৮০ : ১১৩)

রোমাঞ্চকর কথার ফাঁদে ফেলে এক দুপুরবেলা ছোটভাই বরুণকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। সিগারেট খেতে দেয়, গোলাপ ছিঁড়ে আনতে বলে অন্যের বাগান থেকে। তাদের পোষা কুকুর বাহাদুরকে শেখাবার মতো করে নিজের আপন ছোট ভাইকে গড়েপিটে নিতে চায় খারাপ হওয়ার বিদ্যায়। অবশ্য বরুণের চাইতে বাহাদুরের সম্মান আরেকটু বেশি অরুণের কাছে। বাহাদুরের তুলনায় ‘ঈশান স্কলার’ হতে চাওয়া ছোটভাই বরুণকে তার ভীরু কাপুরুষ বলে মনে হয়।

অরুণের চাপাচাপি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনে অনেকটা বাধ্য হয়ে বরুণ এক বাড়ির বাগানে ফুল ছিঁড়তে গিয়ে আর ফিরছে না দেখে প্রথমে চিন্তিত পরে শঙ্কিত হয়ে ওঠে অরুণ। ভাইকে নিজের পথে এনে মা-বাবার কাছে নিজের দোষকে লাঘব করার এই হীন বুদ্ধি হিতে বিপরীত হয়ে উঠতে পারে, এমন আশঙ্কা হয় তার। তার এই অমূলক ভয়কে নস্যাৎ করে একটু পর একটি মেয়ের হাত ধরে বরুণ ফিরে এলে অরুণ আশ্চর্য ও কিঞ্চিৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। এবারও সে বরুণকে ভয় দেখিয়ে কালক্ষেপণের কারণ জানতে চাইলে বরুণ উত্তর দেয়, মেয়েটি অঙ্কে কাঁচা বলে সে তাকে অঙ্ক দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অরুণ এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয় না; আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে বরুণ জানায়, মেয়েটিকে সে চুমুও খেয়েছে।

বরুণের এই বিজয়ী উচ্চারণে অরুণের কল্পনাবিলাসী ফাঁপা জগৎ যেন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে। তার প্রবল আত্মবিশ্বাস কর্পূরের মতো উবে গিয়ে দুর্বল মানুষে পরিণত হয় সে। হাত থেকে খসে-পড়া কলম-ছুরিটা তুলে নিয়ে ফেরত দিতে গেলে বরুণের উদ্দেশ্যে সে বলে – ‘তুই ওটা রেখে দে, তোর ছুরির

দরকার। আমার চেয়ে তুই অনেক বেশি ডাকাত' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ভালো ছেলে খারাপ ছেলে', ১৯৮০: ১৩২)। এই গল্পটি 'শ্বাপদ' গল্পের মতো উত্তীর্ণ না হলেও তারুণ্যের ইশারা অনুধাবনের ব্যর্থতা কিশোর-মানসকে কতটা ব্যাকুল, কতটা কাতর করে তোলে, তার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে।

তবে কৈশোরকালের নারী প্রসঙ্গে এই দ্বিধাদ্বন্দ্বময় মানসিকতায় কোনো প্রকার পূর্বপরিচয় ছাড়া প্রথম সাক্ষাতেই অঙ্ক শেখানোর সময় চুম্বনের ব্যাপারটি কতটা বাস্তবসম্মত তা নিয়ে সমালোচনার অবকাশ থাকতে পারে। প্রথম পরিচয়েই এমন অনাড়ষ্ট কৈশোরের আরেক উদাহরণ হতে পারে 'সোনালি দিন' (*আজ কোথায় যাবেন* ১৯৮০) গল্পটি। বয়োবৃদ্ধ চারুবাবুর সঙ্গে গল্পের আধুনিকা কিশোরীটির সপ্রতিভ ও প্রগল্ভ আচরণে অবশ্য এটিও মনে হয় যে, কৈশোর হলো জীবনের সেই অধ্যায় যখন বাস্তবতাকে তোয়াক্কা না করার স্পর্ধা দেখানো যায়। তবে এটিও ঠিক, এমন চটপটে ও আত্মবিশ্বাসী কিশোরীর চারুবাবুর মতো বয়োবৃদ্ধকে এতদূর প্রশ্রয় দেওয়া (মেয়েটির সঙ্গে মন্দির দর্শনের অনুমতি দেওয়া, চারুবাবুর অযাচিত কৌতূহলকে শান্তভাবে নিবৃত্ত করা) কতটা বাস্তবানুগ তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'এক ঝাঁক দেবশিশু' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১) গল্পটিও কিশোর-মনস্তত্ত্ব কেন্দ্রিক আখ্যানের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নবর্গের সমবেত কিশোরের বঞ্চনা ও বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে গল্পটিতে। বড়লোকের গাড়ি রাস্তায় বিকল হয়ে গেলে পরিচয়হীন একপাল পথশিশু মনের আনন্দে গ্যারেজ পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায় গাড়িগুলো। চকচকে মোটরগাড়ি হাত দিয়ে ছুঁতে পারার আনন্দে প্রতিদান ছাড়াই তারা হাসিমুখে এই পরিশ্রমটুকু করে। বিনিময়ে কিছুই পায় না। এমনকি উৎসব-অনুষ্ঠানে বড়লোকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও তাদের ভাগ্যে কিছু জোটে না। একেবারেই কিছু জোটে না বললে সত্যের অপলাপ হবে। দালানের উপর থেকে উচ্চবিত্ত পরিবারের স্ত্রী-কন্যাদের ছিটিয়ে দেওয়া পানের পিক, শিশুদের প্রস্রাব তাদের শরীর ভিজিয়ে দেয়। তাদের কুকুর লালুও বঞ্চিত হয় না বিত্তবানদের এমন অযাচিত উপহার থেকে। তার গায়ে-পিঠেও গরম জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আয়নার ও-পিঠের এমন কুৎসিত চেহারা দেখে তারা অবাক হলেও হাসি বন্ধ হয় না তাদের, পুনরায় রাস্তায় ফিরে গিয়ে বিকল হয়ে যাওয়া গাড়ি ঠেলতে লেগে যায় চরম উৎসাহে।

কিন্তু এবার আর গাড়ি নিয়ে তারা গ্যারেজে থামে না। গ্যারেজ পার করে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে খাদের দিকে। আতঙ্কিত বাবুর আর্তনাদ শুনেও দেবশিশুরা নির্বিকার ও দৃঢ়সংকল্প থাকে – বিকল হয়ে গেলে ঠেলে এগিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যে গাড়ি তাদের কোনো কাজে আসে না, আস্তাকুঁড়ই সে গাড়ির উপযুক্ত স্থান। সমগ্র সমাজব্যবস্থার প্রতীক হয়ে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে ঠেকে গিয়ে ঝনঝন শব্দ করে থেমে যায় গাড়িটা। বনেট দুমড়েমুচড়ে যায়, উইন্ডশিল্ডের কাচ ভেঙে যায়, বাবুর মাথা যায়

ফেটে। গল্পটি কিশোর-মানসের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্যান্য গল্পের চেয়ে আলাদা স্বরের। এমন শ্রেণিচেতনার দর্শন তাঁর গল্পে দুর্লভ। এদিক থেকে সাতচল্লিশ-পরবর্তী কথাকার শওকত আলীর (১৯৩৬-২০১৮) 'শুন হে লক্ষীন্দর' (১৯৮৮), 'সোজা রাস্তা' (১৯৮৮) প্রভৃতি গল্পের পূর্বসূরি 'এক ঝাঁক দেবশিশু'। সমালোচকও গল্পটিকে শ্রেণিবিরোধের গল্প হিসেবে আখ্যা দিয়ে বলেন :

> এক ঝাঁক দেবশিশুকেও বলা যায় শ্রেণিবিরোধের গল্প। বাবুর মোটর গাড়ি রাস্তায় বিকল হয়ে অনড় হয়ে গেল। কীভাবে পৌঁছবেন তিনি গারাজে? সাহায্য চাই সেইসব রাস্তার ছেলেদের যাদের 'বকের ঠ্যাঙের মতো লিকলিকে হাত পা মুরগির ঠ্যাঙের মতো সরু সরু শিড়দাঁড়া' হলেও গাড়ি ঠেলে নিয়ে যেতে পারে। (অশ্রুকুমার সিকদার ১৪১৬ ব. : ৪১৯)

সমাজ নামক গাড়িটাকে ঠেলে তারা যেমন গ্যারেজে নিয়ে যেতে পারে তেমনি ঠেলতে ঠেলতে খাদের গহ্বরেও ফেলে দিতে পারে। এই অহম আর শ্রেণিসচেতনতার বিচারে 'এক ঝাঁক দেবশিশু' জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিরল একটি গল্প, যেখানে প্রতিবাদের ঝান্ডা সমাজের রক্ষচক্ষু উপেক্ষা করে স্বমহিমায় উড্ডীন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' (*মহীয়সী* ১৯৬১) গল্পটিও কিশোর-মানস কেন্দ্রিক আখ্যানের নিদর্শন যেখানে দুই শ্রেণির দুটি কিশোরের মানস-জগৎকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে নিরীক্ষণ করে গল্পে স্থান দিয়েছেন লেখক। উচ্চবিত্তের গৃহ থেকে চাকরি হারানো মদন নামের জনৈক কিশোরের অবনমন ঘটে এক নিম্নমধ্যবিত্তের গৃহে। পূর্বের মনিব সম্পর্কে বিষোদ্গার করে সে যেন পূর্ববর্তী অপমানেরই প্রতিশোধ নিতে চায়। ইতোমধ্যে বর্তমান গৃহে তার সমবয়সী আরেক কিশোরের সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলে দুজনে মিলে কথক কিশোর মিন্টুর সদ্য লাগানো পেঁপে চারাটির যত্ন নিতে থাকে। বাগানটিকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে পুরাতন গৃহ হতে মদন আরো কিছু গাছের চারা চুরি করার ফন্দি আঁটে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। চাকরি খোয়ানো এবং গাছ চুরির ব্যর্থতার যুগপৎ আক্রোশে একদিন প্রাক্তন গৃহকর্তার পুত্র সুকুমারের গায়ে রাস্তার নোংরা জল ছিটিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পড়ে আটক হয় সেই গৃহে। মিন্টুর পরিবার মদনের সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে শঙ্কিত থাকলেও দিনশেষে মদনের মাধ্যমেই তারা সেই গৃহে তার পুনর্বহালের সংবাদ পায়। মিন্টুর পরিবার কষ্ট পেলেও দরিদ্র মদনের দিক চিন্তা করে এখানেই গল্পটির সমাপ্তি টানতে পারতেন গল্পকার। কিন্তু তিনি গল্পের কাঠামোতে কাহিনির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হন না, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বহুরৈখিকতাকে বুনন ও বিন্যাসের স্তরপরম্পরায় উন্মোচিত করেন। কিশোর-মনের গোপন কুঠুরির সংবাদ জানানোর ক্ষেত্রেও তিনি এই কৌশলের আশ্রয় নেন।

মিন্টু প্রচণ্ড আঘাত পেলেও পরিস্থিতিগত কারণে মদনের পূর্বগৃহে ফিরে যাওয়া অযৌক্তিক নয়, বরং মিন্টুদের বাড়িতে সুকুমারদের বাড়ির তুলনায় পারিশ্রমিকের অপ্রতুলতায় তার প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। মদন দরিদ্র কিশোর। আন্তরিকতার চেয়ে অর্থের স্বস্তিই তার কাছে অধিকতর কাম্য, তদুপরি সুকুমারদের বাড়ির উন্নত খাবারদাবারের সুবিধাও এর মধ্যে ধর্তব্য। কিন্তু লেখক মদনের কার্যকলাপের মাধ্যমে তার যে মানস উদ্‌ঘাটন করেছেন তাতে মনে হয় তার ক্ষেত্রে কেবল এই কারণগুলোই যথেষ্ট নয়। লক্ষণীয়, মদন চাকরি ফিরে পেয়েও সন্তুষ্ট থাকে না; মিন্টুদের বাড়ি থেকে পেঁপে চারাটি চুরি করে এনে সুকুমারদের সাজানো বাগানকে আরো সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। পরিস্থিতির চাপে মদন আত্মস্থ করে নিয়েছে – যখন যে জায়গায় তার ঠাঁই, সেই জায়গাই তার নিজের। সে কারণেই মিন্টুদের বাড়িতে থাকাকালীন সময়েও সে মিন্টুদের বাগানকেই নিজের ভেবে সেটিকে সুন্দর করতে চেয়েছে। কিন্তু সুকুমারদের বাড়িতে ফিরে এসে সেই চারাটিই চুরি করে এনেছে সুকুমারদের বাগানের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য। অথচ একটিবারও ভাবেনি সুকুমারদের বাগান প্রাচুর্যে ভরা আর মিন্টুদের এক পেঁপে চারাই সম্বল। এখানে উল্লেখ্য, প্রাচুর্যের বিশেষ এক শক্তি রয়েছে। ভালো বেতন ও উন্নত খাবারের যেমন শক্তি আছে, তেমনি ঐশ্বর্যের জাঁকজমকও প্রচলিত মানদণ্ডে শক্তিশালী। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ মানুষ একে ভয় করে, মান্য করে, সমীহ করে; সর্বোপরি এর কাছে সমর্পিত হতে পছন্দ করে। মদনও তার ব্যতিক্রম নয়। কেবল নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নয়, এ বাড়ির প্রাচুর্যের মোহ যা আদতে কোনোভাবেই তার প্রাপ্য নয় এবং যে সম্পর্কে সে সচেতনও বটে, সেই মোহই তাকে টেনে এনেছে এখানে, গল্পের উপান্তে এসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যা আরো স্পষ্ট করে তোলেন মিন্টুর মনোভঙ্গি তুলে ধরতে গিয়ে। গল্পের প্রয়োজনে সুকুমারের সঙ্গে মিন্টুর সখ্য গড়ে উঠলে উভয়ের বাড়িতে উভয়ের যাতায়াত ঘটে। সুকুমারদের গৃহের সুস্বাদু নাশতা, তার মায়ের আতিথেয়তা ও সুকোমল ভঙ্গি মিন্টুর মনেও সুকুমারদের বাড়ির প্রতি একটা তীব্র মোহ তৈরি করে দেয়, যদিও তার হৃদয়ের এই আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে প্রথমদিকে সে সচেতন ছিল না। কিন্তু এক পর্যায়ে তার মোহমুক্তি ঘটে, বলা চলে মিন্টুই জোরপূর্বক এ থেকে নিজের মোক্ষলাভ ঘটায়, নিজেদের পেঁপে চারাটিকে সুকুমারের বাগানে ফলবতী গাছ হয়ে বেড়ে উঠতে দেখে। সতেজ যৌবনের লাবণ্যে ভরা দীর্ঘকায় এই গাছটাই তাকে এরপর থেকে বেশি টানতে থাকলে তার একসময় উপলব্ধি হয়, সেও মদনের মতো ধীরে ধীরে আটকে পড়ছে সুকুমারদের ঐশ্বর্যের গোলকধাঁধায়। সুকুমারদের আভিজাত্য, তার মায়ের নিপাট পোশাকের সৌন্দর্য আর আপ্যায়নের আন্তরিকতায় সে ভুলতে বসেছিল তাদের শ্রীহীন ঘরকে, তার রোগাক্রান্ত মাকে। লেখক যে শিল্পিত ভাষাভঙ্গিতে এই কিশোরের মনস্তাত্ত্বিক বিলোড়নকে উপস্থাপন করেন তা পর্যবেক্ষণ করা যাক :

মদন পেঁপেচারাটা চুরি করে নিয়ে যায়নি। আমার বারবার মনে হচ্ছিল পেঁপেচারাটাই মদনকে আমাদের বাড়ি থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কেবল মদনকে না, আমাকেও, না হলে আমাদের ছোট উঠোন, টিনের ঘর, ছায়া-ঢাকা ডুমুরতলার কথা ভুলে গিয়ে আমি সারাক্ষণ সুকুমারদের বাড়িতে বাগানে পড়ে থাকব কেন। . . .

'কাঁদছিস কেন!' ব্যস্ত হয়ে মা শুধোয়। আমি কথা বলি না। আমি কি বলতে পারতাম রোগা ময়লা কাপড় পরা তোমার শুকনো মুখের কথা ভুলে গিয়ে ও-বাড়ির শাড়িগয়না-পরা প্রগল্‌ভ-স্বাস্থ্য সুকুমারের মা'র দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কখন তিনি সাদা পাথরের বাটিতে করে আমাকে ও সুকুমারকে আপেল আনারস কেটে দেবেন সেই সোনা-ঝরা বিকেলের অপেক্ষায় আমি শুকিয়ে থাকতাম – থাকতে আরম্ভ করেছি।

আর কোনওদিন আমি ও-বাড়ি যাইনি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চোর', ২০১৫ক : ৭০৫)

একটি পেঁপে চারার অবস্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিন্টু নিজের অবস্থান উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যায় :

আদতে পেঁপেচারা এক মহৎ চোর। একটি ছোট্ট ছেলেকে ফিরিয়ে দেয় তার প্রত্যয়ভূমি। মিন্টুর প্রখর সংবেদনশীলতাই 'চোর' গল্পের একমাত্র বাস্তুজমি। যে জমিতে দাঁড়িয়ে ঐশ্বর্যের চটুল হাতছানিকে উপেক্ষা করা যায়। (রঞ্জনা দত্ত ২০০২ : ৩৯)

একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন শ্রেণির, ভিন্ন পরিবেশের দুটি কিশোরের ভাবনা ও মননের অনুরণন সূক্ষ্মভাবে তুলে এনে লেখক যার যার অবস্থানের নিরিখে গভীর জীবনদর্শনের চিহ্ন এঁকে দিয়েছেন গল্পটিতে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য কিশোর-মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'সার্কাস' (*পার্বতীপুরের বিকেল* ১৯৫৯)। এই গল্পটা তাঁর অন্যান্য কিশোর-কেন্দ্রিক গল্পের চেয়ে বিষয়-ভাবনা ও উপস্থাপনভঙ্গিতে কিছুটা ভিন্ন। সার্কাস দেখা এবং সার্কাসের পেছনের কুশীলবদের তত্ত্ব-তালাশের অন্তরালে মফস্বলের স্কুলপড়ুয়া সরল বালকদের অনুসন্ধিৎসু কিশোর-মন উন্মোচিত হয়েছে এখানে। কিশোরদের কেন্দ্র করে লেখা তাঁর অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পে তেমন জোরালো কোনো কাহিনি নেই। শেষের চমকটুকু বাদ দিলে কিশোর বয়সের স্নিগ্ধতার পরিচ্ছন্ন আমেজ দিয়ে পুরো গল্পটা মোড়ানো।

স্কুল মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ে বলে স্কুলপড়ুয়া কৌতূহলী কিশোরেরা সার্কাসের অনেক খুঁটিনাটি জেনে নেয়; দেখে নেয় সার্কাসের হাতি-ঘোড়া-বাঘ-ভল্লুক আর এদের যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের। হাতি যার গায়ের উপর উঠে দাঁড়ায়, বাঘের মুখের মধ্যে যে মাথা গলিয়ে দেয়, সবাইকে অবাক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেও সত্যিকার সার্কাস না দেখা পর্যন্ত তাদের বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। বালকদের মধ্যে অরুণ ফার্স্ট শো দেখার গৌরব অর্জন করায় বন্ধুমহলে তার কদর বেড়ে যায় রাতারাতি। অরুণের কাছ থেকে তারিয়ে তারিয়ে শো-এর গল্প শোনার লোভে তার মনরক্ষার জন্য সবাই তৎপর হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অন্যরাও শেষ প্রদর্শনীটি দেখার সুযোগ পায়। কিন্তু শো-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বাঘের খেলাটা থেকে বঞ্চিত হয় তারা। সার্কাসের প্রধান প্রফেসর রামগতি সবিনয়ে দর্শকদের জানান, বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দেওয়ার খেলা দেখাবার প্রধান কুশীলব স্যামুয়েল দাস অসুস্থ হয়ে পড়ায় সেই খেলাটা সেদিন আর প্রদর্শিত হবে না। তাদের জন্য আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সেদিন। প্রফেসর রামগতি গায়ের উপর হাতি ওঠার খেলা দেখাতে গিয়ে মারা যান শেষ শো-তে। পরবর্তীকালে জানা যায় বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দেওয়া স্যামুয়েল দাস রামগতির সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল শো-এর দিন বিকেলে।

সেদিনের সরল কিশোরেরা রামগতির মৃত্যু নিয়ে ভাবিত না হলেও পরবর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই স্মৃতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে কথক বুঝতে পারে – রামগতির মৃত্যু মোটেও দুর্ঘটনা ছিল না, আত্মহত্যা ছিল। স্ত্রীর কাছ থেকে পাওয়া আঘাতে অপমানিত হয়ে প্রফেসর রামগতি ব্যথার উপশমের অন্য উপায় না পেয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার এমন একটি পথ বেছে নেন যা এক কিশোর-মনকে দারুণভাবে আলোড়িত করেছিল। আত্মহত্যার জন্য বেছে নেওয়া সেই পথ প্রফেসর রামগতির সার্কাসের রুটিন খেলার অংশ ছিল। যে খেলা তাঁকে বিত্ত, প্রতিপত্তি, পৌরুষের সম্মান আর আনন্দ নিয়ে বেঁচে থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে, স্ত্রী কর্তৃক অপাঙ্‌ক্তেয় ঘোষিত হওয়ার পর সেই স্ত্রীহীন খেলাই তার পৌরুষকে অসম্মানিত করে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করেছে। হাতির পিঠে স্ত্রীকে বসিয়ে সেই হাতিকে বুকের উপর উঠিয়ে যে রামগতি এতদিন বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই রামগতিই স্ত্রীকে হারিয়ে সেই খেলায় নিজেকে কাপুরুষ মানতে অপরাগ হয়ে হাতিকে বুকের উপর উঠিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন বীরের মতোই। বালকদের একজন পূর্ণবয়সে সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে রামগতির মৃত্যুকে মহিমান্বিত করে তোলে।

রামগতির মৃত্যুর ঘটনাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখার সুযোগ আছে। এটা হয়তো আত্মহত্যা ছিল না, তবে একে নিছক দুর্ঘটনা বললেও সরলীকরণ করা হবে। স্ত্রী-সহ হাতিকে পিঠে নেওয়ার খেলা নিঃসন্দেহে বীরত্বব্যঞ্জক খেলা। এতে প্রকটভাবে রামগতির পৌরুষ প্রকাশিত। কিন্তু সেদিন স্যামুয়েল দাসের সঙ্গে স্ত্রী চলে যাওয়ায় তাঁর পৌরুষ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। মানসিকভাবে নিদারুণ বিধ্বস্ত হন তিনি;

ফলে এতদিন ধরে বিপুল বিক্রমে যেই খেলা দেখিয়ে এসেছেন, সেদিন স্ত্রীর ভার কমে গিয়ে কেবল হাতির ভার বহন করে সেই খেলার দেখাবার শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাও ছিল না তাঁর। খেলাটা দেখানোর ইচ্ছে থাকলেও হয়তো উদ্যমের অভাবে রামগতি সেদিন হাতির ভার বহনে অসমর্থ হন, ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিশোর-মানসকে কেন্দ্র করে রচিত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথমদিকের আরেকটি গল্প 'খাকি' (*খেলনা* ১৯৪৬)। একইসঙ্গে দুটো স্রোত এসে মিলেছে যেন এই গল্পটিতে। একদিকে গ্রামের সহজ স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করে দিয়ে খাকি উর্দি পরিহিত বিদেশি সৈন্যদের আগ্রাসন, অন্যদিকে একটি অবোধ প্রাণীকে ঘিরে একজন কিশোরের শঙ্কা। সাধারণ গ্রামটি এখন আর নিশ্চুপ মাঝিপাড়া নেই, বিদেশি সৈন্যদের যাওয়া-আসা আর ঠাঁই গাড়াতে গ্রামটি তার মাধুর্য হারিয়ে ম্রিয়মাণ হতে বসেছে। মনসুর সেই গাঁয়ের ছেলে, বহু কষ্টে তার প্রিয় রাজহাঁস বাদশাকে লুকিয়ে রেখেছে। এবার যেসব সৈন্য ব্যারাকে এসেছে তাদের মাংসপ্রিয়তা, বিশেষ করে হাঁসের মাংসের প্রতি লোভ, মনসুরকে শঙ্কিত করে তোলে। সে তার পাতিহাঁসগুলো বিক্রি শেষ করে এনেছে প্রায়, সব বিক্রি হয়ে গেলে পরিবারের একমাত্র সদস্য চাচি আর প্রিয় বাদশাকে নিয়ে গ্রাম ছাড়বে। মনসুর বুঝতে পারে হাঁসের অভাবে বিদেশি সৈন্যরা বাদশার দিকে লোভাতুর দৃষ্টি দেবে। সৈন্যেরা বেতের জঙ্গল সাফ করে একটু একটু করে তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে প্রতিদিন। সেখান থেকেই তারা প্রায়শই হাঁস কেনার জন্য দুর্বোধ্য ভাষায় আলাপচারিতা চালিয়ে যায়। হাঁস ফুরিয়ে যাওয়ায় এমনকি তারা বিল থেকে বালিহাঁস মেরে আনছে। কিন্তু তাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে সে বাদশাকে রক্ষা করতে পারে না শেষ পর্যন্ত। মাংসভুক বিদেশি সৈন্যদের লোভের বলি হয় তার প্রাণপ্রিয় রাজহাঁসটি।

যে মনসুর পাঁচ টাকা দরে পাতিহাঁসের বিপরীতে পাঁচশো টাকায়ও বাদশাকে বিক্রি না করার ঘোষণা দেয় এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছাড়ার অঙ্গীকার করে, সে মনসুর সৈন্যদের লোভ আর আগ্নেয়াস্ত্র থেকে তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। পেশীশক্তিতে এদের কাছে সে নগণ্য জেনেই এদের কাছ থেকে বাদশাকে লুকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। সৈন্যদের গুলির আঘাতে বন্ধুসম পোষা প্রাণীটি শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত 'মহেশ' (১৯২৬) গল্পে অবোধ প্রাণীর সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার যে দরদী চিত্র অঙ্কন করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রের 'খাকি' গল্পটিতে তার অনুরণন পাওয়া যায়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কিশোরদের প্রধান করে আরো বেশ কিছু গল্প লিখেছেন, যেখানে কাহিনির পথরেখা অনুসরণ করে পাঠক কিশোর-মনের বাঁকবদলগুলো কখনো সরাসরি দেখতে পেয়েছে, কখনো অনুমান করে নিয়েছে, আবার কখনো-বা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে

সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। আবার তাঁর অনেকগুলো গল্প সরাসরি কিশোর-কেন্দ্রিক না হওয়া সত্ত্বেও কিশোর চরিত্রগুলোর স্বল্পকালীন উপস্থিতি গল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

'সমতল' গল্পে যেমন দশ বছর বয়সী কৈশোর ছুঁইছুঁই একটি ছেলে কয়েক মুহূর্তের জন্য এসে পুরো গল্পটার অর্থ পাল্টে দিয়ে যায় তার একটিমাত্র বাক্যে – 'তার চেয়ে এক কাজ করো না, . . . আমাদের পাড়ায় উঠে এসো, রোজ সেখানে অনেক বাবু আসেন, দিদির তো এখন অনেক ভাল ভাল শাড়ি' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সমতল', ২০১৫ক : ৪১)। জীবনের অভিঘাত সরল বিশ্বাসী বালকটিকে তখনও বিধ্বস্ত করেনি হয়তো, কিন্তু এ অভিশপ্ত জীবন পরবর্তীকালে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে তার বর্তমান অবস্থাকে, এই সত্যটি সম্পর্কে অসচেতন কিশোর পার্কে তার সঙ্গে গল্প করতে থাকা দিদির বয়সী মেয়েটিকে অনায়াসে নিজের দিদির মতো বাবুদের বাহুলগ্না হওয়ার পরামর্শ দেয়। আবার 'সিংহরাশি' গল্পে এগারো বছর বয়সী মালবিকা নামের এক কিশোরী চরিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যে এরই মধ্যে জীবনের অনেক খানাখন্দ চিনে নিয়েছে। নতুন প্রতিবেশীর সঙ্গে সখ্য হওয়া মাত্রই তার কাছ থেকে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করে নিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে সে। ইঁচড়েপাকার মতো সে তার পরিবারের অনেক তথ্য মা-বাবার মন্তব্য-সহ নির্দ্বিধায় বলতে থাকে। সে জানে, এখনো এক বছর না-পেরোনো তার ছোট বোন সাগরিকা তার চেয়ে ঢের কালো বলে তার বিয়ে দিতে কষ্ট হবে ভবিষ্যতে; লক্ষ্মীর আসন বিছানোর জন্য ছোট জলচৌকি জোগাড় না হলে কথকের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া ইট বিছিয়ে আসন বানানো যাবে। তার পরিবারে সংকীর্ণতার এমন স্বাভাবিক চর্চা চলে বলেই সে শিশুর সারল্যে এসব তথ্য অনায়াসে সদ্যপরিচিত কথককে বলে অকালপক্বতার পরিচয় দেয়। পরিবার আর পরিবেশের প্রভাবে মেয়েটির কিশোর-মানস অঙ্কুরেই এভাবে বিনষ্ট হতে শুরু করেছে।

'সিংহরাশি' গল্পের এক্স ডেটেন্যু সুধীরের মতো 'গানের ফুল' গল্পে অঙ্কের মাস্টার জলধরবাবুকে দেখা যায়, যিনি নিজের মতো করে জীবনের অঙ্কের উত্তর লিখে অঙ্ক মিলে গেছে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। অথচ তাঁর দেড় থেকে এগারো বছর বয়সের সাত সাতটি সন্তান কবিতা-গান শুনিয়ে অনেকটা জোর করেই খাবার আদায় করছে অন্যের কাছ থেকে, যা তিনি না দেখার ভান করছেন অনায়াসে। এই কবিতা-গানগুলোও তাদের বাবা-মায়ের নির্বাচন করে দেওয়া, যা জলধরবাবুর ভুল দর্শনকে মহিমান্বিত করার উদ্দেশ্যে শেখানো।

গল্পটিতে সে অর্থে কিশোর-মানসের ক্রমিক উন্মোচনের ছাপ না থাকলেও দু-একটি অনুষঙ্গ থেকে সাতটি শিশু-কিশোরের আশু পরিণতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাদের আচরণে সেই সময়ের পরিবার, সমাজ ব্যবস্থা, জীবনাচরণের অস্বাভাবিকতা প্রকট হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কিশোরেরা কৈশোরের স্বাভাবিক পরিক্রমা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। কেননা তিনি প্রায়শই সেইসব কিশোরের উপর তাঁর অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন যারা মানসিক ও সামাজিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আবার এও সত্য, বয়ঃসন্ধিকালে কিশোরদের মনোজগতে প্রবল পরিবর্তন ঘটে; তারা বড় হওয়ার পথটাকে দ্রুত অতিক্রম করে যেতে চায়, সেইসব কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি তারা আকৃষ্ট হয় যেগুলো তাদের বয়সীদের জন্য তখনও নিষিদ্ধ। সমালোচক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই কিশোরদের সম্পর্কে লিখেছেন – 'শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বয়ঃসন্ধির সচেতনতায় তাদের মনে যে আবিলতা এসে বাসা বাঁধে, জ্যোতিরিন্দ্রের প্রায় সমস্ত কিশোর চরিত্র তার প্রমাণ' (নিতাই বসু ১৪১৬ ব. : ৩২৭)। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও কিশোর-মানসের মর্মোদ্ভেদের আণুবীক্ষণিক ক্ষমতা লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবস্থানকে যেমন দৃঢ় করে তুলেছে তেমনি তাঁর কিশোর চরিত্রদের দান করেছে বিশিষ্টতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কিশোরেরা দশ থেকে উনিশ বছর বয়সী এবং বয়সের সহজাত প্রবণতা অনুসারেই গল্পে তাদের আচরণ নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে নির্মিত হয়েছে তাদের চরিত্র এবং এগুলো তাদের চরিত্রকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যে কারণে 'বনের রাজা'র মতি গ্রামে এসে নাগরিকতা ভুলে গ্রামীণ সজীবতায় আত্মসমর্পণ করেছে। আবার তাদের কেউ কেউ পারিপার্শ্বিকতার চাপে চটজলদি বড় হয়ে যেতে বাধ্য হয়, যা তারা মেনে নিতে পারে না প্রায়শই। কেউ কেউ নিজের যৌবন-সৌন্দর্যে দিশেহারা হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে এবং সেই হতাশা থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে নেয়। তাঁর সংগ্রামী কিশোরেরা সংগ্রামের মধ্যেই অনুসন্ধান করে বেঁচে থাকার প্রেরণা। এদের মধ্যে যাদের বয়স পনেরো থেকে উনিশ, যৌনচেতনা সম্পর্কে তাদের স্বাভাবিক কিন্তু বিচিত্র মনোভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্যায়ের কিছু গল্প রচিত হয়েছে উত্তম পুরুষের বয়ানে, যা কিশোরদের বহুবিচিত্র মনস্তত্ত্বের অনুপুঙ্খ নিরূপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মোটের উপর লেখকের কিশোরেরা ভাবে ও ভাবনায়, মনে ও মননে বর্তমান সময়েও এতটুকু সেকেলে হয়ে যায়নি। বরং অনেকগুলো গল্পের কাহিনি ও চরিত্রের মানস-গঠন বিবেচনায় নিলে তারা যেন এই সময়ে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, বর্তমান সময়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। একজন মহৎ লেখকের এটাই প্রধান সাফল্য – বর্তমানেও তাঁর গল্পের চরিত্ররা প্রাসঙ্গিকতা হারায় না, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রচনাকালের তুলনায় পরবর্তী সময়েই তারা অধিকতর প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হয়। কিশোর-মনস্তত্ত্বের বহুজটিল ও বহুবঙ্কিম পথরেখা অঙ্কনের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রাগ্রসর এবং আধুনিক এক কথাশিল্পী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ

জীবনের বিভিন্ন পর্বে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিভিন্ন ধাঁচের গল্প রচনা করেছেন। যে জীবন তিনি নিজে যাপন করেছেন, সেই জীবনের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ তাঁর গল্প। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-চেতনার তরঙ্গ পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে গিয়ে কখনো কখনো সেগুলোকে ছাপিয়ে গিয়ে যে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে তাও তাঁর গল্পে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। লেখক যখন যে বয়সে উপনীত হয়েছেন সেই বয়সের ব্যক্তি-মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সময় ও সমাজের কম্পাসে সমবয়সী মানুষের যাপন-পরিধি আঁকার চেষ্টা করেছেন। ফলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শেষ পর্যায়ের (১৯৭৬-১৯৮১) অধিকাংশ গল্পেই বয়োবৃদ্ধ মানুষের স্মৃতিকাতরতা, মৃত্যুচিন্তা, জিজীবিষা, প্রেম ও সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা-সহ তাদের নানা সীমাবদ্ধতা এবং জ্যোতিরিন্দ্রের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনদর্শনের প্রভাব লক্ষণীয়। মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে প্রকাশিত তাঁর *আজ কোথায় যাবেন* (১৯৮০) শীর্ষক গল্পগ্রন্থে এই জীবনদর্শনের সাক্ষাৎ মেলে। এই গ্রন্থভুক্ত 'আজ কোথায় যাবেন', 'সোনালি দিন', 'আম কাঁঠালের ছুটি', 'গোধূলি', 'চশমখোর', 'লেডিজ ঘড়ি', 'গোপন গন্ধ' প্রভৃতি গল্প তাঁর সেই আত্মোপলব্ধির সাহিত্যিক ফসল। এই গ্রন্থটির আঙ্গিক নির্মাণে, বিশেষত 'লেডিজ ঘড়ি', 'আরসোলা', 'গোপন গন্ধ' গল্পগুলোয় তাঁর শেষ বয়সের বিস্তৃত পঠন-পাঠনের ছাপও পরিলক্ষিত হয়।

এই পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর এই পর্বের গল্পগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাঁর গল্পের চরিত্রদের ইত্যাকার উপলব্ধির বৈচিত্র্য অন্বেষণের প্রয়াস নেওয়া হলো।

'আজ কোথায় যাবেন' গল্পে দেখা যায়, কয়েকজন অশীতিপর বৃদ্ধের বৈকালিক ভ্রমণের আড়ালে তাঁদের আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্তি ও অতীত রোমন্থনের সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্যের প্রতি তাঁদের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। কাছাকাছি বয়সের পাঁচ বন্ধুর প্রাত্যহিক ভ্রমণকে কেন্দ্র করে গল্পের সূত্রপাত ঘটলেও পারস্পরিক আলোচনা ও মতামত প্রকাশের মধ্য দিয়ে দিন-দিন নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা হারানোর উষ্মা ফুটে ওঠে। বিশেষ করে গগনবাবু তরুণ প্রজন্মের উপর অহেতুক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, যখন দেখতে পান সিগারেট ফোঁকা 'ইঁচড়েপাকা' সদ্যতরুণ ছেলেগুলোর সঙ্গে নাতনীর বয়েসী মেয়েগুলোও একত্রে এক নৌকায় গঙ্গার হাওয়া খেতে বেরিয়েছে আসন্ন সন্ধ্যায়।

গগনবাবুর এই ক্ষোভের কোনো যৌক্তিক কারণ না থাকলেও বোঝা যায়, তারুণ্যের উদ্দাম উত্তাপ এখনো তাঁকে গোপনে তাড়িত করে। বৈকালিক ভ্রমণ শেষে ফেরার পথে শশ্মান হতে আসা মৃতদেহ পোড়ানোর গন্ধ তাঁকে নিজের অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়, তা মেনে নিতে না পেরে বিরক্ত হয়ে

ওঠেন তিনি। তাঁর মনোজগতে শ্মশানভীতি নয়, বরং উচ্ছ্বসিত তারুণ্যের নৌকা অবিরত দুলতে থাকে, যে নৌকায় তাঁর ঠাঁই নেই, এবং এমন একটি নৌকা নিজে তৈরি করা বা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্যও তাঁর নেই :

> মণ মণ কাঠ পোড়ালেও মনুষ্যদেহের একটি অংশ থেকেই যায়; এই নাভি কিছুতেই পোড়ে না – জন্মের সঙ্গে দেহের সূত্র, তার বিনাশ নেই। এই প্রসঙ্গ উঠলে গগনবাবু বিরক্ত হন, সে কি মৃত্যুভয়ে, না, যৌবনের নৌকাবিহারের রঙিন ছবিটির উপর কোনো ছায়া দিতে চান না বৃদ্ধ, কে জানে। (অনিতা অগ্নিহোত্রী ১৪১৬ ব. : ৪৭২)

আবার 'গোধূলি' গল্পে বিধৃত হয়েছে এক বৃদ্ধের জীবনতৃষ্ণা আর মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষার বৈপরীত্য। মৃত্যুতে মানুষের সকল জীবনযন্ত্রণার অবসান ঘটলেও মৃত্যুভয় মানুষকে আমৃত্যু তাড়িয়ে বেড়ায়। বিশেষ করে জীবনসায়াহ্নে উপনীত আপাতসফল মানুষের মধ্যে এই অলঙ্ঘনীয় সত্যের বোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। বয়োবৃদ্ধ এইসব মানুষের জীবন-ভাবনায় এই চেতনা কীভাবে ভয়ের জাল বিছিয়ে দেয় তা-ই জ্যোতিরিন্দ্রের এই গল্পের প্রধান প্রতিপাদ্য। 'গোধূলি' গল্পের মূল চরিত্র সারদা এমনই একজন। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও জীবনকে উপভোগ করার বিবিধ আয়োজন ও আড়ম্বর তাঁকে সর্বদা প্রাণস্ফূর্তিতে ভরপুর রাখে। সারদার তীব্র জীবনতৃষ্ণা অস্বস্তি জাগায় তাঁর স্ত্রী রাজেশ্বরীর মনে। কিন্তু অকস্মাৎ সারদা নিষ্প্রাণ হয়ে যান। স্বাস্থ্যবান ও সমর্থ সারদা হঠাৎ করে যেন মৃত্যুভাবনায় তাড়িত হন, এবং স্বাভাবিক জীবনাচরণ ছেড়ে নিজেকে আলাদা করে নেন পরিবার-পরিজনের কাছ থেকে। এদিকে তাঁর স্ত্রী রাজেশ্বরীও স্বামীর এই আকস্মিক বৈরাগ্যে হতচকিত হয়ে ওঠেন। বোঝার চেষ্টা করেন মনের অবচেতনে কীসের ইঙ্গিত লুকিয়ে রেখেছেন তাঁর স্বামী। গল্পের শেষে রাজেশ্বরী আবিষ্কার করেন, আপাতভাবে যাঁকে তিনি মৃত্যুর তপস্যা ভেবেছিলেন তা হয়তো প্রকৃত প্রস্তাবে নতুন জীবনের অর্থ খুঁজে নেওয়ার প্রয়াস। রাজেশ্বরীকে এই ভাবনার মাঝে সান্ত্বনা খুঁজতে দিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পাঠককে ভিন্নতর ব্যঞ্জনার সন্ধান দেন। মৃত্যুর কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের বীরত্বব্যঞ্জক এই প্রকাশভঙ্গির আড়ালে মৃত্যুর সর্বময়তার ইঙ্গিতই যেন ঘোষিত হয়েছে এই গল্পে।

সময়চক্রের নিয়মিত পথে চলতে চলতে অকস্মাৎ ভিন্ন পথের যাত্রীতে পরিণত হয় মানুষ। কখনো ভয়, কখনো কৌতূহল, কখনো বিরক্তি, আবার কখনো-বা অর্থহীনতা তাকে নতুন পথে ঠেলে দেয়; অনুসন্ধিৎসু ও রোমাঞ্চিত করে তোলে। আবার কখনো কখনো সম্ভাব্য পরিণতিকে এড়ানো অসম্ভব বলে মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য। স্বেচ্ছায় সমর্পিত হয়। 'গোধূলি' গল্পটিতে মানব-মনের এই অবস্থারই শিল্পসফল রূপায়ণ ঘটেছে।

‘লেডিজ ঘড়ি’ গল্পটিতেও দেখা যায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ উভয় বয়সেরই বহুরৈখিক মানসের বিচিত্র রূপ। কর্মজীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ ও ঘড়ি সারাবার এক প্রৌঢ় মিস্ত্রির পারস্পরিক কথোপকথনে তাদের অবচেতনের গোপন আকাঙ্ক্ষার উদ্‌গিরণ ঘটে গল্পটিতে। লেখকের চরিত্র-চিত্রণের কৌশলে দুজন পরিণতমনস্ক ও সজ্জন মানুষ একটি লেডিজ ঘড়ির সাহচর্যে এসে কীভাবে নিজেদের এতদিনকার শালীনতা ভুলে প্রতিক্রিয়াপ্রবণ হয়ে ওঠে, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, তা-ই গল্পটিতে ফুটে উঠেছে লেখকের ব্যতিক্রমী বয়নকৌশলে।

মানুষের জীবনও ঘড়ির মতোই – সময়কে ঘিরে অনেকটা নির্দিষ্ট নিয়মে বৃত্তাকারে আবর্তিত হয়। সাধারণ সামাজিক মানুষ এই চক্রকে সর্বজনীন জ্ঞান করে জীবনাচরণে তার ব্যত্যয় ঘটায় না সচরাচর। তবে কখনো কখনো এমন সময় আসে যখন ঘড়ির মতোই মানুষের মনও বিকল হয়ে যায় – এতদিনের নিয়মনিষ্ঠ আচরণ ভুলে আটকে পড়া ঘড়ির কাঁটার মতো বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। একটি লেডিজ ঘড়ি, যা হয়তো কোনো রমণীর হাতের শোভা বর্ধন করত, সেই ঘড়ি সারাতে গিয়ে দুজন বন্ধুভাবাপন্ন মানুষের ভাবনার বিরোধ ঘটে এই গল্পে। নিজ নিজ অবস্থানকে সঠিক প্রমাণ করতে মরিয়া দুজনেরই মনোজগতে তীব্র আন্দোলন সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয়েই তা স্বীকার করতে অপরাগ। যৌবনোত্তীর্ণ বয়সে এসে ঘড়িটির স্বত্বাধিকারীর অদেখা অবয়ব তাদের অন্তরে আলোড়ন তুলে বলেই হয়তো ঘড়িটি নিয়ে দুজনের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়; পরস্পরকে দোষারোপ করে তারা নিজেদের অবচেতনের গ্লানিকে অস্বীকার করতে চায়। একজন বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের মনের খোঁজ জানাতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গল্পটিতে পরাবাস্তব ব্যঞ্জনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

যাপিত জীবনের রূঢ় বাস্তবতার বিপরীতে, লোভ-ঘৃণা-ক্রোধ-ভয়ের আগ্রাসী আক্রমণের উল্টোপিঠে মানুষের অন্তিম আশ্রয় স্বপ্ন। বাস্তবতার কশাঘাতে বিক্ষত হয়ে মানুষ এই ছদ্মজগতের, রুদ্ধ প্রলোভনের আশ্রয় নেয়। প্রলোভনের মাঝে এই খণ্ডকালীন বিশ্রাম বা ক্লান্তি মোচনের সামর্থ্য নির্ভর করে আত্মনিয়ন্ত্রণে মানুষের কর্তৃত্বের মাত্রার উপর। কেউ এই ছদ্মজগৎ বা প্রলোভনের গভীরে ডুবতে থাকে, কেউ এর মাঝে অবিরত আসা-যাওয়া করে, কেউ আবার এই প্রলোভনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।

মানুষের স্বপ্ন যেহেতু মূলত ইন্দ্রিয়বাহিত অভিজ্ঞতার নির্যাস, মানুষ তাই তার ইন্দ্রিয়কে নিজের মতো করে প্রস্তুত করে নেয়। ‘চশমখোর’ (১৯৮০) গল্পের বৃদ্ধ ভুবনবাবুও তেমন একজন মানুষ, যাঁর চশমার নতুন লেন্সের মধ্য দিয়ে বাস্তবতার তীক্ষ্ণ কাঁটাগুলো তাঁকে অবিরত বিদ্ধ করে বলে তিনি অনেকসময় ইচ্ছে করেই চশমা খুলে রাখেন। এতে ‘আলোর ডুমটাকে সমুদ্রের শুভ্র মুক্তা, অপূর্ণ চাঁদটাকে পরিপূর্ণ রাজভোগ’ ভাবতে পারেন তিনি, যক্ষ্মাক্রান্ত স্ত্রীকে অতীতের মতো লাবণ্যময়ী রূপে দেখতে সুবিধা

হয় তাঁর। ইন্দ্রিয়জাত একঘেয়ে বাস্তব অনুভূতির পরিবর্তে ভিন্ন আস্বাদ পেতেই স্বেচ্ছায় এমনটা করেন তিনি, যা তাঁর দগ্ধ জীবনের খরতাপকে প্রসন্নতায় ভরিয়ে তোলে :

> খুঁটিয়ে সবকিছু দেখার, দেখতে পাওয়ার লাভ আছে যেমন, লোকসানও প্রচুর আছে। আর কেউ কথাটা না জানুক, ভুবন জেনেছেন – তাই সংসারের কিছু কিছু জিনিস, কোনো কোনো মুখ দেখার সময় তিনি চশমাটা হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন বা পকেটে পুরে রাখেন। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চশমখোর', ১৯৮০ : ১৩৪)

ভুবনবাবু যে সবসময় চোখ থেকে চশমা সরিয়ে রাখতে পারেন তাও নয়। বয়োবৃদ্ধ হলেও তিনি একটি বিপর্যস্ত পরিবারের প্রধান অবলম্বন; পরিবারটিকে যথাসম্ভব চলমান রাখতে তিনি বাস্তবতার খরতাপে তাঁর বৃদ্ধ কাঁধ পেতে রেখেছেন। নিজেকে পুনর্বার প্রস্তুত করে নেওয়ার ফাঁকে এটুকু তাঁর মুহূর্তের বিশ্রাম মাত্র। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তাঁকে চশমা পরে নিতে হয়। লেখকের বয়ানে ভুবনের মনস্তত্ত্ব নিরূপিত হয় :

> ভুবন বুঝতে পারেন তাঁর স্বপ্ন এখন ভাঙবে। পকেটে হাত ঢুকিয়ে চশমাটা মুঠ করে ধরেন তিনি। ঐ অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তাঁর ভাল লাগত। কিন্তু তাঁর ভাল লাগা স্বপ্ন দেখার সঙ্গে সংসারের মন্দ লাগা দুঃস্বপ্ন দেখার অনিবার্য সংঘর্ষগুলি যে লেগেই আছে ভুবন এটাও জানেন। তাই ঘর থেকে ছুটে পালাতে গিয়েও শক্ত হয়ে দাঁড়ান। চশমা জোড়া নাকের উপর বসিয়ে নেন। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চশমখোর', ১৯৮০ : ১৩৪)

ভুবনবাবু পরাজিত নন, তবে তাঁর লড়ে যাওয়ার ক্ষমতা ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। পরিবারের দায়িত্ব যার কাঁধে তুলে দিয়ে অবসরে যাওয়ার কথা ছিল, সেই আত্মধ্বংসী পুত্রটি পরিবারকে বিপন্ন করে বর্তমানে পলাতক। এই অবস্থায় পরিপার্শ্ব যখন ভুবনবাবুকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলে, তখন তিনি মুক্তির পথ খোঁজেন। সেই মুক্তির যাত্রাপথে চশমাবিহীন ছানিপড়া চোখ দুটোই তাঁর প্রধান অবলম্বন। তবু তাঁকে ফিরতে হয়; ফিরে এসে দেখেন তাঁর নাতি দেশলাইয়ের খালি বাক্স দিয়ে বানানো রেলগাড়ির মধ্যে এত এত বাদলাপোকা পুরে খেলাচ্ছলে প্যাসেঞ্জার বানিয়েছে। 'দেবশিশুর মতো নিষ্পাপ সরল এই বালক আসলে তার লম্পট মদ্যপ বেশ্যাসক্ত বাপের চেহারার প্রতিচ্ছবি – তাই তার মুখ দেখার জন্য চশমা ব্যবহার করতে চান না ভুবন' (অনিতা অগ্নিহোত্রী ১৪১৬ ব. : ৪৬৯)। 'চশমখোর' শিরোনামে জ্যোতিরিন্দ্রের আরেকটি গল্প তাঁর *ট্যাক্সিওয়ালা* (১৯৫৬) গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নাম ও বিষয় (চশমা) অভিন্ন হলেও গল্প দুটিতে এর উপস্থিতির তারতম্যে *আজ কোথায় যাবেন* গ্রন্থভুক্ত গল্পটিতে স্বতন্ত্র মাত্রা যোজিত হয়েছে।

সাধারণত বয়োবৃদ্ধ মানুষ স্মৃতিকাতরতা, ভবিষ্যৎ-চিন্তা, মৃত্যুচেতনা প্রভৃতি দ্বারা তাড়িত থাকলেও এর অগোচরে অন্য কারো হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাদের চিত্তকে আন্দোলিত করে। জীবনের প্রতি অপার আগ্রহে অসম্ভব জেনেও পূর্ণতার আস্বাদ কিংবা স্বপ্নের সান্নিধ্য পেতে চায় তাদের হৃদয়। কখনো কখনো সেই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ তৈরি হলেও বয়সের স্থবিরতায় সকলের মন সময়মতো সাড়া দিতে পারে না। অমৃতের আড়ালে গরল উঠে আসতে পারে, এই ভয়ে অনেকে হৃদয়কে জাগাতেই ভয় পায়। তবে বয়স্কদের প্রত্যেকের অন্তঃকরণ আলাদা বলেই হয়তো কেউ কেউ এমনও থাকে যারা মুহূর্তের সুযোগকে প্রশ্রয় দিতে দ্বিধা করেন না। এই গ্রন্থের 'সোনালি দিন' গল্পে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এমনই একটি হৃদয়ের পরিচয় তুলে ধরেছেন মূল চরিত্র চারুবাবুর মধ্য দিয়ে।

চারুবাবু বস্তুগত জীবনের অবিরল চাহিদা থেকে মুক্তি না পেলেও অবসর জীবনে এসে সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে এক প্রকার স্বস্তি পেয়েছেন। আর সেই স্বস্তি তাঁকে উপহার দিয়েছে একটি সোনালি দিন। যেদিন তিনি সদ্য যৌবনবতী এক তরুণীর সাক্ষাৎ পেয়ে নিজেকে সমর্পণ করেছেন মুহূর্তের অবারিত এক প্রশান্তির কাছে। বয়স তাঁকে সমাজসিদ্ধ মার্জিত মানুষে রূপান্তরিত করলেও তাঁর অবচেতন যৌনাকাঙ্ক্ষা ও তারুণ্যের প্রতি আগ্রহকে যে কোনোভাবেই দমাতে পারেনি, তা-ই এই গল্পের উপজীব্য। চারুবাবুর মনস্তত্ত্ব নিরূপণে লেখক আশ্রয় নেন বাস্তবসম্মত বর্ণনার :

> বস্তুত কী চোখে যে একে দেখলে পুরোপুরি মন ভরে উঠবে তিনি কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলেন না। পৃথিবীর তাবৎ বাতিল বিক্ষত বঞ্চিত বৃদ্ধেরই বোধ করি এই দশা হয়, তিনি চিন্তা করলেন। সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত কোনো নারীর খুব কাছাকাছি চলে এলে বাৎসল্য রসের সঙ্গে আদিম কামনা বাসনাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি করে বুকের ভিতর। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সোনালি দিন', ১৯৮০ : ১৬)

চারুবাবু নিজেই নিশ্চিত হতে পারেন না তরুণীটিকে ঠিক কোন দৃষ্টিতে দেখলে তাঁর উদ্বেলিত হৃদয়ের প্রশান্তি মিলবে। তবে তিনি এটুকু নিশ্চিত বুঝতে পারেন তরুণীর রূপ, গন্ধ, সান্নিধ্য, সর্বোপরি তারুণ্য তাঁকে মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত করছে। এমনকি অবচেতনে তাঁর যৌনচেতনায়ও তরঙ্গ তুলছে। বয়সের গাম্ভীর্য, সামাজিক শিষ্টাচার ও সম্ভাব্যতার সীমারেখা মেনে তিনি তরুণীকে সন্তানতুল্য ভাবতে চাইলেও নিজের গোপন চেতনাকে দমিয়ে রাখতে পারেন না। চারুবাবু এও জানেন, মুহূর্তের এই রোমাঞ্চটুকু কোনো দীর্ঘ সম্পর্কে রূপ নেবে না। লেখক চারুবাবুর মনের খবর না জানালেও পাঠকের ভেবে নিতে বেগ পেতে হয় না যে, উভয়ের বয়স ও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে তা অসম্ভবও বটে। কিন্তু এই স্বাদ আর সান্নিধ্যটুকু আরো বহুদিন রেশ রেখে যাবে তাঁর জীবনে। গাম্ভীর্য ধরে রেখে অহেতুক সুযোগ হারাতে

চান না বলে চারুবাবু সমবয়সী বাস কন্ডাক্টরের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মেয়েটির সঙ্গে উপযাচক হয়ে আলাপ করেন, নিজের কাজের কথা বিস্মৃত হয়ে তার সঙ্গে শিবমন্দির দর্শন করতে দুই স্টপেজ আগে নেমে যান। নিজের ভেতরে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করতে থাকেন নতুন প্রজন্মের মেয়েটির সাহচর্যে; সদ্যযৌবনা মেয়েটিকে পাশে রেখে নিজেকে আরেকবার নতুনভাবে পরখ করে নিতে চান। এই আত্ম-আবিষ্কারটুকুই তাঁর প্রাপ্তি, তাঁর সোনালি অতীতের স্মৃতি, যাকে বর্তমানের আরেকটি সোনালি দিনের রঙে রাঙিয়ে তাকে আরো বর্ণিল করে তুলতে চান তিনি।

পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি মানুষকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে। মনঃসমীক্ষক সিগমুন্ড ফ্রয়েডের সূত্র ধরে বলা যায়, অতৃপ্তি বা ব্যর্থতা মানুষের অবচেতনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বিকৃত রূপে চেতন স্তরে উপস্থিত হয়। শিক্ষিত সমাজবদ্ধ মানুষ একে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে বা অনুশাসন দিয়ে রুখতে চাইলেও তা বারবার নিজের উপস্থিতি জানান দিয়ে যায় মানুষের সাধারণ কর্মকাণ্ডের গভীরে। বয়সও যে মানুষের এই প্রবৃত্তিকে হার মানাতে পারে না তা ইতঃপূর্বে ‘প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব’ শীর্ষক পরিচ্ছেদে ‘শয়তান’ গল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর এই পর্বের ‘আজ কোথায় যাবেন’, ‘সোনালি দিন’ ও ‘লেডিজ ঘড়ি’ গল্পেও অবচেতনের এই মৌল প্রবণতার শমিত রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

লেখকের এই পর্বের ‘গোপন গন্ধ’ গল্পটিতে ইন্দ্রিয়াতীত এক যোগাযোগের সন্ধান পাওয়া যায়, যা তাঁর গল্পে দুর্লভ। বিকার ব্যতিরেকে প্রেম ও যৌনতা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সহাবস্থান করে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। কিন্তু প্রেম ও যৌনতার ঊর্ধ্বে নর-নারীর সম্পর্কের রসায়ন তাঁর গল্পে তেমন লক্ষ করা যায় না। কিন্তু ‘গোপন গন্ধ’ গল্পটিতে বয়োবৃদ্ধ দুই নারী-পুরুষের স্মৃতিকাতরতা তাঁর গল্পের এই অপূর্ণতাটুকু পূরণ করে দেয়। জীবনসায়াহ্নে উপনীত অন্ধ বৃদ্ধ গন্ধের মাধ্যমে গৃহের অন্য সকলকে চিনে নিতে পারলেও চিনতে পারেন না তাঁর যৌবনের গোপন প্রণয়িণীকে। তিনি আগত বর্ষীয়সীর শিরা-ওঠা শীর্ণ হাত ধরার পর :

> আচমকা কোনো ফুলের গন্ধ পেয়ে মানুষ যেমন বুঁদ হয়ে থাকে তেমন তাঁর অবস্থা হয়। চোখ বুঁজে থাকেন। হাতটা ক্রমাগত শুঁকতে থাকেন। চোখের কোনায় জল দাঁড়ায়। . . . একটা একটা গন্ধ রক্তের কত গভীরে লুকিয়ে থাকে। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, ‘গোপন গন্ধ’, ১৯৮০ : ২১৮)

লেখক খোলাসা না করলেও অনুমান করা যায়, এ হয়তো একদা তাঁরই গৃহকর্মী ছিল। বৃদ্ধের যৌবনে হয়তো সে তাঁর দ্বারা যৌননিপীড়িত হতো। কিন্তু এটা কি নিপীড়ন, না তার বাইরেও এর স্বতন্ত্র কোনো অবস্থান ছিল, তার ইঙ্গিত দিতেই হয়তো লেখক বহু বছর পর সেই নারীকে বৃদ্ধ মনিবকে দেখতে পাঠানোর অজুহাতে তাদের দুজনের সম্পর্কের রসায়নে আবার তরঙ্গ তুলে যান। ‘অন্তর্গত রক্তের মাঝে

যৌবনস্মৃতি আর সৌন্দর্যবোধ এক হয়ে যায়' (অশ্রুকুমার সিকদার ১৪১৬ ব. : ৪২৫)। সময় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং বৃদ্ধের শারীরিক অক্ষমতার কারণে তাদের পূর্বতন সম্পর্কে প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলেও তার আমেজটুকু ফুটিয়ে তুলতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এখানে গন্ধকে আশ্রয় করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লেখকের গল্পে প্রায় ক্ষেত্রেই গন্ধের উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্ববহ। সামাজিক সৌজন্যবশত বৃদ্ধ মনিবের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক বৃদ্ধের প্রতি অধুনা-প্রৌঢ়া গৃহকর্মীর স্মৃতিকাতরতা ও মমত্ববোধেরও গূঢ় আভাস রেখে যান।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর কিছু গল্পে কথক ও চরিত্রের উপর ভর করে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির বিবিধ বিকৃতিতে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর গল্প-ভাবনায় মূলত এদেরই জয়জয়কার। কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে তিনি বিরল কিছু গল্প রচনা করেছেন যেগুলো তাঁর সৃষ্টিকর্মের অন্য একটি দিকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। 'গিরগিটি', 'গাছ', 'বনের রাজা', 'সমুদ্র' ইত্যাদি সেই ধারার গল্প। এই ধারারই আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'আম-কাঁঠালের ছুটি'। গল্পটিতে অশীতিপর ও প্রৌঢ় বয়সের দুজন মানুষের মনের মেদুরতা, স্মৃতিকাতরতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার একটি বিচিত্র নকশা ফুটে উঠেছে।

দুজন বয়স্ক মানুষ তাদের মাতা-পুত্র সম্পর্ক ভুলে পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠেছে, পারস্পরিক নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই পরিব্যাপ্ত সম্পর্কের ভিত্তি মূলত তাদের স্মৃতি। ফেলে আসা জীবনের সুখ-দুঃখের অভিন্ন স্মৃতি, একজনকে অনুসরণ করে অন্যজনের সময় পরিব্রাজন-সহ একই পরিবেশে উভয়ের দীর্ঘ জীবন অতিবাহন তাদের সম্পর্ককে এক নব স্তরে উন্নীত করেছে।

মানুষের জীবন পরিক্রমা মূলত চক্রাকারে আবর্তনশীল। সময়-সৃষ্ট বিপর্যয় ব্যতিরেকে এই চক্র একই ছন্দ-গতিতে ঘূর্ণায়মান থাকে। চরিত্র বদলায়, কিন্তু ছক বদলায় না। জ্যোতিরিন্দ্রের 'আম-কাঁঠালের ছুটি' গল্পটি হাজার বছর ধরে চলমান সেই চক্রের একটি ক্ষুদ্র খণ্ডাংশ মাত্র। লেখক এই খণ্ডাংশের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সত্য, বাস্তবতা আর সরলতার নান্দনিক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। দুজন বয়স্ক মানুষ সহজ জীবনদর্শনে কীভাবে নিজেদের ঋদ্ধ করেছে, তারই আখ্যান এই গল্পটি। এই গল্পে মনস্তত্ত্বের জটিল বিক্রিয়া না ঘটলেও সময়ের প্রভাব ব্যক্তিমানসে যে সরল ছাপ তৈরি করে তার সূক্ষ্ম ও শৈল্পিক রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মানুষের বহুধাবিভক্ত মনোজগতের অবদমনের স্বরূপ সন্ধান করেছেন সারা জীবন। তাঁর গল্পে বহিরঙ্গের সমাজসিদ্ধ স্বাভাবিকতার আড়ালে তাদের বহুরৈখিক মানসপটের জটিল আকাঙ্ক্ষা একদিকে যেমন অসংকোচে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি আবার সেই অতল থেকে কদাচিৎ অমৃতও উঠে এসেছে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাকার মৌল প্রবৃত্তিগুলোর মূল স্রোতের নিচে নিয়তি, ভয়, আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা, অসহায়তা-সহ বিভিন্ন চোরাস্রোতকে তিনি কেবল নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হননি; চরিত্রের আন্দোলন, আস্ফালন অর্থাৎ বিভিন্ন আচরণের মধ্য দিয়ে সেই স্রোতের পরিক্রমণ-পর্যায়কে বিশ্লেষণ করে সম্ভাব্য পরিণতির দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে তিনি সমালোচকের ভূমিকা পরিহার করে স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন; মানব-চরিত্রের এমন সব অনুষঙ্গ খুঁজে নিয়েছেন যা নিজেই নিজের রূপ পাল্টে, সত্যের অপলাপ না ঘটিয়ে লেখকের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটায়।

ইতঃপূর্বে পর্যালোচিত পরিচ্ছেদগুলোয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের চরিত্রদের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা এবং বর্তমান পরিচ্ছেদে আলোচিত বয়োবৃদ্ধদের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের বাইরেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের চরিত্রদের মাঝে ভয়, আতঙ্ক, নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, মৃত্যুচেতনা, মানসিক বিকারের চিত্রণ ও অবদমন প্রশমনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা, বিচিত্র হীনম্মন্যতাবোধ, শিল্প-সাহিত্যের উপযোগহীনতা, প্রচারসর্বস্বতা, দ্বৈত সত্তার বিভ্রম প্রভৃতি বিষয় নানা মাত্রিকতায় চিত্রিত হয়েছে। আলোচনার এই অংশে এই প্রবণতাগুলোর সূত্রানুসন্ধানের চেষ্টা করা হলো।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প-ভাবনার অন্যতম উপজীব্য নিয়তির নিষ্ঠুরতার কাছে চরিত্রের অসহায় আত্মসমর্পণ। তাঁর 'অজগর' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প* ১৯৭৬) গল্পে তিনি একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত তরুণের অকপট মানসলোকের উন্মোচন ঘটিয়েছেন নির্মোহ ভঙ্গিতে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুদর্শন তরুণ বরেন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে হতাশার শিকার হয়। অলস অজগরের মতো মৃত্যু তখন একটু একটু করে গলাধঃকরণ করতে শুরু করে তাকে। নিয়তির পরিহাসে সুশ্রী বরেন যেদিন আবিষ্কার করে তার শরীর বংশানুক্রমিক রক্তদুষ্টিজনিত মহারোগে আক্রান্ত, সেদিন থেকেই তার ভাবনার গতিপ্রকৃতি পাল্টে যায়। চরম অসহায়তা তার শান্ত মনোজগৎকে হিংস্র করে তোলে; নিজের ও পরিবারের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। বাতব্যাধিতে আক্রান্ত অচল পিতার সঙ্গে সে অসহিষ্ণু আচরণ শুরু করে, মৃত মায়ের ছবিতে প্রতিদিন থুতু ছিটায় এই ভেবে যে, রোগটি তার মায়ের কাছ থেকেই সে পেয়েছে। সুতরাং তার এই করুণ পরিণতির জন্য প্রকারান্তরে তার অপরূপা মা-ই দায়ী। কিন্তু তার এই ঘৃণাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ক্লান্তি থামিয়ে দেয় তাকে। এছাড়া বরেনের অন্য কিছু করার পথও খোলা রাখেননি গল্পকার।

গল্পের ধারাবাহিকতায় জানা যায়, বরেনের এলাকার মঞ্জু নাম্নী এক তরুণীর প্রতি তার আকর্ষণের কথা। মঞ্জুর অজ্ঞাতসারে তার প্রতি বরেনের একতরফা প্রেমের রূপায়ণ গল্পটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করে। মঞ্জু ও বরেনের পিতা উভয়েই এককালে বরেনের প্রিয় মানুষ ছিল; গল্পের বর্ণনানুসারে এক পর্যায়ে তারা দুজনেই তার প্রধান শত্রু হয়ে ওঠে। কেননা তাদের ঘিরে বরেনের মধ্যে যে স্বপ্নের সৃষ্টি হয়েছিল, নিয়তির নির্মম হস্তক্ষেপে তা বিভীষিকায় পর্যবসিত হয়েছে। দোষারোপ করার জন্য আর কিছু না পেয়ে,

নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার ক্ষেত্র হিসেবে এবং অদৃষ্টের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সে আশ্রয় করে এই দুজনের প্রতি তার রাগকে।

জীবনের কাছে পরাজিত বরেনের সামনে আর কোনো আশা অবশিষ্ট ছিল না। তাই বলে সে নিজেকে তিলে তিলে ধ্বংস হতে দিতে চায় না। মচকানোর চাইতে ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়ার মধ্যেই সমাধানের সূত্র খুঁজে পায় সে; কিংবা বারবার মৃত্যবরণের চাইতে নিজেকে একবারে হত্যা করাই তার দৃষ্টিতে শ্রেয় বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ আত্মহত্যার জন্য সকল আয়োজন সম্পন্ন করে অর্থাৎ ঘুমের ঔষধ ক্রয় করার পরও তাদের কর্মচারী উপীনকে দিয়ে সে শেষ মুহূর্তে সেই ঔষধ ফিরিয়ে দিতে চায়। ভাগ্যকে পরাস্ত করার জন্য আর একবার সাহস করে প্রতিরোধ গড়তে চায়। কিন্তু কুষ্ঠ রোগীর স্পর্শ-লাগা ঔষধের প্যাকেট পুনর্বার নিজের হাতে ধরতে চায় না উপীন; ওটা ফেরত না নিয়েই সে চলে যায়। মৃত্যু যেন আবারও রসিকতা করে বরেনের সঙ্গে।

নিয়তির কাছে বরেন অসহায়। আর এই অসহায়তা তার চরিত্রকে আমূল পাল্টে দিয়েছে। তার মনের অন্ধকারকে মন্থন করে জীবন তার হৃদয়কে বিষময় করে তুলেছে। নিয়তির নির্মমতা ও অবচেতনের গরল থেকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুই তাকে মুক্তি দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্যে বিভিন্ন মোড়কে আবৃত হয়ে মৃত্যুচিন্তা মাঝে মাঝে ফিরে এসেছে। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যু সম্পর্কে মানুষে-মানুষে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও নানাভাবে উঠে এসেছে তাঁর কিছু গল্পে। 'জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি' গল্পে লেখক তাঁর চরিত্রদের জীবনাচরণে মৃত্যুদর্শনের মনস্তত্ত্বকে নানা রূপ ও ব্যাপ্তিতে বিশেষায়িত করে তুলেছেন।

স্বাভাবিক ও অপমৃত্যুর করাল গ্রাসে কত সাজানো সংসার ছত্রখান হয়ে যায়, হৃদয়বিদারক যন্ত্রণাকাতর দৃশ্যের জন্ম হয় চারপাশে। সারাদিন এরকম সংবাদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও গল্পের মূল চরিত্রটি তার পুত্র-কন্যার জন্য অক্লেশে কলা কিনে নিয়ে যেতে পারে, অফিস থেকে ফেরার সময় সন্দেশ কিনে নিতে ভুল করে না। দিনজুড়ে শোনা মৃত্যুসংবাদগুলো তার মধ্যে ভয়ের অভিঘাত সৃষ্টি করলেও সে জীবনমুখর পার্থিব মানুষ; 'মৃত্যুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে জীবনকে যতটা পারলাম তোয়াজ করলাম' (জোতিরিন্দ্র নন্দী, 'জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি', ১৯৮০ : ১৬৩) – এই তার যাপন-নীতি। অন্যদের মানসিক যাতনা তাকে স্পর্শ করে ঠিকই; বিশেষত নিজের স্ত্রী যখন অন্যের মৃত্যুসংবাদে বিষণ্ণ ও ম্লান হয়ে ওঠে তখন তাকেও বিষণ্ণতা গ্রাস করে বটে, কিন্তু থমকে দিতে পারে না। এদিক থেকে এ চরিত্রটি যেন 'গোধূলি' গল্পের সারদার সম্পূর্ণ বিপরীত।

মানুষের মধ্যে মৃত্যুভয়জনিত অসংলগ্ন আচরণ তাকে বরং দ্বিধাগ্রস্ত করে দেয়। মৃতের জন্য সদ্য হা-হুতাশ করা লোকগুলো পরমুহূর্তে কীভাবে গোগ্রাসে খাবার খেতে পারে তা তাকে চিন্তিত করে তোলে।

মৃত্যুকে পাশ কাটাবার জন্য উদগ্র, উন্মত্ত জৈবিকতার প্রতি, ভোগের প্রতি মানুষের লিপ্সা হতাশ করে তাকে। যদিও সেও সকালবেলায় মৃত্যু নিয়ে স্ত্রীর বিষণ্নতার মুখে সন্তানদের হাতে কলা তুলে দিয়েছিল। কিন্তু সেখানে কিছুটা সংযম ছিল, মৃত্যুর বিপরীতে নতুন জীবনের প্রতি পক্ষপাতের আভাস ছিল।

অন্যদের মধ্যে, এমনকি নিজের স্ত্রীর মধ্যে, মৃত্যুসংবাদজনিত মানসিক স্থবিরতা দেখে প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিধায় পড়লেও, পরে সে বুঝতে পারে কেন তার স্ত্রী দীপা মৃত্যু নিয়ে মর্মাহ :

> কারণ? খুব স্পষ্ট। সে চিন্তা করল। মানুষের নিষ্ঠুর নিয়তি, আর তার নিয়তি ঘিরে অনিবার্য দুর্ঘটনা, বিপর্যয়, আকস্মিক মৃত্যু দীপাকে ভয়ংকর বিচলিত করে। সম্ভবত ঘরের মানুষগুলোর কথা তার মনে পড়ে যায়। দুটো বাচ্চা, স্বামী, নিজের কথাও ভাবে ঠিক। আর মুহুর্মুহু আঁতকে ওঠে। কেবল ভয় – একটা বাঘ নিঃশব্দ পায়ে তার ঘরের চারপাশে ঘোরাফেরা করছে, কখন কাকে থাবা মেরে – (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'জীয়ন কাঠি মরণ কাঠি', ১৯৮০ : ১৭৫)

তার স্ত্রী-সহ সবাই কেবল মানুষের মৃত্যুতেই আঁতকে উঠছে; চিন্তিত, বিষণ্ন হয়ে পড়ছে। মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীর প্রতি তাদের কোনো সহানুভূতি নেই। তার স্ত্রী দীপাও মাংসের দোকানে ঝোলানো পাঁঠার মাংস দেখে কীভাবে রান্না করলে খেতে সুস্বাদু হবে সে চিন্তায় বিভোর থাকে। কিন্তু কেবল মানুষের মৃত্যুই তাদের শঙ্কিত করে, কারণ তারা নিজেরাও মানুষ এবং তাদেরও এই পরিণতি হতে পারে। গল্পের শেষে অবশ্য আকস্মিক দুর্ঘটনায় লোকটার পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুর সম্ভাবনার আভাস দিয়ে লেখক মৃত্যুর অমোঘ নিয়তির ইঙ্গিতও রেখে যান।

মৃত্যু-আশঙ্কা মানুষকে বদলে দেয়। আসন্ন মৃত্যুর দুশ্চিন্তা শুভাশুভের বোধ নিশ্চিহ্ন করে একদিকে যেমন মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, তেমনি অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে মানবিক চেতনাও প্রাধান্য পেতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর কিছু গল্পে মৃত্যুমুখে পতিত চরিত্রদের মনোজগৎকে উন্মোচিত করে তাদের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন পাঠককে। এই গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১৯৮১*) গল্পটি। ১৯৭৮ সালের শেষদিকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মারাত্মক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে ফিরেই লিখেছিলেন গল্পটি (শচীন দাশ ১৪১৬ ব. : ৩৪৫)। একজন কথকের বয়ানে বর্ণিত হলেও একদল মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবনায় গল্পটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্যান্য মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত রোগীর ভিড়ে বিত্তবান মুক্তাগাছার জোতদার মহিম হালদার এবং চিং ওয়াং হো নামের জনৈক চৈনিক জুতা-ব্যবসায়ীর চিন্তার বৈপরীত্যকে তুলনামূলকভাবে সরল আঙ্গিকে এই গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক। অ্যানিমিয়ায় ভুগতে থাকা হাসপাতালের অন্যান্য রোগী যখন রক্তের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,

এই দুজন তখন বেশ নিশ্চিন্তই বলা যায়। দুজনেরই রক্ত কিনে শরীরে নেওয়ার মতো অর্থ ও প্রতিপত্তি রয়েছে এবং একইসঙ্গে রক্ত দেওয়ার জন্য অসংখ্য দাতাও আছে তাদের। সামর্থ্যের এই বহিঃপ্রকাশ দুজনের মধ্যে দুরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অর্থের অহংকারে একজনের (মহিম হালদার) আচরণের নীচতার বিপরীতে অন্যজনের (চিং ওয়াং হো) সৌম্য ভাবমূর্তি সকলকে মোহিত করে। সবকিছু সত্ত্বেও একজন রক্ত নেওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করে, অন্যজন সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার কোন্দলে আরো রক্তশূন্য ও পাণ্ডুর হয়ে যায়। সর্বোপরি সবার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে মৃত্যু তার জয়ধ্বনি ঘোষণা করে যায় গল্পের প্রতি স্তরে। জাগতিক প্রতিপত্তি তাকে রুখে দিতে পারে না। এটাই জীবনের সত্য। সরলভাবে প্রকাশ পেলেও গল্পটিতে এই সত্যের মাহাত্ম্য ফুটে উঠেছে।

সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী আজীবন নিরীক্ষাপ্রবণ ছিলেন। তাঁর শেষ বয়সে এ প্রবণতা আরো গাঢ় হয়ে ওঠে। ‘ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা’ গল্পটি তাঁর শেষ বয়সের আঙ্গিক-বীক্ষার ফল। মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মনস্তত্ত্বের রূপায়ণে গল্পটিতে পরাবাস্তব ব্যঞ্জনা যোজনার প্রয়াস রয়েছে।

মৃত্যু তার অশরীরী অবয়ব নিয়ে মানুষকে নিয়ত ত্রস্ত করে তুললেও মানবজীবনে এটিই একমাত্র আতঙ্কসঞ্চারী উপাদান নয়। মৃত্যু ছাড়াও বহুবিধ ভয়, শঙ্কা মানুষকে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ভয়ই মূলত মানুষের অবচেতনের বিকারগ্রস্ততার আদি কারণ। সবসময়ই মানুষ কোনো-না-কোনো ভয়ের বেড়াজালে আটকে থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পেতে বিকৃতির প্রলোভন জাগানো ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। ভাবে, এভাবেই বুঝি ভয় আর ভাগ্যকে ফাঁকি দেওয়া যাবে। কিন্তু পতন তরান্বিত করা ছাড়া এ থেকে অন্য কোনো সুফল মেলে না। তারই নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সেই ভদ্রলোক’ (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প* ১৯৭৬) গল্পে।

একজন উচ্চমধ্যবিত্ত চাকরিজীবী দারা-পুত্র-পরিবার নিয়ে সচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। কথকের বর্ণনানুসারে বলা যায় বেশ সুখেই আছেন, অথচ তাঁর মনে ধ্বংস ও অধঃপতনের অপরিসীম ভয়। তিনি নিজেও জানেন না কোনদিক থেকে আচম্বিত ধস নেমে আসবে জীবনে। আসন্ন পতন-সম্ভাবনার শঙ্কায় প্রতিমুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত ও ম্লান হয়ে আছেন তিনি; যদিও তাঁর উদ্বিগ্ন হওয়ার মতো তেমন কোনো বাস্তব কারণ নেই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘সেই ভদ্রলোক’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির এই আতঙ্কের মূলে রয়েছে সমকালীন অস্থিরতা। সময়টাই এমন যেখানে মানুষের অবস্থান পরিবর্তিত হতে সময় লাগে না। পিকনিক আর পার্টিমুখর রুচিস্নিগ্ধ যে সচ্ছল জীবনযাপন, তা একজনের আয়ের উপর নির্ভরশীল; সেই আয়ের পথ হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যেতে পারত সমকালীন অসাম্যের কারণে। এরকম ক্ষেত্রে একটি পরিপাটি করে সাজানো পরিবার কী করে মুহূর্তেই ধ্বংসের পথে ধাবিত হতে পারে তা-ই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের

অস্বাভাবিক চিন্তাভাবনা ও আচরণের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আলোচ্য গল্পের সেই ভদ্রলোক জানেন যে তাঁদের শোভন, পরিশীলিত ও আপাত-নিশ্চিন্ত জীবনকে সমগ্র সমাজব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা যে-কোনো সময়ে খোলনলচে-সহ পাল্টে দিয়ে বিশৃঙ্খল ও নিঃস্ব করে দিতে পারে। নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে তাঁদের সকল সচলতা আর সম্ভাবনাকে।

গল্পটির চরিত্র চিত্রণে লেখকের সমকালের সমাজব্যবস্থার তিক্ত বাস্তবতার এক ব্যতিক্রমী রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়। চতুর্দিকে ভাঙনের উত্তুঙ্গতায় ক্রমশ উদ্বেলিত জনজীবন। যারা একটু অবস্থাপন্ন, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য কিংবা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনার ভয় তাদেরও শঙ্কিত ও অস্থির করে তুলেছে। যে কোনোদিন চাকরি চলে যেতে পারে, শরীর বিগড়ে যেতে পারে। এই বাড়বাড়ন্ত পরিবার, পরিতৃপ্ত স্ত্রী, বাৎসল্যসিক্ত সন্তানেরা যে-কোনো দিন একটি মাত্র দুর্ঘটনায় ছিটকে যেতে পারে জীবনের গতিপথ থেকে। কারণ সমাজে সমতা কিংবা সম্ভাবনা নেই। বাজারে চাকরি নেই, সম্মুখে কোনো আশার আলো নেই বলে আকাঙ্ক্ষাও ম্রিয়মাণ। কেবল আসন্ন ধ্বংসের আশঙ্কাই যেন একমাত্র সত্য। এইসব আশঙ্কার কারণেই সদাহাস্য চেহারা নিয়ে পরিবারের সকল দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাওয়া এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকটির মনের গভীরে ক্রমশ জট পাকাতে থাকে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে এই ভদ্রলোকটিই সেই সময়ের নাগরিক ভদ্রলোকদের প্রতিনিধি, লেখক যাঁর পরিণতি চিত্রিত করেছেন চরিত্রটির আশঙ্কার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে। অবচেতনে জমতে থাকা দুশ্চিন্তা লোকটার সচেতন মনোবৃত্তিকেও আক্রান্ত করে তোলে ক্রমশ। এর ফলে ভদ্রলোক যে শঙ্কায় উদ্বেলিত হচ্ছিলেন নিরন্তর, তা-ই সত্যি হয়ে যায় তাঁর জীবনে। শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে তিনি ইস্ত্রির দোকানে কাজ নেন। তাঁর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের কোনো বিশদ বর্ণনা না দিয়ে কেবল তাঁর মনের অস্থিরতার সুনিপুণ বয়ানের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ভদ্রলোকের মনস্তত্ত্বকে রূপায়িত করেন :

> এই যে কফি খেতে খেতে হঠাৎ উঠে পড়া, পায়চারি করে সিগারেট টানতে টানতে পরে সিগারেটটা একসময় টানতে ভুলে যাওয়া এবং রেলিঙের ওপর ঝুঁকে পড়া – এভাবে এক পা এক পা করে সময় সঙ্গতি পরিবেশ – সব ভুলে থেকে, স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরতে সরতে কতটা সে যেতে পারে! (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'সেই ভদ্রলোক', ১৯৭৬ : ২৬০)

সংসারকে পরিপাটি রাখতে গিয়ে নিজেকে তিনি যে ক্রমশ ইস্ত্রি বানিয়ে তুলেছিলেন, নিজের কর্তব্যবোধের চাপে সংসারকে মসৃণ করে তুলতে সকল দায় নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, তার প্রবল ভার তাঁকে ছিটকে ফেলেছে তাঁর নিজের অবস্থান থেকে। মানসিক স্থিতি হারিয়ে এই অস্থিতিশীল সমাজের সঙ্গে মিশে গেছেন তিনি; নিজেই প্রকারান্তরে সমাজের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। গল্পটিতে ইস্ত্রির প্রতীকে

দেখানো হয়েছে মসৃণতা ও চাকচিক্যের পেছনে ধাবমানতা কীভাবে মানুষকে জড়, নিস্প্রাণ, অর্থহীন ও বিকল করে তুলতে পারে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সাহিত্যে সমকালীন সঙ্গতিহীনতার ছাপ নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। ক্ষণভঙ্গুর সময়ের জীর্ণতা তাঁর গল্পের চরিত্রদের চেতনে ও অবচেতনে অবিরাম অভিঘাত সৃষ্টি করেছে; তাদের করে তুলেছে অসহিষ্ণু ও অস্থির। চরিত্রদের মনের অতলের হীনতা ক্রমশ ঠাঁই নিয়েছে মনের উপরিভাগে এসে। এই ব্যাপারগুলো কখন ও কীভাবে ঘটেছে লেখকের চরিত্ররাও তা ঠিক উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি। যার ফলে নন্দনভাবনা কিংবা সৃষ্টিশীলতা এদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। সময়টাই এমন, অস্থিতিশীল সমাজ ও অর্থনৈতিক অবক্ষয় বিপর্যস্ত করে দিয়েছে মানুষকে, সাহিত্য কিংবা শিল্পকলার প্রতি আগ্রহ সেখানে বিলাসিতা মাত্র। 'ছাতা' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প* ১৯৭৬) গল্পে এই বিশেষ পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছেন লেখক।

'ছাতা' গল্পে গোলক নামক বইয়ের দোকানের কর্মচারীটি একই ছাতা বারবার পাল্টে বারো বছর ধরে ব্যবহার করছে। কলকাতা শহরের মতো সেই ছাতাও সময়ে সময়ে ডাঁট, হাতল, কাপড়, কাঠামো বদলে এখনো ক্লায়ক্লেশে টিকে আছে। জীর্ণ ছাতাটিকে টিকিয়ে রাখার প্রচ্ছন্ন দম্ভ গোলককে একইসঙ্গে উজ্জীবিত ও অহংকারী করে তোলে। ছাতা চুরি হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষণে ক্ষণে তাই বিচলিত হয়ে ওঠে সে।

ছাতার সম্ভাব্য চোর হিসেবে যাকে সে মুহূর্তের জন্য সন্দেহ করে, সেই লোকটি একজন গল্পকার; আট বছর আগে প্রকাশিত বইয়ের হিসেব নিতে গোলকের দোকানে এসেছিল। ছাতাটি যথাস্থানে পাওয়া গেলেও গোলকের মনে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দের সঞ্চার হয় এই ভেবে যে, অনেকবার সংস্কার করে তার ছাতাটি এখনো ব্যবহার-উপযোগী রয়েছে। অন্যদিকে লেখক বেচারার বইটির নতুন সংস্করণ প্রকাশ দূরে থাক, অবিক্রীত বইগুলোও হয়তো উইয়ে কাটছে কোথাও :

> অবশ্য আজ গোলক ভাবছে, নিতান্তই একটা বাজে চিন্তা সেই মুহূর্তে তার মাথায় ঢুকেছিল, কেননা সাহিত্য চিরকালই সাহিত্য, তবু কাল কি না অন্ধকার র‍্যাকটার কাছে দাঁড়িয়ে একবার মনে হয়েছিল মাইতি মশায়ের মেঘলা আকাশের চেয়ে গোলকের ছাতাটার ওজন অনেক বেশি, পাল্লায় দুদিকে দুটোকে চাপিয়ে দিলে ছাতার দিকটাই ঝুঁকে পড়ত। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'ছাতা', ১৯৭৬ : ২৯৪)

সমকালীন কলকাতার কর্কশ চিত্রের একটি খণ্ডরূপ দেখতে পাওয়া যায় 'ছাতা' গল্পে, যা গল্পের মূল চরিত্র গোলকের মানসিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। গল্পকারের 'মেঘলা আকাশ' গল্পের চেয়ে বাস্তব কলকাতার এই রুদ্র রূপই অধিকতর সত্য; সাহিত্যের সমৃদ্ধ রসের চেয়ে বারবার সংস্কার করে নেওয়া গোলকের পুরোনো ছাতা অনেক বেশি উপযোগী। নিজেকে পাল্টে পাল্টে, ছাল-বাকল বদলে,

উপযোগিতা হারাবার আগমুহূর্তে কোনোমতে সংস্কার করে টিকে থাকাই এখানে মুখ্য, শিল্প এখানে ক্রমশ সঙ্গতিহীন ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের মনে জমতে থাকা বিকার ও বিকৃতিকে নিত্যনতুন কৌশলে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। মনের যেসব জায়গায় সংস্কার করা সম্ভব হয়নি, সেসব জায়গার প্রতিই তাঁর অধিক আগ্রহ ছিল। সেই সূত্রে হীনম্মন্যতা কী করে ব্যক্তিকে আগ্রাসী করে তোলে তারই শৈল্পিক রূপায়ণ ঘটেছে তাঁর 'চাওয়া' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড* ১৯৮১) গল্পে। গল্পটিতে হীনম্মন্যতাসূচক এই মনোবিকারের একটি জটিল সমীকরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

'চাওয়া' গল্পের মূল চরিত্র প্রভুদয়াল তার স্ত্রী হেনার রূপ-লাবণ্য সহ্য করতে না পেরে ক্রমশ ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়তে থাকে। স্ত্রীর রূপের অধিকার আদায়ের অভিপ্রায়ে অপ্রকৃতিস্থের মতো আচরণ শুরু করে সে। শেষে স্ত্রীকে ধ্বংস করার মাধ্যমে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে নেয় প্রভুদয়াল। লেখকের ভাষায় – 'এভাবে ঘরে যতক্ষণ সে আছে, বৌ থাকবে – একটা ভয়ংকর উজ্জ্বল আলোর মতন চোখের সামনে, তার শরীরের কাছে হেনা অবিরত জ্বলবে, আর সেই প্রচণ্ড তাপ লেগে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'চাওয়া', ১৯৮১ : ২০২)।

গল্পের প্রভুদয়াল চরিত্রটিকে আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলেও এমন চরিত্র বাস্তবে বিরল নয়। সামর্থ্যের তুলনায় প্রত্যাশার অতীত প্রাপ্তি ঘটলে কখনো কখনো মানুষ অধিকারপ্রবণতার নিয়ন্ত্রণহীনতার দুর্বিপাকে পড়ে। ধ্বংসের ভেতর দিয়েই এই প্রাপ্তির করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও কখনোসখনো চোখে পড়ে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'শালিক কি চড়ুই' গল্পের তারাপদকে দেখা যায় তার চেয়ে অধিক যোগ্য স্ত্রী প্রাপ্তিতে আত্মহারা থেকে স্ত্রীর কতিপয় অস্বাভাবিক আচরণকেও উপেক্ষা করছে, যা ইতোমধ্যে 'প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক পরিচ্ছেদে বিশদভাবে পর্যালোচিত হয়েছে।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের উপর ভর করে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১)। সামগ্রিক মানুষের মনস্তত্ত্বের ধারণা থেকে কীভাবে বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করা যায়, গল্পের এই মূল বক্তব্যের আড়ালে মানুষের রুচির মানদণ্ডকেও মেপে দেখিয়েছেন লেখক।

শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও সংস্কারের নিরিখে ব্যক্তির শিল্পবোধ নির্ণয় করা গেলেও সমাজের সামগ্রিক শিল্পবোধের মাপকাঠিই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিরুচিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দুইয়ের পারস্পরিক সংঘর্ষে কৌতূহলী ও মুক্তপ্রাণ মানুষও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। লোকচক্ষুর আড়ালে নিজের ব্যক্তিসত্তাকে প্রশ্রয় দিলেও সামাজিক সংস্কার তাকে প্রকাশ্যে ভিন্ন মত ব্যক্ত করতে বাধ্য করে। যেহেতু সামগ্রিক শিল্পবোধ সামাজিক নীতি-

নৈতিকতার মানদণ্ডে নির্ধারিত, তাই একক ব্যক্তি বা সংখ্যালঘুরা তাকে অস্বীকার করার সাহস পায় না। আবার সামগ্রিক রুচির আধিপত্যে মানুষের ব্যক্তিরুচি কোণঠাসা হতে হতে নির্জীব হয়ে পড়ে। তখন নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে মানুষ শিল্পকে সমাজের নির্দিষ্ট রুচিবোধ দিয়ে পরখ করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। গল্পের চিত্রকর উমেশ যার যথার্থ উদাহরণ।

নাগরিক মানুষ রুচির এই প্রবল বিকার দ্বারা আক্রান্ত হলেও সরল সাধারণ মানুষকে সেই জগদ্দল পাথর পিঠে বয়ে বেড়াতে হয় না। তারা যুগ-যুগান্তরের আচরিত সহজিয়া দর্শনের শক্ত ঢাল দিয়ে নিজেদের আবৃত করে রাখে; ফলে আধুনিকতার অগ্রগতি কিংবা বিকারগ্রস্ততা তাদের সহজে আক্রমণ করে না। সত্যকে সরলতা দিয়ে এখনো মেপে দেখার অবকাশ রয়েছে তাদের। আলোচ্য গল্পে শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে এইসব আধুনিক, গ্রাম্য, শিল্পী প্রভৃতি বর্গের মানুষের মনোবিশ্লেষণ রচনাটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। গল্পটির মূল শাখা উমেশকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে, যে তার কুশলী বিপণনবুদ্ধির মাধ্যমে জনতার রুচির সন্ধান জেনে নিয়েছে। পাশাপাশি নিজের শিল্পবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে জনরুচির কাছে সমর্পিত হয়েছে। শিল্পী হলেও উমেশ ব্যবসায়ীও বটে। আর এই ব্যাবসা তার শৌখিনতা নয়, অন্ন সংস্থানের একমাত্র উপায়। সে কারণে জনরুচির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া তার গত্যন্তর নেই। তাই ধারাবাহিকভাবে লতাপাতা, পাহাড়-পর্বত, সাপ-ব্যাং, রমণীর মুখাবয়ব এবং যৌনতা-আশ্রিত চিত্রকর্মের মাধ্যমে খালের ওপর অবস্থিত পোলের এক প্রান্তের গ্রামীণ ও আরেক প্রান্তের নাগরিক মানুষের ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক মনস্তত্ত্ব পরখ করে নিয়ে সে তার ব্যাবসার কৌশল খুঁজে বের করে। তার এই আবিষ্কারে তার স্ত্রী সমর্থন জোগালেও জনতার সামগ্রিক রুচি ও বিকার সম্পর্কে স্বাভাবিক ধারণা আছে বলেই জনরোষ থেকে বাঁচতে সে উমেশকে সতর্ক করে – 'তা বলে আগেই মেয়েটেয়ের ছবিগুলো বের করো না'। উমেশ সায় দেয় – 'আগে কালী দুর্গা পরমহংস-টংস যা আঁকা আছে ঝুলিয়ে দেব, তারপর কিছু ল্যান্ডস্কেপ, তারপর না-হয়. . .' (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর', ২০১৫ক : ৮৪৯)।

জ্যোতিরিন্দ্রের প্রথম পর্বের একটি অসামান্য গল্প 'রাইচরণের বাবরি'তে তাঁর একই চিন্তার ঈষৎ ভিন্ন রূপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রসারের জন্য প্রচারসর্বস্বতার আগ্রাসন, এবং তা থেকে মুক্তিলাভের নান্দনিক আখ্যান আলোচ্য গল্পটি। গল্পের রাইচরণ তার বিপুলাকার শৈল্পিক বাবরির কদর জানে বলেই তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন হতে দিতে নারাজ। তাই অতিরিক্ত বেতন সত্ত্বেও কেবলমাত্র থিয়েটারের আরোপিত সাজপোশাক ও সংলাপের মতো দর্শক তার বাবরিটিকেও পরচুলা বলে ভাবতে পারে, এই আশঙ্কায় থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে দর্জির পেশায় ফিরে আসে রাইচরণ। তার বাবরিকে কোনোভাবেই শিল্পের চেয়ে ন্যূন বলে ভাবে না সে। তাই এর সৌন্দর্যকে অর্থের প্রয়োজনে সস্তায় বিকিয়ে দিতে সে সম্পূর্ণ অপারগ।

সাফল্যের সম্মোহন সচরাচর মানুষকে মোহমুগ্ধ করে রাখে। কেউ তখন আর এই উত্থানের নেপথ্যের অনৈতিক পন্থাকে মনে রাখে না, সফল মানুষটির অন্ধকার অতীত নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। অনেক সময় বর্তমান সাফল্যের আড়ম্বরে সেই অতীতও মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'আপন ভাই' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প* ১৯৯১) গল্পের আখ্যানে রয়েছে তারই ইঙ্গিত। অধর পণ্ডিতের পরীক্ষায় অকৃতকার্য বড় ছেলে হিমাদ্রি বাবার খড়মের বাড়ি খেয়ে, মায়ের সোনার হার চুরি করে ছয় বছর আগে বাড়ি ছেড়েছিল। সে আজ জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে বাড়ি ফিরেছে। অন্যদিকে বিএ পাশ করেও আয়-রোজগারে ব্যর্থ ছোট ছেলে নীলাদ্রি পরিবারের গলগ্রহ হয়ে ঘরে বসে আছে। দুজনের প্রতি মা-বাবার আচরণে স্পষ্ট পার্থক্য থেকে বোঝা যায়, পণ্ডিত ও পণ্ডিত-গিন্নি আজ অতীত ভুলে বর্তমান নিয়ে তৃপ্ত এবং ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর। এমনকি নীলাদ্রিও দাদার সাফল্যে আনন্দিত। তবে সেই হরিষের তলায় কিছু বিষাদের মেঘও জমাট বাঁধে। বাইরে প্রকাশ না পেলেও মা-বাবার তাচ্ছিল্য কাঁটা হয়ে বিঁধেছে তাকে। গল্পের শেষে তাই সে দাদার টাকাভর্তি ব্রিফকেস নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে ভাগ্যের অন্বেষণে।

বিজয়ীর বেশে অগ্রজের প্রত্যাবর্তনের পর সবার আগ্রহ ও কৌতূহল দেখে নীলাদ্রি বুঝে গিয়েছিল – সুযোগ, অবস্থান ও প্রতিপত্তি মানুষকে যেমন পাল্টে দেয়, তেমনি বদলে দেয় তার সামাজিক পরিচয়কেও। এই সরল সত্য সে আরো সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারে, যখন সে দাদার পোশাক পরে পরিপাটি সাজে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যায়। প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেলেও তার প্রতি প্রেমিকার বড় বোনের আগ্রহ দেখে সে যেন জীবনের নতুন দিশা খুঁজে পায়। একে পুঁজি করে সেও সাফল্যের গোলকধাঁধায় প্রবেশ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলত সাফল্যের দরজা খোলার চাবিটি তাকে চুরি করতে হয়। এই শিক্ষা সে তার ভাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছে। ছয় বছর আগে তার ভাই যেমন মায়ের সোনার হার চুরি করে পালিয়েছিল, নীলুও তেমনি দাদার টাকাভর্তি ব্রিফকেসটি সঙ্গে নিয়ে নেয় যাওয়ার সময়।

গল্পটিতে ছোট ছেলে নীলাদ্রির মনস্তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হীনম্মন্যতা থেকে উদ্ভূত অসহায়তা ও আত্মবিশ্বাসহীনতার শিল্পিত রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। নীলাদ্রি এক সাধারণ চরিত্র। নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সে সচেতন। এবং সে অবচেতনে বিশ্বাস করে, তার দাদার মতো সে স্বার্থপর নয়। মায়ের গলার হার চুরি করে বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রচুর অর্থ ও সম্মান উপার্জন করেও দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে বরাবরই অপরাগ থেকেছে বড় ভাই হিমাদ্রি। আবার বহু বছর পর নিজে যখন বাড়ি এসেছে তখন বাজার খরচের পেছনে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত থাকেনি। অথচ ঘরের খুঁটি বদলাতে হবে, চাল চুঁইয়ে পানি পড়ে, সেটা সারানোও জরুরি – এমন সব প্রয়োজনের কথা শুনেও সে নীরব থেকেছে।

এর সম্ভাব্য কারণ হয়তো এই, ঘর মেরামতির সুফল সে বেশি দিন ভোগ করতে পারবে না, বাড়িতে তার আগমন ঘটেছে অতিথি হিসেবে।

হিমাদ্রি আত্মপর। আর তাই অতিথি হয়ে বাড়িতে এসে ঘর সারাতে তার আপত্তি থাকলেও নিজের জন্য ব্যয় করতে সে কুণ্ঠিত হয় না। প্রয়োজনের বাইরেও বাজার থেকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য কিনে আনে। এক্ষেত্রে সে একরকম অপচয়ই করে। এই অপচয়ের নেপথ্যেও সম্ভবত তার বিষয়বুদ্ধি। এসব খাবারের একটা উল্লেখযোগ্য অংশে তার নিজেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে। কিন্তু ঘরের খুঁটি কিংবা টিনের সুখ ভোগ করার মতো অবকাশ তার নেই। যে কারণে গৃহের মেরামতিতে তার অনাগ্রহ। অন্যদিকে নিলাদ্রি বড় ভাইয়ের প্রতি আন্তরিক টান থাকা সত্ত্বেও তার এই স্বার্থপর আচরণ মেনে নিতে পারে না। যা প্রচ্ছন্নভাবে তার কিছু শ্লেষাত্মক ভাবনার মাধ্যমে লেখক প্রকাশ করেন :

> এখন তুই খা বাবা... ট্রেনে কি ছাইভস্ম কিছু খাওয়া হয়েছে... দাদার বাক্সপেটরা গুছিয়ে... সব টেনে টেনে বের করল নীলাদ্রি। প্রকাণ্ড এক টিফিন কেরিয়ার। এক এক করে সব ক'টা বাটি সে খুলে ফেলল। কোনোটায় মাংসের ঝোল, কোনোটায় পাউরুটির টুকরো, কোনোটায় বা শুধুই ফলের খোসা। এর মধ্যেই খাবারের গন্ধে একঝাঁক মাছি উড়ে এসেছে। খাবার কিছু নেই, উচ্ছিষ্ট, কিন্তু তার গন্ধই বা কম কি! আঙুর, আপেল আম, আনারসের খোসা – সত্যিই তো ট্রেনে আর ছাইভস্ম তেমন কি খাওয়া হয়েছে। খাক না একটু মাংসের ঝোল কি দু-টুকরো পাউরুটি, মা-র হাতের রাঁধা তপসের ঝোল গরম ভাত তো আর পেটে জোটেনি। (জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, 'আপন ভাই', ১৯৯১ : ৭২)

'আপন ভাই' গল্পে ছোট ভাই নীলাদ্রির উপর অধিক আলোকপাত করা হলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পণ্ডিত পরিবারের সব সদস্যের মানসলোক উন্মোচিত করার মাধ্যমে মানুষের সাফল্য লাভের প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের কারণে সমাজে তার জোরালো অবস্থানের প্রসঙ্গ সরল আয়োজনে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কোনো কোনো মানুষ, বিশেষত মধ্যবিত্ত মানুষ, নিজের মধ্যে জীবনযাপনের একটি নিয়মিত ছক সাজিয়ে নিতে পছন্দ করে। সকল স্বাতন্ত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে নিজের পক্ষে নিরাপদ সেই ছকের ভেতর শামুকের মতো আমৃত্যু গুটিয়ে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে সে। এই ছককেই অন্যরা সেই ব্যক্তির ব্যক্তি-চরিত্র হিসেবে অভিহিত করে। তবে অতি ভাগ্যবান না হলে মানুষ নির্ভাবনায় এই নিরাপদ তন্দ্রার মধ্যে পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে না। প্রতিনিয়ত সমাজ, সময় ও পরিস্থিতির প্রবল চাপে ব্যক্তিকে জেগে উঠতে হয়, নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়। সামলাতে হয় পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রলম্বিত

প্রতিক্রিয়া। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই পরিবর্তন ব্যক্তিকে কোণঠাসা, অসহায় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিকারগ্রস্ত করে তোলে। যে বিকার হয়তো সাদা চোখে ধরা পড়ে না, কারো ক্ষতির কারণও হয়তো হয়ে দাঁড়ায় না, কিন্তু সমাজের আলোর বিপরীতে ব্যক্তির নিজস্ব আয়নায় তার অবয়ব ধরা পড়ে। সেই বিকার কিংবা অবদমন প্রশমনে ব্যক্তি খুঁজে বের করে এক নিজস্ব পন্থা। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মহড়া' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১৯৮১*) গল্পের মূল চরিত্র চিত্ততোষের ক্ষেত্রেও এমন অবদমন ও তা প্রশমনের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

গল্পকারের বিচিত্র-বিক্ষিপ্ত-সম্প্রসারিত বর্ণনাকে সরলভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, সদ্য-বিবাহিত যুবক চিত্ততোষ সংসারের জাঁতাকলের নিষ্পেষণে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। যে জীবনকে সে মেনে নিতে পারছে না তারই দায় চেপেছে যেন তার ঘাড়ে। আপাতভাবে এ থেকে মুক্তি পাওয়ার, কিংবা একে অগ্রাহ্য করার কোনো জুতসই উপায় তার জানা নেই। বিদ্রোহ করার শক্তিও সঞ্চয় করে উঠতে পারছে না সে। ফলে নিজের ইচ্ছা ও আত্মসম্মানবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠছে তার নিজেরই কাছে। স্ত্রীর কাছে প্রতি মুহূর্তে আত্মসমর্পণের অসম্মান থেকে পরিত্রাণ পেতে, একান্তে নিজের চিত্তকে তোষণ করতে একটা গোপন উপায় খুঁজে নেয় কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্ততোষ। থিয়েটারের সাজপোশাক বিক্রি করে এমন দোকানে গিয়ে নকল গোঁফদাড়ি পরখ করে দেখে সে। গল্পের বর্ণনায় এই সামান্য পরিবর্তনেই সে বেপরোয়া ও বেহিসেবি হয়ে ওঠে। বস্তুত চিত্ততোষ আসলে এভাবে নিজেকে ফিরে পায় পুনরায়, উপভোগ করে নিজের পুরোনো রূপ, হারানো ছন্দ। স্ত্রীর কারণে গোঁফদাড়ি কেটে ফেলতে বাধ্য হওয়া চিত্ততোষের কাছে এ এক অন্যরকম প্রতিবাদ। তার স্ত্রী না জানুক, তবু ব্যক্তিত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য তার সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা নিজেকে বোঝাতে পেরে ভিন্নরকম সান্ত্বনা পায় চিত্ততোষ।

অসমর্থিত ক্রিয়ার মুখে মানব-মনের প্রতিক্রিয়া সবসময় যে সরল হবে, স্বাভাবিক হবে, এমন নয়। যে যাতনা সে অন্তরে ভোগ করছে তার বহিঃপ্রকাশ অস্বাভাবিক হওয়াই স্বাভাবিক। সেই অসংলগ্নতার প্রভাব তার বহির্জগৎকেও প্রভাবিত করে, মনের অসন্তোষ বাইরের আচরণে ধরা পড়ে। এ কারণেই হয়তো ক্রমাগত নিঃশব্দে স্বগতোক্তি করে সে, যা মুহুর্মুহু ঠোঁট নড়ার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়, যা তার আচরণের অস্বাভাবিকতাকেই প্রকাশ করে। তুচ্ছ কারণে সে বাদাম বিক্রেতার সঙ্গে মারমুখী আচরণ করে। মনের ভেতরের পুঞ্জীভূত রাগ ঝেড়ে ফেলার রাস্তা সে এভাবেই খুঁজে নিতে চায়। শেষ পর্যন্ত চিত্ততোষ অন্য কারো, এমনকি নিজের স্ত্রীরও কোনো ক্ষতি না করেই মনের ক্ষোভ প্রশমনের উপায় খুঁজে বের করে। সে স্ত্রীর অনুশাসনের মুখে বিসর্জন দিতে বাধ্য হওয়া বিবাহপূর্ব সময়ের দাড়িগোঁফ আবার লাগিয়ে নেয় সাজপোশাকের দোকানে গিয়ে। এই স্বস্তি হয়তো সামান্য সময়ের জন্য; তবুও চিত্তকে তুষ্ট করার এই অদ্ভুত উপায় খুঁজে পেয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ চেষ্টা চালায় চিত্ততোষ। জ্যোতিরিন্দ্রের

মুনশিয়ানা এখানেই যে, স্ত্রীর কারণে জীবনযাপন প্রণালী পাল্টাতে চিত্ততোষ যে বাধ্য হয়েছে, পুরো গল্পে এর তেমন কোনো আভাস পাওয়া যায় না। চিত্ততোষের বিড়বিড় করার অর্থ বোধগম্য না হলেও, গল্প জুড়ে তাকে সুখী দাম্পত্যের অধিকারী বলেই মনে হয়। কিন্তু গল্পের শেষে নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে তার ক্ষোভের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে চিত্ততোষের বিড়বিড় করার কারণ লেখক জানিয়ে দেন।

'মহড়া'র মতো 'পঙ্গু' (*খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর* ১৯৬১) গল্পেও দেখা যায় অবদমন প্রশমনের ভিন্ন রূপ। গল্পের শুভেন্দুর হঠাৎ হরিণের মাংস খেতে চাওয়া মানুষের অবচেতনের এই অবদমনের এক প্রকার বহিঃপ্রকাশ। ট্রামে কাটা পড়ে পা হারিয়ে শয্যাশায়ী বয়স্ক শুভেন্দুর চিন্তাজগতে বিভিন্ন প্রাণীর পা হানা দিতে থাকে ক্রমাগত। গলদা চিংড়ির পায়ের আধিক্য কিংবা গৃহকর্মী হরিপদের পায়ের কর্মক্ষমতা তার ভাবনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এমনকি দুরন্ত গতিতে ছুটতে সক্ষম হরিণের পায়ের মাংস খেতে চাওয়াও আসলে এক ধরনের প্রতিশোধস্পৃহার বহিঃপ্রকাশ। এসব ভাবনার ভেতরে সাময়িক স্বস্তি পেতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত শুভেন্দু বুঝতে পারে, এসব সান্ত্বনা নিয়তির করাল থাবা থেকে তাকে মুক্তি দেবে না কখনো। তাই গল্পের শেষে শুভেন্দুর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের আরেক খণ্ডচিত্র জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'খুনী' (*ট্যাক্সিওয়ালা* ১৯৫৬) গল্পটি। এই গল্পে বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু বৈকালিক ভ্রমণে বের হয়ে অন্য একটি ঘটনার পরম্পরায় নিজের অতীত রোমন্থন করতে শুরু করেন। সেই অতীত যাকে তিনি সফলভাবে সমাধিস্থ করতে সক্ষম হলেও মনের গহিনে যা তাঁকে আজও পীড়া দিয়ে চলেছে। প্রেমিকাকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করতে নিজের শিক্ষককে হত্যা করেছিলেন প্রসন্নবাবু। প্রেমিকার গর্ভে শিক্ষকের ঔরসজাত সন্তানদের অবহেলা করেননি তিনি, নিজের সন্তানের মতোই ভালোবেসেছেন। তাদের সন্ততিকেও নিজের পরিবারভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করেছেন, যত্নআত্তি ভালোবাসায় কোনো ত্রুটি রাখেননি।

এতদিন পরে বার্ধক্যে পৌঁছে যৌবনের কামনা-বাসনা ও অধিকার করার প্রবণতা স্তিমিত হয়ে এলে নিজের কৃতকর্ম নিয়ে প্রসন্নবাবু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ওঠেন। পার্কে অপরিচিত যুবকের কাছে নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিয়ে পাপবোধ হালকা করতে চাইলেও আত্মজিজ্ঞাসার তাড়না তাঁর মনোজগৎকে দখল করে নেয়। এই ধরনের একটা নাটকীয় বিষয়ও কোনো ধরনের নাটকীয়তা ছাড়াই শিল্পরূপ পায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। তাঁর গল্প সম্পর্কে নিতাই বসুর একটি মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

> জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে ঘটনার ঘনঘটা নেই, নাটকীয়তার চিত্তচাঞ্চল্যকর চমক নেই। সস্তা রোম্যান্টিক প্যানপ্যানানির জোলো আবেগসর্বস্বতা কিংবা মিলন-বিরহের হাসি-কান্নার উচ্চ রোল কখনও শিল্পীর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। তাঁর অন্তর্লীন চেতনা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর মানসিক বিকাশ ঘটায় নিপুণ শিল্পীর মতো অত্যন্ত

> বিলম্বিত লয়ে – গল্প উপন্যাস যতই পরিণতির দিকে এগোতে থাকে, ততই শিল্পী যেন একটার পর একটা পর্দা সরিয়ে পাঠককে একটা গভীর রহস্যের অন্তরালে নিয়ে যান। (নিতাই বসু ২০১৫খ: ১২)

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বিধৃত সেই গভীর রহস্যের বহুমুখিনতাকে সরলভাবে বিশ্লেষণ করা একদিকে যেমন কষ্টসাধ্য, অন্যদিকে এতে অতি-সরলীকরণ ও একমুখী বিশ্লেষণের ঝুঁকিও থেকে যায়। তাঁর 'রং চং' (*চার ইয়ার* ১৯৫৫) গল্পটির ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। আকস্মিক সাক্ষাতে বন্ধু ও বন্ধুপত্নী কুমারেশ ও ডলির আপাত-স্বাভাবিক আচরণ কথকের কাছে বিসদৃশ ঠেকে। তারা পুজোর বাজারে ঘোরাঘুরি করে, এটা-সেটা দেখে, কেনাকাটার জন্য একে অন্যকে পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও কেউই কিছু কেনে না। কৌতূহলী কথক তাদের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক আচরণের আড়ালে গভীর কোনো অসামঞ্জস্যের আভাস পায়, এবং অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারে চাকরি-হারানো বন্ধুটি বর্তমানে চাকরিরতা স্ত্রীর উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। ফলে নিজের অহংকে সান্ত্বনা দিতেই বুঝি ধার-করা টাকা দিয়ে স্ত্রীকে বিভিন্ন কিছু কিনে দিতে চায় সে। অন্যদিকে উপার্জনক্ষম স্ত্রীটিও স্বামীর অপারগতাকে আশ্রয় করে নিজের অবস্থানটুকু বুঝিয়ে দিতে কসুর করে না।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে মনস্তত্ত্বের কেন্দ্র ধরে সমাধানে পৌঁছানো দুরূহ। 'রং চং' গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রীর সরল বন্ধনের বাইরে একটি অলংকৃত সম্পর্কের আভাস পাওয়া গেলেও তা কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব বা তথ্য প্রকাশ করে না; কেবল দুজন পরস্পর সম্পর্কিত মানুষের মনের বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে।

আবার লেখকের 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু' (*মহিয়সী* ১৯৬১) গল্পে পরস্পরবিরোধী মনোভাবের কারণে ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে দেখা যায়। সিদ্ধেশ্বর নামক এক প্রৌঢ় অধ্যাপকের করুণ পরিণতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও ধীর লয়ে গল্পের পরতে পরতে বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা উন্মোচিত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বর তাঁর বিকৃত রুচিকে তৃপ্ত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন, সমাজ তাঁকে এমন ভুল বুঝলেও, লেখক পাঠককে সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের সুযোগ করে দেন। যাত্রাপাথে পাঠক ধীরে ধীরে আবিষ্কার করে মৃত্যুর কারণটি মৃত্যুর ঘটনা থেকে যোজন দূরত্বে অবস্থান করলেও, লেখক নানা প্রয়োজনীয় সূত্র দিয়ে গল্পটিকে গেঁথেছেন, যেন পাঠক বিভ্রান্ত না হয়ে গল্পের মূল প্রতিপাদ্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

সিদ্ধেশ্বরের পুত্রবধূ শোভনার গৃহত্যাগের মাধ্যমে মূল গল্পের বিস্তার ঘটিয়ে লেখক সিদ্ধেশ্বর, তাঁর পুত্র খোকা ও শোভনা, এই তিনটি চরিত্রের মনোজগতের দিকেও দৃষ্টি দেন। একটি একক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি পরিণতি সৃষ্টি করে, যার মধ্যে সবচেয়ে করুণ পরিণাম সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু।

পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে শিক্ষা আর রুচির সুসামঞ্জস্যে তাঁর নিস্তরঙ্গ, পরিপাটি, সুখী ও স্বস্তির সংসারে আচম্বিতে ভাঙন ধরে পুত্রবধূর আকস্মিক ও স্থায়ী গৃহত্যাগের ঘটনায়। লেখক সিদ্ধেশ্বরের পুত্রবধূর বাড়িছাড়ার কারণ উল্লেখ করেন না, কিন্তু খোকা ও শোভনা দম্পতির সন্তানহীনতার কথা জানিয়ে দিয়ে গূঢ় ইঙ্গিত রেখে যান।

পুত্রবধূর গৃহত্যাগে বিব্রত ও শঙ্কিত সিদ্ধেশ্বর খুঁজতে বের হন শোভনাকে। ব্যর্থ হয়ে ক্ষুব্ধ ও অপমানিত পুত্রের মুখে পতিতালয়ের কথা শুনে দৈবের ভরসায় খোঁজ নেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েও উপস্থিত হন। কিন্তু তাঁর জন্য ভাগ্যদেবতা পতিত স্থানে মৃত্যু ভিন্ন অন্য পরিণতি নির্ধারণ করে রাখেননি।

গল্পের মূল কাঠামো এমন হলেও একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখক সিদ্ধেশ্বরের ভাবনার জগৎকে বিকশিত করে তুলেছেন, যেখানে পারিবারিক বন্ধন রক্ষার খাতিরে সিদ্ধেশ্বরের আপাত আপসকামী দর্শনের ফাঁকে ফাঁকেও বহুযুগের লালিত বদ্ধমূল ধারণাগুলো বারবার প্রশ্রয় পেতে থাকে। সিদ্ধেশ্বর শিক্ষিত ও আধুনিক মানুষ, নারীশিক্ষার সমর্থক, অথচ গার্হস্থ্যধর্ম নারীর পরম ধর্ম ইত্যাদি সংস্কারও তিনি সচেতনভাবে লালন করেন। ফলত এই পরিবারে তাঁর পুত্রবধূর চাহিদা পূরণের অপ্রতুলতা থাকতে পারে, এ বিষয়টি জেনে হোক বা না জেনে হোক, তিনি এটি মেনে নিতে পারেন না যে, তাঁর পুত্রবধূ পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে, সমাজকে তোয়াক্কা না করে এভাবে চলে যেতে পারে। যার ফলে তাকে খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধেশ্বরকে মৃত্যুর মুখে পতিত হতে হলো। আধুনিকতা বনাম প্রাচীনপন্থা – এই দ্বৈত অবস্থানের দোলাচলই মূলত তাঁর এই পরিণতির জন্য দায়ী।

দ্বৈত সত্তার এই বিভ্রমকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সরাসরি উপস্থাপন করেছেন 'ডলি, মলি, বসন্তকাল ও টি মজুমদার' (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড ১৯৮১*) গল্পে। গল্পের মূল চরিত্র টি মজুমদার, যে ভিড়ের কলকাতায় অদৃশ্যই থেকে যায়; নিরিবিলিতে দেখলেও যার মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না সে প্রকৃতপক্ষে কলকাতার নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণিরই প্রতিনিধি। কেবল তখনই অন্যদের সাদা চোখে টি মজুমদার ধরা দেয়, যখন তার মতো অগুনতি মধ্যবিত্ত মানুষ নিজেদের মনের অতলের বিকারকে সচেতনভাবে দেখতে চেষ্টা করে। তবে তাদের সঙ্গে টি মজুমদারের কিছু স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। টি মজুমদার অবদমনের সাঁড়াশি দিয়ে বিকারকে চেপে রাখে না। অন্যান্য সামাজিক মধ্যবিত্তের মতো পালিয়ে বেড়ায় না নিজের কাছ থেকে। সে বরং তেলেভাজা আধখানা খেয়ে বাকি আধখানা ডলি মিলিদের ফুটপাতের সংসারে ছুড়ে দেয়, এই অন্যায্য আমোদ অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে যার সঙ্গে চোখাচোখি হয় তার দিকে তাকিয়ে একবার হেসে নেয়। এমনকি পরিস্থিতি সহজ করতে অন্যদের মতো টি মজুমদারের প্রকৃতির অনুষঙ্গের প্রয়োজন হয় না, বসন্তের আড়াল দরকার পড়ে না। সে প্রয়োজন একান্তই

কথকের, কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধির – যাদের প্রত্যেকের মুখোশের ভেতরে টি মজুমদারের মুখটিই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বিশেষত্ব হলো তিনি কাহিনিকে মুখ্য করে কখনো গল্পের আসর জমাবার চেষ্টা করেননি; বরং সময়ের সূক্ষ্মতাকে আঙ্গিকের গাঁথুনি দিয়ে বাঁধার কারুকৌশল সৃজনে নিয়ত প্রয়াসী তিনি। কলেবরে তাঁর আস্থা নেই, তাঁর রচনায় কৌশলই প্রধান হাতিয়ার। দৃষ্টির সূক্ষ্মতা ও জটিল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকৃত নির্যাসের সন্ধান করে গেছেন তিনি। এ কারণে কখনো কখনো তাঁর গল্প বর্ণনার আধিক্যে বিভ্রম সৃষ্টি করলেও পাঠক ঠিকই চরিত্রকে তার অনুপুঙ্খসমেত খুঁজে পায় সেখানে। 'ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার' গল্পটিও তাঁর বর্ণনার আতিশয্যে বিভ্রম সৃষ্টির একটি অনুপম দৃষ্টান্ত। জ্যোতিরিন্দ্রের দৃষ্টির সূক্ষ্মতা সম্পর্কে সমালোচকের একটি মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্য : 'একটা টগরের সবুজ পাতাও তাঁর দৃষ্টি এড়াতো না, ইলিশ মাছ ভাজার গন্ধও তাঁকে ফাঁকি দিতে পারত না' (জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায় ১৪১৬ ব. : ২৮৯)।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি বলেই তাঁর গল্পের চরিত্ররা তাদের সকল স্বাভাবিকতা সত্ত্বেও বহুরৈখিক বৈচিত্র্য নিয়ে হাজির হতে বাধ্য হয়েছে পাঠকের সামনে। লেখক পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে প্রায় প্রতিটি চরিত্রের ভাঁজ খুলে তাদের অন্তস্তলকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। এবং সেই অন্তর্লীন উন্মোচনের যৌক্তিকতাকে নিজ নিজ নিক্তিতে মেপে দেখতে পাঠককেই আহ্বান জানিয়েছেন।

সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের বিষয় ও প্রবণতাকে তিনটি আলাদা পর্বে চিহ্নিত করেছেন :

> প্রথম পর্বে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবস্থা, দ্বিতীয় পর্বে শরীরের অমোঘ সীমাবদ্ধতা থেকে শরীরোত্তর এক আকর্ষণে চরিত্রের উন্নীত হওয়ার ছবি, তৃতীয় পর্বে ভালোবাসা, স্বার্থত্যাগ, আত্মত্যাগ মানুষকে কত উপরে উঠিয়ে নেয়, বার করে আনে অন্য এক মানুষকে, যে সৌন্দর্য, সত্য ও নির্লোভতার উপাসক। (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৪১৬ ব. : ৫৬১)

অরুণকুমার এই পর্বগুলোকে কোনো সময়চিহ্নে সীমায়িত না করলেও সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের প্রথম পর্বের সময়পরিধি ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৬ (*খেলনা* থেকে *ট্যাক্সিওয়ালা*) – যে পর্বের গল্পগুলোয় তিনি বৃহত্তর নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা সংকট, তাদের নৈতিক ও সামাজিক স্খলন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনকে বহুবিচিত্র মনস্তত্ত্বের আধারে চিত্রিত করেছেন। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত দ্বিতীয় পর্বে (*বনানীর প্রেম* থেকে *ছিদ্র*) প্রেম ও যৌনতার পাশাপাশি তিনি

নিসর্গকে বিষয় হিসেবে আত্তীকরণ করেছেন। প্রেম, যৌনতা ও নিসর্গ – এই তিনের সমাপতন ঘটিয়ে তিনি চেতনার আশ্চর্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করেছেন তাঁর দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলোকে। তবে এই পর্বে অরুণকুমার বর্ণিত নরনারীর শরীরোত্তর এক আকর্ষণের তেমন একটা খোঁজ পাওয়া যায় না। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের পাত্রপাত্রীরা কামনা-বাসনাহীন প্রেমে অনুৎসাহী। তাঁর চরিত্রদের যৌনাকাঙ্ক্ষার নেপথ্যে মানুষের প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাড়নাই নিহিত, যার পরিচয় বিধৃত হয়েছে মোটামুটিভাবে তাঁর সমগ্র রচনায়। তবে লিবিডোতাড়িত যৌনবিকলন ছাড়া তাঁর গল্পে প্রেম ও যৌনতার একটা সহজ সহাবস্থান রয়েছে, যা বর্তমান অধ্যায়ের 'প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব শীর্ষক' পরিচ্ছেদে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু শরীরোত্তর প্রেম কিংবা 'প্লেটোনিক লাভ' বলতে যা বোঝায় তা জ্যোতিরিন্দ্রের দ্বিতীয় পর্বের গল্পে খুঁজে পাওয়া যায় না। এমনকি তাঁর কোনো পর্বের গল্পেই 'শরীরের অমোঘ সীমাবদ্ধতা থেকে শরীরোত্তর এক আকর্ষণে চরিত্রের উন্নীত হওয়ার ছবি'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তাঁর গল্পের তৃতীয় পর্বটি **১৯৭৬** (*ছিদ্র* প্রকাশের পর থেকে) থেকে **১৯৮১** (*জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প* থেকে *গল্প সংগ্রহ **১**ম খণ্ড*) পর্যন্ত ব্যাপ্ত। কেবল এই পর্বভুক্ত 'গোপন গন্ধ' গল্পটিতে শরীরোত্তর প্রেমের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় রয়েছে, যা এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের তৃতীয় পর্ব তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। ১৯৭৬ সাল (একই বছরে প্রকাশিত তাঁর *ছিদ্র* নামক গল্পগ্রন্থটি এই পর্বের আওতাভুক্ত নয়) থেকে শুরু করে তাঁর মৃত্যুর মাত্র দুই বছর পূর্বে প্রকাশিত *আজ কোথায় যাবেন*-এ এই অন্তিম পর্বের গল্পের বিশদ পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থের গল্পগুলোয় জীবনসায়াহ্নে উপনীত বৃদ্ধদের স্মৃতিকাতরতা, মৃত্যুচিন্তা ও জীবনতৃষ্ণা এবং অস্থির আতঙ্কজর্জর মানুষের জীবনজিজ্ঞাসার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি বিশেষ জীবনবোধের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এই পর্বটির ব্যাপ্তি কম হলেও তাঁর গল্পের বিবর্তনের ধারা অনুধাবনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্ষীয়ান মানুষদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র এর আগেও কিছু গল্প লিখেছেন; 'বেঙ্গমা-বেঙ্গমী' (১৯৫৪), 'খুনী' (১৯৫৬), 'সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু' (১৯৬১), 'নৈশভ্রমণ' (১৯৬১), 'নীল পেয়ালা' (১৯৬১), 'শয়তান' (১৯৬৩) ইত্যাদি গল্পের কাহিনি বয়োবৃদ্ধ চরিত্রদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। বৃদ্ধদের নিয়ে রচিত হলেও এখানে বয়সোচিত কোনো চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না। গল্পগুলো ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনসায়াহ্নে প্রকাশিত *আজ কোথায় যাবেন* গ্রন্থের এগারোটি গল্পের মধ্যে সাতটি গল্পেই বার্ধক্যের সীমায় উপনীত একদল মানুষের জীবন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় উপস্থাপিত হয়েছে। এই বইয়ের গল্পগুলোর বিষয় পর্যালোচনা করলে প্রতিভাত হয় যে, জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর প্রজন্মভুক্ত কতিপয় বৃদ্ধের যাপনচিত্র অঙ্কন করেছেন। এখানে চরিত্রের ভাবনাচিন্তায় মূলত লেখকের পর্যবেক্ষণই প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের গল্পে চরিত্র হিসেবে বৃদ্ধদের উপস্থিতি

থাকলেও তা ছিল লেখকের মস্তিষ্কপ্রসূত দর্শন ও চিন্তার ফসল। অন্যদিকে এই গল্পগ্রন্থটিতে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিজের যাপিত জীবনের খণ্ড অভিজ্ঞতার নির্যাস, যা গল্পের বিষয় ও পরিণতিকে অন্যমাত্রায় উপনীত করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর শেষ গল্পগ্রন্থে কয়েকজন প্রবীণের মৃত্যুচেতনা, স্মৃতিকাতরতা, জীবনতৃষ্ণা, যৌনাকাঙ্ক্ষা-সহ তাদের নানা প্রবণতা ও সীমাবদ্ধতাকে সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়ে অনুপুঙ্খসমেত চিত্রিত করেছেন। বয়োবৃদ্ধদের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের বাইরেও এসব গল্পের চরিত্রদের মধ্যে ভয়, আতঙ্ক, নিয়তি-সমর্পিত অসহায়তা, মানসিক বিকারের নানা রূপ ও অবদমন প্রশমনের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা, হীনম্মন্যতা প্রকাশের বৈচিত্র্য, সৃষ্টিশীলতার নির্মম পরিণতি, প্রচারসর্বস্বতা, দ্বৈত সত্তার দোলাচল প্রভৃতি বিষয় নানা মাত্রিকতায় চিত্রিত হয়েছে। মানব-মনের এ সকল বহুরৈখিক চেতনার বৈচিত্র্যকে জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর গল্প-ভাবনা ও সৃষ্টির রসদ হিসেবে বারবার ব্যবহার করেছেন।

চরিত্রদের মন ও মননের গভীরে প্রবেশ করে লেখক সানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করেছেন পাঠকের সামনে। অজস্র চরিত্রের মনোজগতের বহুমাত্রিক বৈচিত্র্যের সুবাদেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অজন্তা সাহা (২০১০), 'জনজীবনের বাস্তবতা : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্প ও উপন্যাস', *কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, মুদ্রাকর, কলকাতা

অজ্ঞাত (১৪১৬ ব.), 'প্রিয় অপ্রিয় : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (১৪১৬ ব.), 'পত্রপত্রিকায় আলাপ আলোচনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

অনিতা অগ্নিহোত্রী (১৪১৬ ব.), 'আজ কোথায় যাবেন : একটি জীবন্ত ভ্রমণলিপি', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

অমর মিত্র (১৪১৬ ব.), 'পিতৃপুরুষকে প্রণাম', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৪), 'স্বাধীনতার পরে ছোট গল্প', *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, দে'জ পাবলিশিং, ৩য় সংস্করণ, কলকাতা

অশ্রুকুমার সিকদার (১৪১৬ ব.), 'রাইচরণ বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

অসীম বর্ধন (১৯৯৯), 'কিশোর বয়সে যৌন ধারণা', *কিশোর কিশোরীদের যৌন সমস্যা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা

– (১৯৯৯), 'যৌনতার পরিপ্রেক্ষিতে কৈশোরে ব্যক্তিত্ববিকাশ ও আচরণ সমস্যা', *কিশোর কিশোরীদের যৌন সমস্যা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা

অসীম সামন্ত (২০১৭), 'হ্যাঁ, না এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও সন্দীপন', *প্রসঙ্গ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, পরম্পরা, কলকাতা

– (২০১৭), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর হাসি', *প্রসঙ্গ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, পরম্পরা, কলকাতা

আবুল হাসান (২০১২), 'নিঃসঙ্গতা', *আবুল হাসান রচনা সমগ্র*, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (২০০৫), 'বিভূতিভূষণের গল্প: বাস্তবতার দৃষ্টিকোণে', *গল্প পাঠকের ডায়েরি*, সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

ঋতংকর মুখোপাধ্যায় (১৪১৭ ব.), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পভুবন : যৌনতা ও সৌন্দর্যতৃষ্ণার আরশিনগর', *উজাগর*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, সম্পাদনা : উত্তম পুরকাইত, কলকাতা

জীবনানন্দ দাশ (২০১৭), 'আট বছর আগের একদিন', *মহাপৃথিবী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯৭৬), 'অজগর', *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, ভারবি, কলকাতা

– (১৯৮০), 'আজ কোথায় যাবেন', *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৯১), 'আপন ভাই', *জোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৪১৬ ব.), 'আমার সাহিত্য জীবন আমার উপন্যাস', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (১৮৯৫ শকাব্দ), 'আরসি', *উল্টোরথ,* সংখ্যা ৭ (পূজা সংখ্যা), সম্পাদনা : প্রসাদ সিংহ কলকাতা

– (১৯৮০), 'আরসোলা', *আজ কোথায় যাবেন,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'ইস্ত্রি', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'উত্তরায়ণ', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮১), 'এক ঝাঁক দেবশিশু', *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– 'ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা', *জোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'কতক্ষণ', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'কমরেড', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৯১), 'কালো বউদি', *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'ক্যামাক স্ট্রিটে', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'কেষ্টনগরের পুতুল', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'কৈশোর', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

- 'খাকি', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

- 'খেলোয়াড়', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'খুকি', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'খুনী', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮২), 'গন্ধ', *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), 'গানের ফুল', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– 'গিরগিটি', *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘গুইনি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮০), ‘গোধূলি’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘গোপন গন্ধ’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘ঘরণী’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮০), ‘চশমখোর’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘চড়ুইভাতি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘চামচ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৪২৩ ব.), *চা টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, সম্পাদনা : প্রশান্ত মাজী, ভালো বই, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘চার ইয়ার’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘চোর’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৭৬), ‘ছাতা’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, ভারবি, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘জ্বালা’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮০), ‘জিয়ন কাঠি মরণ কাঠি’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৪১৭ ব.), ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কয়েকটি উপন্যাস’, *উজাগর*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, সম্পাদনা : উত্তম পুরকাইত, কলকাতা

– (২০০৪), ‘জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী-র সঙ্গে লোথার লুৎসের সাক্ষাৎকার’, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী : লোথার লুৎসে, *জনপদ প্রয়াস*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, সম্পাদনা : বিকাশ শীল, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘টুকরো কাপড়’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮১), ‘ডলি মলি বসন্তকাল ও টি মজুমদার’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৯৮১), ‘তাকে নিয়ে গল্প’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘তারিণীর বাড়ি-বদল’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘দিগ্‌দর্শন’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯০৩ শকাব্দ), ‘দুই অঙ্ক’, *উল্টোরথ*, বর্ষ ৩০, পূজা সংখ্যা, সম্পাদনা : প্রসাদ সিংহ, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘দুর্বোধ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘দৃষ্টি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮১), ‘নিঃশব্দ নায়ক’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘নিষ্ঠুর’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘নীল পেয়ালা’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘নৈশ ভ্রমণ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৪১৬ ব.), ‘পণ্য’, *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘পতঙ্গ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘পঙ্গু’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘পালিশ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫খ), ‘পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘প্রতিনিধি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৯১), ‘ফুল ফোটার দিন’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘বন্ধুপত্নী’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘বনানীর প্রেম’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘বনের রাজা’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘বিষ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘বুটকি ছুটকি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫খ), ‘বৃষ্টির পরে’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘বেঙ্গমা-বেঙ্গমী’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘ভিজিট’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘ভোলাবাবুর ভুল’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮১), ‘মহড়া’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘মঙ্গলগ্রহ’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘মাছধরার গল্প’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮১), ‘মাছি’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘মাছের দাম’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘মেয়ে শাসন’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘রজনীগন্ধা গানে’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘রংচং’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫খ), ‘রাইচরণের বাবরি’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (১৯৮২), ‘রাক্ষসী’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘রিপোর্ট’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৯১) ‘রূপকথার রাজা’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৯৮২), ‘রূপালী মাছ’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘রেফ্রিজারেটার’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮০), ‘লেডিজ ঘড়ি’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮২), ‘শয়তান’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘শালিক কি চড়ুই’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫খ), ‘শ্বাপদ’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৫ক) ‘সন্ততি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘সমতল’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৫খ), ‘সমুদ্র’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– ‘সামনে চামেলি’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৫ক), ‘সার্কাস’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– ‘সিংহরাশি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৯৮২), ‘সুখী মানুষ’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

–	(২০১৫ক), ‘সূর্যমুখী’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

–	(১৯৮১), ‘সেই ভদ্রলোক’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

–	(২০১৫ক), ‘সোনার স্মৃতি’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

–	(১৯৮০), ‘সোনালি দিন’, *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

–	(২০১৫ক), ‘স্ট্যাম্প’, *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১৭), “জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : ‘নদী ও নারী’”, *ছোটগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ)*, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

তপোব্রত ঘোষ (১৪১৭ ব.), ‘সবুজ মানুষের জন্ম : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প’, *উজাগর*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, সম্পাদনা : উত্তম পুরকাইত, কলকাতা

দেবশ্রী মণ্ডল (২০১৭), ‘জটিল মনস্তত্ত্ব ও যৌনচেতনা’, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বহুমুখ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

–	(২০১৭), ‘বহুমুখের নানা দিক এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প’, আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বহুমুখ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৫), ‘প্রাক্ কৈশোর ও তার সমস্যা’, *কৈশোর ও তার সমস্যা*, ২য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

নাজমুল করিম (১৯৯৩), *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ৫ম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

নিতাই বসু (১৪১৬ ব.), ‘নিঃসঙ্গ লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী’, *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

–	(২০১৫খ), ‘ভূমিকা’, *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

নীহার শুভ্র অধিকারী (২০১৮), ‘রমাপদ চৌধুরী ও সমসাময়িক গল্পকার’, *গল্পের ভুবন : রমাপদ চৌধুরী*, পুনশ্চ, কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯৮৯), ‘এই দ্বন্দ্ব’, *প্রেমেন্দ্র মিত্রের সমস্ত গল্প ১ম খণ্ড*, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, কলকাতা

বরেন্দু মণ্ডল (২০০৪), ‘উত্তর ঔপনিবেশিক ক্লেদ – বারো ঘর এক উঠোন’, *জনপদ প্রয়াস*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, সম্পাদনা : বিকাশ শীল, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৬০), *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ১৮০০-১৯০০*, বিনয় ঘোষ, কলকাতা

ভূদেব চৌধুরী (২০০০), 'বাংলা ছোটগল্প : চালচিত্র', *ছোটগল্পের কথা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মধুমিতা সাহা (২০১৫), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্প : সত্তাসংকট', মধ্যবিত্তের সত্তাসংকট : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্য, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রঞ্জনা দত্ত (২০০২), 'গল্পে-কল্পে জ্যোতিরিন্দ্র', *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অজিতকুমার দত্ত, কলকাতা

– (২০০২), 'জ্যোতিরিন্দ্র : দ্বন্দ্ব বহুব্রীহি', *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অজিতকুমার দত্ত, কলকাতা

– (২০০২), 'জ্যোতিরিন্দ্র : সময় অসময়', *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অজিতকুমার দত্ত, কলকাতা

রবিন পাল (২০১২), *মনোভূমি*, ৩য় বর্ষ, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪২৪ ব.), 'শাস্তি', *গল্পগুচ্ছ*, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী, কলকাতা

রায় শেখর (১৩৫৩ ব.), *বৈষ্ণব পদাবলী*, সম্পাদনা : হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

লালন সাঁই (২০০৮), *লালনসমগ্র*, সম্পাদনা : আবুল আহসান চৌধুরী, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

শচীন দাশ (১৪১৬ ব.), 'পত্র-পত্রিকায়, আলাপ-আলোচনায় জোতিরিন্দ্র নন্দী', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

শম্পা চৌধুরী (২০১৭), 'মধ্যবিত্তের নৈতিক সংকট ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাসে নারী-পুরুষ অবস্থান', *গল্পমেলা*, বিষয় : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সম্পাদনা : শতদ্রু মজুমদার ও সৌম্যদেব বসু, কলকাতা

সমরেশ বসু (১৪১৬), 'সম্পাদকীয়', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (২০১৭), 'উটপাখী', *কাব্যসমগ্র*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৪২৩ ব.), *চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, সম্পাদনা : প্রশান্ত মাজী, ভালো বই, কলকাতা

– (১৪১৬ ব.), 'নীল রাত্রি ও বনের রাজা', *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪, সম্পাদনা : অনিল আচার্য, কলকাতা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০১০), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে ফিরে দেখা', *কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অজন্তা সাহা, মুদ্রাকর, কলকাতা

Bétille, André (2018), ‘The social character of the indian middle class’, *Middle class values in Indian and western Europe*, Edited by Imtiaz Ahmed and Helmut Reifeld, Routledge, London

Freud, Sigmund (n.d.), *https://www.sigmundfreud.net/quotes.jsp (Accessed: 01-05-2021)*

Miller, H. C. (1945), *Phychoanalysis and Its Derivatives*, 2nd edition, Oxford University Press, London

Mottier, Véronique (2008), *Sexuality: A Very Short Introduction*, Oxford: Oxford University Press, London

উপসংহার

মনস্তত্ত্বের বহুমুখিনতার রূপায়ণে বিচিত্র তল সৃষ্টির ক্ষমতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত করেছে। বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা, রচনাকৌশল ও গদ্যশৈলীর বিশেষত্বে তিনি বাংলা গল্পের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে একটি মনোগ্রাহী ধারার সংযোজন ঘটিয়েছেন। নিরন্তর আত্ম-অনুসন্ধান ও সমাজ সমীক্ষার প্রবণতা তাঁকে জনপ্রিয়তার বিপরীত অভিমুখে যাত্রার সাহস জুগিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রের আত্মপ্রত্যয় তাঁকে বাংলা গল্পের অন্যতম নিরীক্ষাপ্রবণ লেখক হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে। বিষয় নির্বাচন, সময়চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতায় সমকালীন অনেক লেখকের তুলনায় তিনি অনেকাংশে স্বতন্ত্র। এই আত্মবিশ্বাস থেকেই তিনি সৃষ্টিশীলতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন; সাহিত্য রচনার মাধ্যমে অর্থোপার্জনের দায় থাকলেও বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্য ও যশের হাতছানি থেকে দূরে রেখেছেন নিজেকে। তাই জীবদ্দশায় সাহিত্যের অঙ্গনে তিনি একজন বিশ্লেষণপ্রবণ ও অভিনিবিষ্ট লেখক হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় মানুষের মনোজগৎ। তাঁর গল্প আবর্তিত হয়েছে নানা বৈপরীত্যময় চরিত্রদের নিয়ে; সমাজঘনিষ্ঠ ও বিবিক্ত মানুষের অন্তর্লোকের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনপ্রবাহ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর গল্পে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, নিসর্গ, প্রেম, যৌনতা প্রভৃতির বৈচিত্র্য রয়েছে। এছাড়াও আছে অপ্রত্যাশিত সামাজিক অবস্থান থেকে মুক্তির আকুতিও। সেই আর্তি সমাজ ও সংস্কারের প্রাচীরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গুমরে মরেছে, কখনো বিকারেরও রূপ নিয়েছে। নানা বর্গের মানুষের জীবনযাপনকে পর্যবেক্ষণ করে, তাদের অনুভবের বিচিত্র দিককে সামনে এনে, তিনি চরিত্রদের অন্তর্লোককে উন্মোচিত করেছেন।

'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভে মূলত তাঁর গল্পের চরিত্রদের মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিকতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। সময়, সমাজ, সংস্কার, স্মৃতি ও দোলাচলের প্রভাবে তাঁর চরিত্রদের সচেতন মন কীভাবে অচেতনের আজ্ঞাবাহী হয়ে ওঠে, অবচেতন কীভাবে চেতনের নিয়ন্তা হয়ে ওঠে, যথাসম্ভব বিস্তৃত কিন্তু কেন্দ্রানুগ আলোচনার মাধ্যমে সেসব প্রসঙ্গকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান অভিসন্দর্ভে।

'সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব' শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে সাহিত্য ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সমালোচক ও মনঃসমীক্ষকদের নানা তত্ত্ব ও ব্যাখ্যার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিশ্বসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব-কেন্দ্রিকতার প্রবেশ এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনস্তাত্ত্বিক রূপায়ণের ক্রমবিকাশের যাত্রাপথটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আধুনিক কথাসাহিত্যে মনস্তত্ত্বের ভূমিকা

অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ফ্রয়েড-পরবর্তী সময়ে অন্যান্য মনঃসমীক্ষক মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আরো তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলেও সাহিত্যে মনস্তত্ত্ব বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে প্রধানত ফ্রয়েডের সূত্রে। বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বর্তমানে অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত। সাহিত্য জাদুবাস্তববাদী, পরাবাস্তববাদী, রূপকধর্মী বা বিমূর্ত, যে ধারারই হোক না কেন, চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে কোথাও পাশ কাটিয়ে যাবার সুযোগ নেই। বস্তুত আধুনিক কথাসাহিত্যিকেরা মনস্তত্ত্বকে সাহিত্যের অন্যতম মৌল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জীবনকথা ও সাহিত্যচর্চা'-তে সীমিত পরিসরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর জীবনের উপর আলোকপাতের পাশাপাশি সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশের কালানুক্রমও তুলে ধরা হয়েছে। এই আলোচনার সূত্রে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত শৈশব-কৈশোর, তাঁর পরিবার, মাতুলালয় ও পিতামহের সান্নিধ্য তাঁর সাহিত্যচর্চাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা গমন, জীবিকার জন্য তাঁর নিরন্তর সংগ্রাম, বিবাহ, নানা গুণীজনের অনুপ্রেরণা প্রভৃতি প্রসঙ্গের অবতারণার মধ্য দিয়ে লেখকের পরবর্তী জীবনের নানা পর্যায়কেও এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন গল্পকার'-এ জ্যোতিরিন্দ্রের সাহিত্য রচনার কালকে চিহ্নিত করে, সেই প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক কয়েকজন গল্পকারের সঙ্গে তাঁর বিষয়-ভাবনা ও আঙ্গিকের সাদৃশ্য, স্বাতন্ত্র্য, বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

এই পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাওয়া যায়, একই সময় ও সমাজব্যবস্থায় জীবন অতিবাহিত করায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাযুজ্য পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকের আঙ্গিক, রচনাকৌশল ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বিদ্যমান। এঁদের প্রায় সবার গল্পই সমসাময়িক পরিস্থিতি ও মধ্যবিত্ত জীবনবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্রের যে মূল বৈশিষ্ট্য – চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ঘনতা – তা আর কারো লেখায় এত নিগূঢ়ভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই সময়ের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য এঁদের কেউ নিজের সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে আপস করেননি। জনপ্রিয়তার চেয়ে সৃষ্টি ও সাধনার উৎকর্ষের প্রতি তাঁরা অধিক মনোযোগী ছিলেন। পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রেখেই তাঁরা সাহিত্যসৃষ্টিতে একে অন্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার সুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর সমকালে বাংলা গল্পের প্রভূত বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

চতুর্থ অধ্যায় 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প : মনস্তত্ত্বের বহুরৈখিক রূপায়ণ' এই অভিসন্দর্ভের মূল অধ্যায়। এখানে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের চরিত্রদের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। পরিসরের দিক থেকে বিস্তৃত হওয়ায় এই অধ্যায়টিকে ছয়টি পৃথক পরিচ্ছেদে বিভাজিত করে আলোচ্য লেখকের গল্পে চরিত্রের মনস্তত্ত্বের বিকাশ, প্রকাশ ও পরিণতিকে বিশদভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ 'মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব'। মধ্যবিত্ত মনস্তত্ত্ব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিস্তৃত পরিসরে কাজ করেছেন। সব শ্রেণির মানুষের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বের রূপায়ণেই তাঁর অভিনিবেশ সবচেয়ে বেশি। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে মধ্যবিত্তের সংজ্ঞা প্রদান ও তাদের প্রবণতাসমূহকে চিহ্নিত করে এই উপমহাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশের প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ে ও সমাজে তাদের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মধ্যবিত্তের শ্রেণিবিভাজন করে তাদের অস্তিত্বের নানামুখী সংকটকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এই বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঔপনিবেশিক যুগে যে আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল, সময়ের পরিক্রমায় ও নতুন সমাজবাস্তবতায় তা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মধ্যবিত্তের আর্থিক অবস্থার অবনয়ন ঘটলেও শিক্ষা ও পরিশীলিত রুচি নিয়ে তারা সমাজে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে আগ্রহী। আর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই শিক্ষা ও রুচির ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত হলেও অর্থনৈতিকভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত। তাদের জীবন ব্যক্তিগত নানা সংকটে আকীর্ণ। এদের কেউ কেউ এসব সংকট থেকে উত্তরণের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও সমাজের প্রচলিত সংস্কার ও বন্ধুর যাত্রাপত্রের কারণে তাদের অবস্থা অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। এই শ্রেণির একটি অংশ সংস্কারের নিগড়কে অস্বীকার করতে চাইলেও তা থেকে মুক্তির উপায় তাদের জানা ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের মধ্যবিত্তের একটি বড় অংশ প্রচলিত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে নারীকে সমাজ-নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছে। তাঁর গল্পের কোনো কোনো মধ্যবিত্ত চরিত্র অন্যের গভীরতর সংকট দেখে নিজের সংকট ভুলে থাকতে চায়, আরো অনেকে যে তার চেয়ে নিম্নতর অবস্থানে রয়েছে এই ভাবনা তাদের এক ধরনের সান্ত্বনা দেয়। যুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির কারণে সৃষ্ট অস্থিরতায় সমর্পিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রের মধ্যবিত্তরা পতনের জন্য অপেক্ষা করে। সমস্যার এই অন্তহীন আবর্তে কোনো প্রকারে খাপ খাইয়ে নিয়েছে বলে এর থেকে উত্তরণেও অনেকের অনীহা। আবার কখনো কখনো এদের শিক্ষা, রুচি ও সংস্কারের মধ্যে তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। কেউ সমস্যা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়, আবার কেউ প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে পরিত্রাণের উপায় খোঁজে। অবশ্য সেখানেও কোনো বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকায় তাদের চিত্রিত করেননি লেখক; পরিত্রাণের সেই পথ সামাজিক দৃষ্টিতে অনৈতিক। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর

প্রতিটি মধ্যবিত্ত চরিত্রের জীবনযাপনেই তাদের ক্রমাবনতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। এদের চূড়ান্ত পতনকে সবসময় অনুসরণ না করলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে কলকাতা নগরের এই অসহায় জনগোষ্ঠীটির সমূহ বিপর্যয়ের আভাস রেখে গেছেন। তাঁর গল্প যেন এদের জীবনসংগ্রাম ও অসহায় আত্মসমর্পণের দলিল।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 'নারী মনস্তত্ত্ব'-এ বাংলা ছোটগল্পে নারীর চরিত্রায়ণের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করে সেই ধারায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারীর অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর নারী চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে রচিত গল্পসমূহের বিশ্লেষণ করে এ সকল চরিত্রের মনন ও মানস-প্রবণতার স্বাতন্ত্র্য নির্ণয় করা হয়েছে। একই সূত্রে তাঁর গল্পের বহির্বাস্তবের অন্তরালে নারীর মনস্তত্ত্বের বহুবিচিত্র রূপের অনুসন্ধানের মাধ্যমে তাদের বিকাশ ও পরিণামকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এই অন্বেষণ ও বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে বলা যায়, নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে সূচিত পরিবর্তনের অভিঘাতে বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলা ছোটগল্পে আত্মসচেতন নারীদের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করেছে, যা এর পূর্ববর্তী সময়ের গল্পে ততটা দেখা যায়নি। বিশ শতকের কথাসাহিত্যের নারীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নির্মাণে এই সামাজিক পরিবর্তনের ভূমিকা রয়েছে; শিক্ষা, রুচি, চাকরি প্রভৃতির সুবাদে পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে নারীর একটি নিজস্ব অবস্থান তৈরি হতে শুরু করেছে। তবে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারীদের স্বাভাবিক প্রবণতা সেই জাগরণ নয়। তাঁর গল্পে নারী চরিত্র নির্মিত হয়েছে ভিন্ন আঙ্গিকে। এদের একটি বড় অংশ স্বাধীনতা-প্রত্যাশী, যা তাদের কেবল সচ্ছলতাই এনে দেয় না, প্রাত্যহিক জীবনকে মসৃণই করে না, সেইসঙ্গে তাদের মানসিক ও শারীরিক অবদমন প্রশমনেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের নারীদের কেউ সংসারে সচ্ছলতা আনতে সমাজ-নির্ধারিত সতীত্বের বাঁধনকে কিছুটা আলগা করেছে, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় কেউ-বা অনৈতিক উপায় বেছে নিয়েছে, আবার কেউ স্বামী বা সংসার ঠিক রেখে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারীরা যা-ই করুক না কেন, তাদের আত্মপর, স্বৈরিণী বা অন্য কোনো অনির্দেশ্য রূপ পূর্ণতা লাভ করে তাদের লক্ষ্য অর্জনের নিষ্ঠায় ও অপ্রতিরোধ্য কৌশলে। অবস্থানের দিক থেকে এরা সধবা, বিধবা, জীবনযুদ্ধে লিপ্ত, স্বামী-পরিত্যক্ত, স্বামী-সোহাগি, স্বামী দ্বারা প্রতারিত, নিঃসঙ্গ, আবার কেউ কেউ সমাজের চোখে কেবল স্বভাবদোষেই স্বেচ্ছাচারী। স্বামী কিংবা প্রেমিকের সঙ্গে রুচিবোধের ভিন্নতায় এদের কেউ কেউ প্রেম সম্বন্ধে ফ্যান্টাসিতে ভুগেছে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে অবশ্য কিছু পরমসহিষ্ণু নারী চরিত্রও রয়েছে। তবে তাঁর গল্পে এই পরিচিত মোড়কের আড়ালে যা অনন্যতা অর্জন করেছে তা হলো নারীদের আত্মপ্রেম ও জীবনমুখিনতা। এদিক থেকে তারা রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী,

গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের এরেন্দিরার সমতুল্য হলেও আত্মপ্রেমের প্রকাশে তাদের অবস্থান ভিন্ন। এই আত্মপ্রেম পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া কিংবা সমাজে বা সংসারে কর্তৃত্ব খাটানোর তাগিদে নয়। এই আত্মপ্রেমের লক্ষ্য মূলত তাদের অচরিতার্থ প্রেম ও কামনাকে নির্দিষ্ট মাত্রা দেওয়া। তাই বলা চলে, জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পের নারীরা স্বভাবে ও চাহিদা প্রকাশের নিরিখে তাদের সময়ের তুলনায় অনেক বেশি প্রাগ্রসর। নারী চরিত্রের এই তির্যক মনোভঙ্গি ও তাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় রহস্যজটিল মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঁজগুলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্পে নৈপুণ্যের সঙ্গে উন্মোচিত করেছেন।

'নিসর্গচেতনা' এই অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদ। এই অংশে উপমহাদেশের সাহিত্যে নিসর্গের রূপায়ণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নিসর্গচেতনা প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করা হয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্র চরিত্রের মনস্তত্ত্বে নিসর্গকে সুচারুভাবে প্রোথিত করে দিয়ে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর কিছু গল্পে মানুষের মনোজগতের উপর নিসর্গের প্রভাবের শিল্পিত প্রকাশ রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে এসব গল্পকে চিহ্নিত করে মানব-মনে নিসর্গের প্রভাবের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে।

এই উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় যে, আবহমানকাল থেকেই নিসর্গ এই উপমহাদেশের সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সেই ধারাবাহিকতায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে নিসর্গের উপস্থিতি দেখা গেলেও, নিসর্গের বর্ণনা ও মানব-মনে এর প্রভাবের ব্যাপকতার নিরিখে বাংলা গল্পের ধারায় তাঁর অবস্থানটি বিশিষ্ট। নিসর্গের বাহ্যিক কিংবা দৃশ্যমান চিত্রণের বাইরে গিয়ে তিনি সাধারণ প্রকৃতির গভীরের রহস্যময় ও অদৃশ্য রূপটিকে তুলে ধরেছেন; সেই রূপে বিমোহিত বা বিচলিত মানুষের মনের মিথস্ক্রিয়াকে মূর্ত করেছেন। প্রকৃতি ও মানুষকে একই সূত্রে গেঁথে নিয়ে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের মনোজগতে নিসর্গের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে নিসর্গকে জীবন্ত করে তুলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, সেই অতুল রূপের সামনে অসহায় মানুষের আত্মসমর্পণকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে পর্যালোচনা করে মানব-মনের চেতন-অবচেতন স্তরে এর দূরগামী প্রভাবকেও উন্মোচিত করেছেন। এই প্রভাব কখনো বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত মানুষকে প্রশান্ত করেছে, আবার কখনো প্রশান্ত মানুষের মধ্যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে। নিসর্গকে উপজীব্য করে লেখা লেখকের এই গল্পগুলোতে মানুষ নিসর্গের প্রণোদনায় নিজেকে উন্মোচন করেছে, তার সুযোগ ঘটেছে নিজেকে পুনরাবিষ্কারের। সর্বোপরি নিসর্গের সান্নিধ্যে তাদের শূন্যতা, ক্ষুদ্রতা, মানসিক দীনতা থেকে আরোগ্য লাভ ঘটেছে। কাব্যধর্মী গদ্যের আশ্রয়ে তিনি এই গল্পগুলোয় মানুষের আত্ম-অনুসন্ধানের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড়তার সংমিশ্রণে গল্পকে বহুমাত্রিক রূপ দিয়েছেন। মানব-মনের অচেনা অথচ চিরন্তন অনুভূতিগুলোর স্বতন্ত্র ও চূড়ান্ত শিল্পসফল প্রকাশ হিসেবে নিসর্গনির্ভর গল্পগুলো জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের তালিকায় পৃথক মর্যাদার দাবিদার।

‘প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব’ শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদটি চতুর্থ অধ্যায়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচ্ছেদ। প্রেম ও যৌনতার উপর ভর করে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। প্রেম ও যৌনতাকে কেন্দ্র করে তার চরিত্রদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অরাজক কিংবা অসমঞ্জস ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে কখনো কখনো, এবং এর ফলে চরিত্রগুলো ভিন্নভাবে বিকশিত হয়ে গল্পকে ব্যতিক্রমী ও বিশেষায়িত করে তুলেছে। এই পরিচ্ছেদে প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিকতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞায়িত করে, জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে এর প্রকাশের বিচিত্রিতার সূত্র সন্ধান করা হয়েছে।

এই অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়, দু-একটি গল্পে বিকারের ইঙ্গিত থাকলেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে প্রেম ও যৌনতার স্বাভাবিক উপস্থিতি রয়েছে। এই গল্পগুলোয় যৌনতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও তার পরিণতিকে কেন্দ্র করে মানবচরিত্রের আপাত-অচেনা বিকারকে তিনি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। কখনো প্রেমের অজুহাতে, কখনো আত্ম-আবিষ্কারের অনুষঙ্গ হিসেবে, কখনো প্রতারণার মাধ্যমে, আবার কখনো শুভ্রতার বিপরীতে পঙ্কিলতার আস্বাদ নিতে গিয়ে তাঁর গল্পের চরিত্ররা যৌনতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বস্তুত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যৌনতার সরল আকাঙ্ক্ষার চেয়ে এর জটিল মনস্তাত্ত্বিক রূপটিই অধিক রূপায়িত হয়েছে। কামনাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মানস-উন্মোচনই এখানে গুরুত্ব পেয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রের গল্পে স্বাভাবিক যৌনতার চেয়ে অস্বাভাবিক যৌনতার প্রকাশ ঘটেছে বেশি। পুরুষের যৌনকামনার চেয়ে নারীর যৌনাকাঙ্ক্ষা গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। নিষিদ্ধ কিছুর প্রতি মানুষের অদম্য কৌতূহল এর উপরিতলের আবহ হলেও এসবের অন্তরালে রয়েছে অবসাদ ও অবক্ষয় এবং আত্ম-আবিষ্কারের তাড়না। শব্দ ও ভাষার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাময় প্রয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রের এই ধারার গল্পগুলো তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

‘কিশোর-মানস’ শীর্ষক পঞ্চম পরিচ্ছেদে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কিশোর বয়সী চরিত্রদের মানস-গঠনের পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে বয়ঃসন্ধির ব্যাপ্তিকাল চিহ্নিত করে ও বয়ঃসন্ধিকালীন প্রবণতাগুলোর উল্লেখ করে লেখকের গল্পে উপস্থাপিত কিশোর-মানসকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিশোরদের আচরণের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে তাদের মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব নিরূপণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

এই পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বয়ঃসন্ধিকাল মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। মনঃসমীক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ব্যাপ্তিকাল সংক্ষিপ্ত হলেও এই পর্বে অভূতপূর্ব সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ ঘটে কিশোরদের। এসব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের পূর্বপরিচয় না থাকায় এই পর্যায়ে পরিবার ও সমাজের সহযোগিতা না পেলে তাদের বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে মানবজীবনের এই স্বল্পস্থায়ী কিন্তু প্রভাববিস্তারী অধ্যায়টিকে

অনুধাবন করে তাঁর চরিত্রগুলোকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁর কিশোরেরা প্রধানত দশ থেকে উনিশ বছর বয়সী; তারা বয়সের সহজাত প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও লেখকের ভাবনা, দর্শন ও চিন্তার আলোকে তাদের রূপায়ণ ঘটেছে। পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বাস্তবতার নিরিখে নির্মিত লেখকের কিশোর চরিত্রগুলো তাদের পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে কেউ গ্রামীণ সজীবতায় আত্মসমর্পণ করেছে, কেউ আত্মমুগ্ধতায় বিহ্বল হয়ে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে এবং সেই হতাশা থেকে উত্তরণের পথও খুঁজে নিয়েছে নিজের মতো করে। তাঁর সংগ্রামী কিশোরেরা বড় হওয়ার সংগ্রামের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রেরণার সন্ধান করেছে। এদের মধ্যে যাদের বয়স পনেরো থেকে উনিশ, যৌনচেতনা সম্পর্কে তাদের যে বিচিত্র মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাভাবিক।

এই পরিচ্ছেদের সামগ্রিক আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের কিশোর-কিশোরীরা ভাবে ও ভাবনায়, মনে ও মননে লেখকের ও নিজেদের সমকালকে অতিক্রম করে বর্তমানের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্রের কিশোর চরিত্রদের মানস-গঠনকে কখনো কখনো রচনাকালের তুলনায় পরবর্তী সময়ের সঙ্গেই অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ তথা সর্বশেষ পরিচ্ছেদ 'মনস্তাত্ত্বিক সংকটের বিচিত্র রূপ'। এই পরিচ্ছেদে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে মৃত্যুচেতনা, নিয়তি, অবদমন প্রশমনের নানা মাত্রা, বার্ধ্যক্যজনিত কারণে মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন ইত্যাদির স্বরূপ বিশ্লেষিত হয়েছে। এই অন্বেষণের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে যে, জ্যোতিরিন্দ্র তাঁর শেষ পর্যায়ের গল্পে বয়োবৃদ্ধ মানুষের মৃত্যুচেতনা, স্মৃতিকাতরতা, জীবনতৃষ্ণা, যৌনাকাঙ্ক্ষা-সহ তাদের বিভিন্ন প্রবণতা ও সীমাবদ্ধতাকে অনুপুঙ্খসমেত চিত্রিত করেছেন। প্রবীণদের বিচিত্র মনস্তত্ত্বের বাইরেও তাঁর গল্পে এসব চরিত্রের ভয়, আতঙ্ক, নিয়তির কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ, মৃত্যুচেতনা, মানসিক বিকারের নানা রূপ ও অবদমন প্রশমনের বিভিন্ন মাত্রা, হীনম্মন্যতা প্রকাশের বৈচিত্র্য, সৃষ্টিশীলতার নির্মম পরিণতি, প্রচারসর্বস্বতা, দ্বৈত সত্তার দোলাচল প্রভৃতি নানা মাত্রিকতায় চিত্রিত হয়েছে। মানব-মনের বহুরৈখিক চেতনার বৈচিত্র্যকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর গল্প-ভাবনা ও সৃষ্টির রসদ হিসেবে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করেছেন।

এই অভিসন্দর্ভে সামগ্রিক পর্যালোচনার আলোকে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলোকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে (১৯৪৬-১৯৫৬) বৃহত্তর নাগরিক মধ্যবিত্তের নানা সংকট, তাদের নৈতিক ও সামাজিক স্খলন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় জীবনকে বহুবিচিত্র মনস্তত্ত্বের আধারে লেখক চিত্রিত করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে (১৯৫৭-১৯৭৬) প্রেম ও যৌনতার পাশাপাশি তিনি নিসর্গকে গল্পের কেন্দ্রে স্থান দিয়েছেন। প্রেম, যৌনতা ও নিসর্গের সমাপতন ঘটিয়ে তিনি চেতনার আশ্চর্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করছেন তাঁর এই

পর্বের গল্পগুলোকে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের তৃতীয় পর্বের (১৯৭৬-১৯৮১) স্থিতিকাল তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। এই পর্বটির সূচনাকাল ১৯৭৬ সাল হলেও তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে প্রকাশিত *আজ কোথায় যাবেন* শীর্ষক গল্পগ্রন্থে এই পর্ব পরিণতি লাভ করেছে। জীবনসায়াহ্নে উপস্থিত বৃদ্ধদের স্মৃতিকাতরতা, মৃত্যুচিন্তা, জীবনতৃষ্ণা এবং তাদের জীবন-জিজ্ঞাসা নিয়ে রচিত গল্প সংবলিত এই গ্রন্থটিতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটি বিশেষ জীবনবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাপ্তিকাল কম হলেও এই পর্বটি তাঁর গল্পের বিবর্তন প্রক্রিয়া অনুধাবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতার বিচারে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সর্বজনীন। তাঁর প্রথমদিকের কিছু গল্পে চমকের প্রাধান্য থাকলেও, মধ্যবর্তী পর্যায়ে এই দুর্বলতা থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে তাঁর গল্পে ভিন্নতর মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। আবার তাঁর শেষ পর্যায়ের কোনো কোনো গল্পে তিনি নতুন চেতনা ও প্রেরণার বশবর্তী হয়ে পরাবাস্তব দ্যোতনা সৃষ্টির প্রয়াস নিয়েছেন, যেখানে তাঁর শেষ জীবনের পাশ্চাত্য সাহিত্য পঠন-পাঠনের পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বক্ষেত্রে না হলেও লেখকের সহজাত প্রাঞ্জল গদ্যভঙ্গি ও আঙ্গিকের সুষম সমন্বয়ে মনোজাগতিক চিন্তন ও বিশ্লেষণের এই নতুন প্রক্রিয়াটি তাঁর গল্পকে অধিকতর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নেশা ও পেশায় পুরোদস্তুর সাহিত্যিক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিকতা-সহ নানা পেশায় যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করলেও সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও তিনি স্থিত হননি। তাই তাঁর সাহিত্যচর্চার সময়কাল যেমন বিস্তৃত, তাঁর রচিত সাহিত্যসম্ভারের আয়তনও বিপুল। প্রতিনিয়ত নিরীক্ষাপ্রবণতার কারণে তাঁর গল্প আঙ্গিক-গঠনেও বৈচিত্র্যময়। জীবদ্দশায় সাহিত্যাঙ্গনে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপস্থিতি ততটা উজ্জ্বল ছিল না। তাঁর গল্প-ভাবনা, রচনাকৌশল ও ভাষাশৈলী তুলনামূলকভাবে স্বল্প সংখ্যক পাঠক ও সমালোচক দ্বারা প্রশংসিত হলেও, এবং ইদানীংকালে গবেষকদের অনুসন্ধানী করে তুললেও, ব্যক্তিজীবনে নিভৃতচারী, অন্তর্মুখী ও গোষ্ঠী-বিচ্ছিন্ন এই লেখক জীবদ্দশায় সাহিত্যাঙ্গনে জনপ্রিয়তা বা ব্যাপক প্রচার পাননি। তবে সার্বিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জীবন ও মানুষকে দেখার বহুকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গি, স্বতন্ত্র নির্মাণশৈলী ও বিশিষ্ট গদ্যভঙ্গির কারণে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প তাঁর কালের সীমা অতিক্রম করে বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিকতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

এই অভিসন্দর্ভে পর্যালোচিত হলেও তাঁর গল্পের নারী মনস্তত্ত্ব, জীবন-বাস্তবতা এবং প্রেম ও যৌন মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে পৃথক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। তাঁর গল্পের গদ্যশৈলী ও আঙ্গিক নির্মাণের স্বাতন্ত্র্য নিয়েও বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে। সমসাময়িক কথাসাহিত্যিকদের গল্পের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর গল্পের মনস্তত্ত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনা নিয়েও ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র গবেষণা হতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আকর গ্রন্থ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯৯৯), *অগ্রন্থিত জ্যোতিরিন্দ্র*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৩৮৭ ব.), *আজ কোথায় যাবেন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৮৯৫ শকাব্দ), 'আরসি', *উল্টোরথ*, বর্ষ ২২, সংখ্যা ৭ (পূজা সংখ্যা)

– (১৩৬৭ ব.), *খালপোল ও টিনের ঘরের চিত্রকর*, কথাকলি, কলকাতা

– (১৩৫৩ ব.), *খেলনা*, পূর্বাশা লিমিটেড, কলকাতা

– (১৮৯৪ শকাব্দ), 'গাছতলার বৃষ্টি', *উল্টোরথ*, বর্ষ ২১, সংখ্যা ৮ (পূজা সংখ্যা), কার্তিক

– (১৩৬১ ব.), *চার ইয়ার*, শুভানী সাহিত্য উদ্যম, কলকাতা

– (১৩৮৩ ব.). *ছিদ্র*, বাণী শিল্প, কলকাতা

– (১৩৬৮ ব.), 'জীবন', *আজ কলকাতায়*, সম্পাদনা : রতীশ রায়, রম্যবাণী পাবলিশিং হাউস, কলকাতা

– (১৯৯১), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর অপ্রকাশিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, প্রত্যয় প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫ক), *গল্পসমগ্র ১ম খণ্ড*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ, কলকাতা

– (১৩৪৮ ব.), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ১ম খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৩৮৯ ব.), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সংগ্রহ ২য় খণ্ড*, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৫খ), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (১৯৯৩), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প*, সম্পাদনা : সুব্রত রাহা, বিবেক ভারতী, কলকাতা

– (১৯৭৬) *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর শ্রেষ্ঠ গল্প*, ভারবি, কলকাতা

– (১৩৬৩ ব.), *ট্যাক্সিওয়ালা*, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা

– (১৮৯৭ শকাব্দ), 'দামী সওয়ার', *সিনেমা জগৎ*, বর্ষ ২২, পূজা সংখ্যা

– (১৯০৩ শকাব্দ), 'দুই অঙ্ক', *উল্টোরথ*, বর্ষ ৩০, পূজা সংখ্যা

– (২০০০), *নায়িকা পঞ্চবিংশতি*, সম্পাদনা : নিতাই বসু, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৩৬৭ ব.), *পতঙ্গ*, কল্লোল প্রকাশনী, কলকাতা

– (১৩৬৫ ব.), *পার্বতীপুরের বিকেল*, প্রচারিকা, কলকাতা

– (১৩৬৪ ব.), *প্রিয় অপ্রিয়*, ডি এম লাইব্রেরী, কলকাতা

– (১৩৬২ ব.), *বন্ধুপত্নী*, নাভানা, কলকাতা

– (১৮৯৯ শকাব্দ), 'বলদ', *উল্টোরথ*, বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৬ (পূজা সংখ্যা)

– (১৩৬৪ ব.), *বনানীর প্রেম*, বাসন্তী, কলকাতা

– (১৩৬৭ ব.), *মহীয়সী*, শ্রীলেখা পাবলিশার্স, কলকাতা

– (১৩৬১ ব.), *শালিক কি চড়ুই*, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং, কলকাতা

– (১৩৭০ ব.), *শ্বাপদ শয়তান ও রূপালী মাছেরা*, কলকাতা

– (১৩৭০ ব.), *সোনার স্মৃতি*, প্রকাশক : শ্রীমতী রায়, কলকাতা

খ. সহায়ক গ্রন্থাবলি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৩৭২ ব.), *কল্লোল যুগ*, এম. সি. সরকার এন্ড সন্স, কলকাতা

অজন্তা সাহা (২০১০), *কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, মুদ্রাকর, কলকাতা

অপূর্ব কুমার রায় (২০০৬), *শৈলী বিজ্ঞান*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অভিজিৎ মজুমদার (২০০৭), *শৈলী বিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অমরচন্দ্র কর্মকার (২০১৬), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : গল্পের অন্দরমহল*, সম্পাদনা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

অমলেন্দু সেনগুপ্ত (১৯৮৯), *উত্তাল চল্লিশ : অসমাপ্ত বিপ্লব*, পাল পাবলিশার্স, কলকাতা

অমিয়ভূষণ মজুমদার (২০১০), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, ৩য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৯), *কালের প্রতিমা*, ৩য় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০০৪), *বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০০৯), *সাহিত্য : এপার বাংলা ওপার বাংলা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

– (২০১৬), *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের একশ' বিশ বছর (১৮৯১-২০১০)*, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অলোক রায় সম্পাদিত (১৯৬৭), *সাহিত্য কোষ : কথাসাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

অলোক রায় (১৯৯২), *কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

অসীম বর্ধন (১৯৯৯), *কিশোর কিশোরীদের যৌন সমস্যা*, ২য় সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

অসীম সামন্ত (২০০৭), *হ্যাঁ, না এবং জ্যোতিরিন্দ্র ও সন্দীপন*, অনুষ্টুপ, কলকাতা

– (২০১৭), *প্রসঙ্গ : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, পরম্পরা প্রকাশন, কলকাতা

আশাপূর্ণা দেবী (১৩৮৬ ব.), *আশাপূর্ণা দেবীর বাছাই গল্প*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

আসরফী খাতুন, (২০১৪), *বাংলা কথাসাহিত্যের চল্লিশের সময় ও সমাজ*, প্রকাশক : দেবাশিস ভট্টাচার্য, কলকাতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (২০০৫), *গল্প পাঠকের ডায়ারি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত (২০০৮), *গল্পচর্চা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত (২০১১), *সুবোধ ঘোষ : অযান্ত্রিক শিল্পী*, উজাগর, কলকাতা

কমলকুমার মজুমদার (১৯৯৫), *গল্পসমগ্র*, সম্পাদনা : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

কুন্তল চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৫), *সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী, কলকাতা

কৃষ্ণরূপ চট্টোপাধ্যায় (২০০৯), *বাংলা কথাসাহিত্যের নতুন পাঠ*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী (১৯৮৬), *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যকালীন বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

জগদীশ ভট্টাচার্য (১৯৯৪), *আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী*, ভারবি, কলকাতা

জীবনানন্দ দাশ (২০১৮), *ধূসর পাণ্ডুলিপি*, নবপর্যায় সিগনেট ২য় মুদ্রণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

তপোধীর ভট্টাচার্য (২০১১), *ছোটগল্পের প্রতিবেদন*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

– (২০১৭), *ছোটোগল্পের সুলুক-সন্ধান (উত্তরার্ধ)*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত (২০০৫), *বাংলা ছোটগল্প পর্ব-পর্বান্তর*, অপর্ণা, কলকাতা

তুষারকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত (২০১৬), *গুণীজনের দৃষ্টিতে সুবোধ ঘোষ: সাহিত্য ও জীবন*, প্রকাশভবন, কলকাতা

দেবেশ রায় (২০১৮), *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

দেবেশকুমার আচার্য (২০০৪), *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আধুনিক যুগ*, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯৫), *কৈশোর ও তার সমস্যা*, ২য় মুদ্রণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (২০১৩), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : জাকির তালুকদার, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা

নাজমুল করিম (১৯৯৩), *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ*, ৫ম সংস্করণ, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৬৪ ব.), *বাংলা গল্প বিচিত্রা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

– (১৩৭৬ ব.), *ছোটগল্পের সীমারেখা*, প্রকাশ ভবন, কলকাতা

– (১৪০৮ ব.), *সাহিত্যে ছোটগল্প*, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা

– (২০১৪), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : শামস আল্‌দীন, নালন্দা, ঢাকা

– (২০১৮), *সাহিত্যে ছোটগল্প ও বাংলা গল্প বিচিত্রা*, কবি, ঢাকা

নিতাই কুমার ঘোষ (২০১৫), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে মানব সম্পর্কের সীমানা ও সত্যতা*, গ্রাফোসম্যান পাবলিকেশনস, ঢাকা

নীহার শুভ্র অধিকারী (২০১৮), *গল্পের ভুবন : রমাপদ চৌধুরী*, পুনশ্চ, কলকাতা

প্রশান্ত মাজী সম্পাদিত (১৪২৩ ব.), *চা-টেবিলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*, ভালো বই, কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র (২০০১), *প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : সৌরীন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ফ্রানৎস কাফকা (২০১১), *কাফকার নির্বাচিত গল্প*, অনুবাদ : কবীর চৌধুরী, সময় প্রকাশন, ঢাকা

বিজিত ঘোষ (২০১৩), *ছোটগল্প*, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

বিনতা রায়চৌধুরী (১৯৯৭), *পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বাংলা সাহিত্য*, সাহিত্যলোক, কলকাতা

বিনয় ঘোষ (১৯৬০), *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা : ১৮০০-১৯০০*, 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থমালার শেষ (৫ম) খণ্ড, পাঠকভবন, কলকাতা

বিনয় মজুমদার (১৪১৯ ব.), *ফিরে এসো, চাকা*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা

বিমল কর (১৩৯২ ব.), *আমি ও আমার তরুণ লেখক বন্ধুরা*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা

– (২০১৯), সরস গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

বিমল চক্রবর্তী (২০১৩), *ব্যতিক্রমী আখ্যানশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অক্ষর পাবলিকেশনস, কলকাতা

বীরেন্দ্র দত্ত (২০১৩), *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ১ম খণ্ড*, ৭ম সংস্করণ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

– (২০১৮), *বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ও প্রকরণ ২য় খণ্ড*, ৮ম সংস্করণ, পুস্তক বিপণী, কলকাতা

বুদ্ধদেব বসু (১৯৫৩) *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : জগদীশ ভট্টাচার্য, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

– (২০১৭) *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ, আজকাল, ঢাকা

বেগম রোকেয়া (২০১০), *বাংলা সাহিত্যে নরনারী সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ভূদেব চৌধুরী (১৯৬২), *বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার*, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

– (২০০০), *ছোটগল্পের কথা*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য (১৯৯৪), *নরেন্দ্রনাথ মিত্র : জীবন ও সাহিত্য*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

মধুময় পাল সম্পাদিত (২০১১), *দেশভাগ : বিনাশ ও বিনির্মাণ*, গাঙচিল, কলকাতা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : আবদুল মান্নান সৈয়দ, অবসর, ঢাকা

মাহবুবুল আলম সম্পাদিত (২০০২), *সাহিত্য তত্ত্ব : সাহিত্যের রূপরীতি, রসতত্ত্ব, অলংকার*, ৫ম মুদ্রণ, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানি, ঢাকা

মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (২০০৯), *বহতা সময়ের গল্পচর্চা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

মোঃ আতাউর রহমান (২০১০), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : আঞ্চলিক জীবন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রঞ্জনা দত্ত (২০০২), *স্রোতের বিপরীতে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, অজিতকুমার দত্ত, কলকাতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৬৮ ব.), *রবীন্দ্র রচনাবলি ৮ম খণ্ড*, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা

রমাপদ চৌধুরী (১৯৬৮), *গল্প সমগ্র*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

শম্পা চৌধুরী সম্পাদিত (২০০৮), *প্রসঙ্গ বাংলা ছোটগল্প : স্বাধীনতার আগে ও পরে*, রত্নাবলী, কলকাতা

– (২০০৯ক), *গল্প পড়ার মহড়া*, রত্নাবলী, কলকাতা

– (২০০৯খ), *ছোটগল্পের অন্তর্মহল*, রত্নাবলী, কলকাতা

– (২০০৯গ), *বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প নবমূল্যায়ন*, রত্নাবলী, কলকাতা

শ্রাবণী পাল সম্পাদিত (২০১৬), *বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা : বিশ শতক*, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

শিপ্রা দে (২০১৯), *ছোটগল্পের অর্কিড : জগদীশচন্দ্র* গুপ্ত, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা

শিশিরকুমার দাশ (১৯৬৩), *বাংলা ছোটগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

শীতল চৌধুরী (২০১১), *বাংলা ছোটগল্পের তিন নক্ষত্র : বনফুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়*, ২য় মুদ্রণ, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯৪৪), *পঞ্চাশের মন্বন্তর*, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৪), *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পুনর্মুদ্রণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯৯৮), *বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (১৯৮১), *শিল্প সাহিত্য দেশকাল*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯৭০), *সন্তোষ কুমার ঘোষের সমস্ত গল্প ২য় খণ্ড*, স্বরলিপি, কলকাতা

সমরেশ বসু (১৯৫৮), *বাছাই গল্প*, মণ্ডল বুক হাউজ, কলকাতা

সরকার আব্দুল মান্নান (২০০১), *জগদীশ গুপ্তের রচনা ও জগৎ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১৮), *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সরোজ মোহন মিত্র (১৯৯৭), *বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প*, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা,

– (১৯৯৮), *রবীন্দ্রোত্তর ছোটগল্প সমীক্ষা*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

– (২০০৮), *স্বাধীনতা প্রাক ও উত্তরের বাংলা ছোটগল্প বিচিত্রা : মননে ও বিশ্লেষণে*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (২০০১), *মনঃসমীক্ষণের রূপরেখা*, ভাবানুবাদ : পুষ্পা মিত্র ও মাধবেন্দ্রনাথ মিত্র, পুনর্মুদ্রণ, সেন্ট্রাল এডুকেশনাল এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা

সুকুমার সেন (১৯৯৯), *গল্পের গাঁটছড়া*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (২০১৭), *কাব্যসমগ্র*, পুনর্মুদ্রণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সুনীল কুমার সরকার (১৯৯০), *ফ্রয়েড*, ৩য় প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

সুবোধ ঘোষ (২০১৬), *শ্রেষ্ঠ গল্প*, সম্পাদনা : জগদীশ ভট্টাচার্য, মাটিগন্ধা, ঢাকা

সুমিতা চক্রবর্তী (২০০৪), *ছোটগল্পের বিষয়-আশয়*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

– (১৯৯৮), *প্রেমেন্দ্র মিত্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত (২০০৬), *বাংলা ছোটোগল্পের সূচনা এবং প্রেমেন্দ্র মিত্র*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা

সৈয়দ আজিজুল হক (২০১৮), *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ*, ২য় মুদ্রণ, কথাপ্রকাশ, ঢাকা

স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০৮), *জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

হীরেন চট্টোপাধ্যায় (১৪১৯ ব.), *সাহিত্য প্রকরণ*, পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

Anup Dhar (2018), *Indian Journal of History of Science*, vol. 53, no. 4

B. B. Misra (1961), *The Indian Middle Classes*, Oxford University Press, London

Bétille, André (2018), *Middle class values in Indian and Western Europe*, Edited by Imtiaz Ahmed and Helmut refiled, Rougfledge, London

Forster, E. M. (1927), *Aspects of the novel*, Edward Arnold, London

Freud, Sigmund (1949), *Three Essays on the Theory of Sexuality*, linago publishers, London

Gail, Richard (1995), *Mastering English Literature*, Macmillan Press Ltd, London

Horney, Karen (1994), *Self-analysis*, W.W. Norton and Company, New York

Miller, H. Crichton (1945), *Psychoanalysis and Its Derivatives*, 2nd edition, Oxford University Press, London

Mottier, Veronique (2008), *Sexuality: A Very Short Introduction,* Oxford University Press, London

Santanu Biswas (2003), *The International Journal of Psychoanalysis*, vol. 84

গ. সহায়ক গবেষণা অভিসন্দর্ভ

অন্তরা ঘোষ (২০১৮), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীঃ ছোটগল্পের স্বতন্ত্র শিল্পী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর

দেবশ্রী মণ্ডল (২০১৭), আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বহুমুখ এবং জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া

মধুমিতা সাহা (২০১৫), মধ্যবিত্তের সত্তাসংকটঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর কথাসাহিত্য, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মৃদুল ঘোষ (২০০৯), অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর ছোটগল্প : সৃজন ও নির্মাণের পৃথক পৃথিবী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

রঞ্জনা দত্ত (১৯৯৩), কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

রত্না জোয়ারদার (১৯৯৭), আধুনিক ছোটগল্পের তিন শিল্পী : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, কমলকুমার মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৯১০-১৯৮৩, পিএইচডি. অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শুচিস্মিতা দেবনাথ (২০০৮), আশাপূর্ণা দেবীর ছোটগল্প : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরূপ, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রী সুভাষচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৯৮৯), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : মূল্যায়ন, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ঘ. সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি

অনিল আচার্য সম্পাদিত (১৪১৬ ব.), *অনুষ্টুপ*, প্রাক-শারদীয়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৪

উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত (১৪১৭ ব.), *উজাগর*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, কলকাতা

দেবব্রত ভট্টাচার্য সম্পাদিত (২০১৪), *পরিকথা*, বর্ষ ১৬, সংখ্যা ২, মে, কলকাতা

বিকাশ শীল সম্পাদিত (২০০৪), *জনপদ প্রয়াস*, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, বর্ষ ৬, সংখ্যা ৩, কলকাতা

মানস সরকার সম্পাদিত (২০১৭), *গল্পমেলা*, বার্ষিক সংকলন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, কলকাতা

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত (১৩৭৬ ব.), *দেশ*, সাহিত্য সংখ্যা, কলকাতা

সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত (১৩৯৫ ব.), *দেশ*, বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা

সৈয়দ আজিজুল হক সম্পাদিত (২০১৮), *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, গ্রীষ্ম সংখ্যা, খণ্ড ৩৬, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

হাবীবুল্লাহ সিরাজী সম্পাদিত (২০১৯), *বাংলা একাডেমি পত্রিকা*, বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ১-৪ – বর্ষ ৬২, সংখ্যা ১-৪, জানুয়ারি ২০১৫ – ডিসেম্বর ২০১৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

ঙ. সহায়ক অন্তর্জাল প্রকাশনা

অমর মিত্র (২০১৩), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - শতবর্ষে (প্রথম পর্ব)', *https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=15290&srchtxt=%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0 (Accessed: 11 January 2020)*

– (২০১৩), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী - শতবর্ষে (দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব)', *https://www.guruchandali.com/comment.php?topic=15282&srchtxt=%E0%A6%85%E0%A6%AE%E0%A6%B0%20%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0 (Accessed: 11 January 2020)*

– (২০১৭), 'বিরল শিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী', *https://www.ntvbd.com/arts-and-literature/128609/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%B2-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80 (Accessed: 11 January 2020)*

আশরাফ উদ্দীন আহমেদ (২০১৫), 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে চেনা স্বর', *https://www.kaliokalam.com/%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%B2/ (Accessed: 17 May 2020)*

দেবাশিস ঘড়াই (২০১৯), 'আগুন ও নিরাসক্তি নিয়ে উঠোন জুড়ে দাঁড়িয়ে যে জন', *https://www.anandabazar.com/supplementary/patrika/jyotirindra-nandi-the-author-who-created-a-niche-for-himself-in-the-bengali-literature- (Accessed: 21 March 2021)*

নূর মোহাম্মদ নূরু (২০২০), ‘বাঙালী সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ৩৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি’, *https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/nurubrl/30304804 (Accessed: 15 March 2021)*

পাপিয়া মিত্র, ‘ছোটগল্পে হীরক দ্যুতি’, *http://archives.anandabazar.com/e_kolkata/2013/august/atiter_tara.html (Accessed: 12 March 2021)*

মনিরুল ইসলাম, ‘নারীর মনস্তত্ত্ব : অধ্যয়নের ক্ষেত্র ও চ্যালেঞ্জসমূহ’, *https://sarbojonkotha.info/sk-23-nari/ (Accessed: 28 April 2021)*

Cherry, Kendra (2020), ‘Fromm’s Character Orientations’, *https://www.verywellmind.com/fromms-five-character-orientations-2795956#:~:text=Erich%20Fromm%20was%20a%20neo,created%20by%20feelings%20of%20isolation. (Accessed : 2 February 2021)*

Freud, Sigmund (n.d.), *https://www.sigmundfreud.net/quotes.jsp (Accessed: 1 May 2021)*

. . .